কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৩১
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী
ANIK
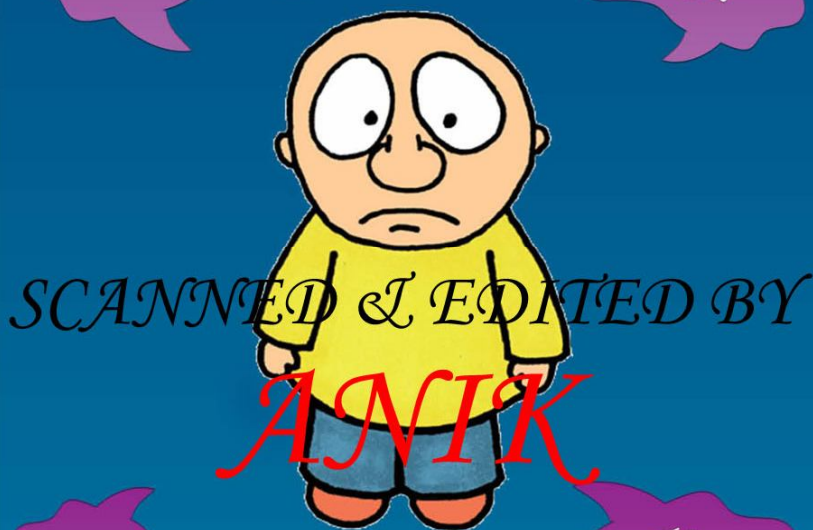
তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৩১

রকিব হাসান

Scanned & Edited By
Shamiul Islam Anik

ভলিউম-৩১

তিন গোয়েন্দা

৮৭, ৮৯, ১০৩

রকিব হাসান
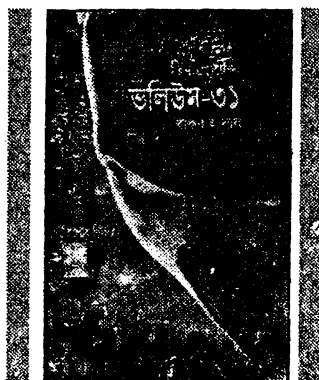
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1382-4

চুয়াত্তর টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-31
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১ (তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)
তি. গো. ভ. ১/২ (ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)
তি. গো. ভ. ২/১ (প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত) ৭৩/-
তি. গো. ভ. ২/২ (জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)
তি. গো. ভ. ৩/১ (হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি) ৬৯/-
তি. গো. ভ. ৩/২ (কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি) ৬৯/-
তি. গো. ভ. ৪/১ (ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২) ৫৯/-
তি. গো. ভ. ৪/২ (ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব) ৬৩/-
তি. গো. ভ. ৫ (ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)
তি. গো. ভ. ৬ (মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)
তি. গো. ভ. ৭ (পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ) ৮০/-
তি. গো. ভ. ৮ (আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ) ৮২/-
তি. গো. ভ. ৯ (পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল) ৮৪/-
তি. গো. ভ. ১০ (বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১) ৭৬/-
তি. গো. ভ. ১১ (অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো) ৭৮/-
তি. গো. ভ. ১২ (প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)
তি. গো. ভ. ১৩ (ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)
তি. গো. ভ. ১৪ (পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন) ৭১/-
তি. গো. ভ. ১৫ (পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)
তি. গো. ভ. ১৬ (প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)
তি. গো. ভ. ১৭ (ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)
তি. গো. ভ. ১৮ (খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)
তি. গো. ভ. ১৯ (বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)
তি. গো. ভ. ২০ (খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ) ৮০/-
তি. গো. ভ. ২১ (ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)
তি. গো. ভ. ২২ (চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)
তি. গো. ভ. ২৩ (পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন) ৬৯/-
তি. গো. ভ. ২৪ (অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ) ৭০/-
তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)
তি. গো. ভ. ২৬ (ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)
তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, তুষার বন্দি)
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান) ৭০/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)
তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো) ৭৬/-
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)

তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৬৯/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কি রহস্য, নেকড়ের গুহা)	
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৬৪/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্ণদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৬০	(শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্রাভেল, শুঁটকি শত্রু)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৫৬/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	
তি. গো. ভ. ৭১	(পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭২	(ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি)	
তি. গো. ভ. ৭৩	(পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাত+ভুতুড়ে ঘড়ি)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭৪	(কাওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউনভিলে গণ্ডগোল)	
তি. গো. ভ. ৭৫	(কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+স্যান্টাসিল্যান্ড)	
তি. গো. ভ. ৭৬	(মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য)	
তি. গো. ভ. ৭৭	(চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা)	
তি. গো. ভ. ৭৮	(চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর)	
তি. গো. ভ. ৭৯	(লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাঁটি+তুষার মানব)	
তি. গো. ভ. ৮০	(মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি)	
তি. গো. ভ. ৮১	(কালো পর্দার অন্তরালে+ভয়াল শহর+সুমেরুর আতঙ্ক)	
তি. গো. ভ. ৮২	(বনদস্যুর কবলে+গাড়ি চোর+পুতুল-রহস্য)	
তি. গো. ভ. ৮৩	(খনিতে বিপদ+গুহা-রহস্য+কিশোরের নোটবুক)	
তি. গো. ভ. ৮৪	(মৃত্যুগুহায় বন্দি+বিষাক্ত ছোবল+শুঁটকি রাজকুমার)	
তি. গো. ভ. ৮৫	(গুপ্তধনের সন্ধানে+শয়তানের জলাভূমি+সেরা গোয়েন্দা)	
তি. গো. ভ. ৮৬	(পাহাড়ে বন্দি+বারমুডা অভিযান+রহস্যের হাতছানি)	
তি. গো. ভ. ৮৭	(মমিরহস্য+ভাইরাস আতঙ্ক+তালিকা-রহস্য)	
তি. গো. ভ. ৮৮	(পিংকি কেং+খুনে তান্ত্রিক+কালো আলখেল্লা)	
তি. গো. ভ. ৮৯	(রোমেটের সিন্দুক+মারাত্মক বিপদ+হারানো তলোয়ার)	
তি. গো. ভ. ৯০	(হিমগিরিতে সাবধান+সাগরে শঙ্কা+খেপা জাদুকর)	
তি. গো. ভ. ৯১	(ক্যামেরার চোখ+ভ্যাম্পায়ারের ছায়া+ভুতুড়ে বাড়ি)	
তি. গো. ভ. ৯২	(জিন্দালাশের পিছে+অগ্নিগিরি অভিযান+গবলিনের কবলে)	
তি. গো. ভ. ৯৩	(পিশাচের আস্তানা+উড়ন্ত রবিন+অন্য ভুবনের কিশোর)	৪১/-

মারাত্মক ভুল

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৯৫

গুনগুন করে গাইতে গাইতে স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকল রবিন। বসন্তের ছুটি সবে শুরু। ছুটির প্রতিটি মিনিট কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। ইতিহাসের ওপর একটা লেখা লিখছে, সেটা শেষ করে ফেলবে এবার। তারপর যাবে বার্টলেট লজের অফিসে, যে গানের কোম্পানিটাতে চাকরি করে।

ওঅর্কশপের কাছে এসে মুসাকে দেখতে পেল। শিস দিচ্ছে। শরীরের বেশির ভাগটাই ঢুকে গেছে একটা পুরানো ভ্যানের হুডের নিচে। মেরামত করছে। তার ধারণা এটা বিক্রি করতে পারলে বেশ ভাল লাভ হবে।

ঠিক এই সময় ঝড়ের গতিতে গেট দিয়ে ঢুকল ইয়ার্ডের ঝরঝরে পিকআপ ট্রাকটা।

ইঞ্জিনের গর্জন শুনে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল রবিন। প্রায় চমকে গিয়ে হুডের ভেতর থেকে মাথা তুলল মুসা। কার এমন মাথা গরম হয়েছে?

কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল পিকআপ। ধুলোর ঝড় উঠল। ভয় পেয়ে এদিক ওদিক ছিটকে সরে গেল পুরানো মাল কিনতে আসা কয়েকজন ক্রেতা। সবাই অবাক। খেপা ড্রাইভারের অভাব নেই রকি বীচে, কিন্তু কে এতটাই খেপা যে ইয়ার্ডের ভেতরেও এভাবে চালায়?

'আরি, কিশোর!' চিৎকার করে মুসাকে বলল রবিন।

'হলো কি ওর?'

উত্তেজনায় কঠিন হয়ে আছে কিশোরের মুখ, ফ্যাকাসে। ঘামে ভেজা কোঁকড়া চুল। ইঞ্জিন বন্ধ করে, ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে, লাফিয়ে নামল মাটিতে। মুসা আর রবিনের পাশ কাটিয়ে দৌড় দিল ট্রেলারের প্রবেশপথের দিকে।

কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে।

নিজের অজান্তে গায়ের সবুজ গেঞ্জিটায় হাতের গ্রীজ মুছে ফেলল মুসা। ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, কি হয়েছে?'

পেছনে ছুটল রবিন। 'ঘটনাটা কি, কিশোর?'

কারও প্রশ্নেরই জবাব দিল না সে। ঢুকে গেল দুই সুড়ঙ্গে। মুসা আর রবিন ঢুকল তার পেছনে।

ঢুকে দেখে, কম্পিউটারের ঢাকনা তুলে ফেলেছে কিশোর। চেয়ার ঠেলে বসে সুইচ টিপতে শুরু করল। স্লটে ঢুকিয়ে দিল দুটো ফ্লপি ডিস্ক।

লম্বা একটা দম নিয়ে উদ্বিগ্ন চোখে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

পেছন থেকে আবার জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কি হয়েছে, কিশোর?'

'বলো না কি হয়েছে!' বলল রবিন।

মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে মনিটরটা দেখাল কিশোর। বোঝাল, কি হয়েছে চুপ করে দেখো।

মনিটরের কালো পর্দায় জ্বলন্ত কমলা রঙের লেখা ফুটতে শুরু করেছে। দ্রুত আরও কয়েকটা সুইচ টিপল কিশোর। কম্পিউটারকে অনুরোধ করল কিছু তথ্য শো করার জন্যে।

অধৈর্য হয়ে পড়ল রবিন। কিন্তু কিছু বলল না। জানে, বলে লাভ নেই। নিজে থেকে না খুললে কিছুতেই কিশোরের মুখ খোলানো যাবে না।

হাতের গ্রীজের কথা ভুলে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ টোঁও-টোঁও করে সতর্ক সঙ্কেত দিল কম্পিউটার। বড় বড় করে লেখা তিনটে শব্দ ফুটল পর্দায়:

FATAL DISK ERROR!

'এ কথা বলছে কেন?' সন্দেহ ফুটেছে রবিনের চোখে।

'সর্বনাশ হয়েছে!' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'ডিস্ক থেকে আর কিছুই বের করে আনতে পারব না! গেল আমাদের সব ইনফরমেশন...এই ভয়ই করছিলাম! ভাইরাস ইনফেকশন হয়েছে আমাদেরও।'

'কিসের ভাইরাস?' মুসা বলল, 'কই আমার তো শরীর খারাপ লাগছে না?'

'গাধা!' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল কিশোর। কী-বোর্ডে উড়ে বেড়াচ্ছে আঙুলগুলো, যে করেই হোক সামান্যতম ইনফরমেশন হলেও বের করে আনতে চায় ডিস্ক থেকে। 'মানুষের ভাইরাস নয়। কম্পিউটারের।'

অবাক হয়ে একবার কিশোরের আঙুলের দিকে, একবার মনিটরের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। কিশোরকে প্রশ্ন করতে ভয় পাচ্ছে। আবার যদি বকা শোনে? শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের কাছে পরাজিত হতেই হলো। জিজ্ঞেস করল, 'কম্পিউটারের ভাইরাসটা আবার কি জিনিস?'

রাগল না কিশোর। গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, 'অনেকগুলো সঙ্কেতের একটা ক্ষুদ্র মালা, যা বার বার একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে কপি করতে থাকে। একধরনের সাবপ্রোগ্রাম, যেটা কম্পিউটারের অন্য কোন প্রোগ্রাম কিংবা কোন অপারেটিং সিসটেমের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কাজ করতে দেয় না। বাধা সৃষ্টি করে। আস্তে আস্তে প্রোগ্রামটাকে খেয়ে ফেলে কিংবা ডাটাগুলো সব ওলট-পালট করে দেয়।'

হাঁ হয়ে গেল মুসা। কিছুই বুঝতে পারেনি। বলল, 'এত সহজ করে বলার চেয়ে বরং মুগুর দিয়ে একটা বাড়ি মারো আমার চাঁদিতে!'

'সোজা কথা হলো,' বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'কম্পিউটারের

ভাইরাস সব তথ্য খেয়ে ফেলে। কিংবা গোলমাল করে দেয় সব কিছুতে।'

'নম্বর, শব্দ, সব বদলে ফেলে?' রবিনের প্রশ্ন।

'আরও খারাপও করে। জগাখিচুড়ি পাকিয়ে দেয় সব কিছুতে। কম্পিউটারের মাথা খারাপ করে দেয়। কতটা ক্ষতি করতে পারে কল্পনা করাও মুশকিল। ক্ষতির কোন সীমাসংখ্যা নেই।'

'কিন্তু ভাইরাস যে অ্যাটাক করেছে আগে বুঝলাম না কেন?'

'সর্দি ধরার সঙ্গে সঙ্গে কি বুঝতে পারো?'

'না।' একই সঙ্গে মাথা নাড়ল মুসা ও রবিন।

'কম্পিউটারের বেলায়ও একই ব্যাপার। কতটা কি ঘটবে সেটা নির্ভর করে ভাইরাসের ডিজাইনের ওপর। ঢোকার সাথে সাথে ডাটার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে, আবার চুপচাপ বসে থাকতে পারে মাসের পর মাস। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সব খতম,' হাত ওল্টাল কিশোর। 'কম্পিউটারের মাধ্যমে এক ডিস্ক থেকে আরেক ডিস্কে ছড়িয়ে পড়ে ভাইরাস। তাই অন্য কারও ডিস্ক এনে কম্পিউটারে ঢোকানোর ব্যাপারে সাবধান থাকতে হয়।' হাত মুঠো করে ফেলল কিশোর। 'এটা কারও শয়তানী!'

'কোনটা?' বুঝতে না পেরে জানতে চাইল রবিন।

'এই যে এখন যে ভাইরাসটা ঢুকেছে কম্পিউটারে। কেউ একজন বানিয়েছে এটা। গেম ডিস্কটার সব গেছে আমাদের। ফাইলগুলো সব মুছেটুছে সাদা।'

এতক্ষণে অস্বস্তি দেখা দিল রবিনের মুখে। ডিস্ক বক্স থেকে একটা ডিস্ক বের করে এনে দিল কিশোরকে। 'দেখো তো, এটা ঠিক আছে কিনা? অনেক খাটা খেটেছি হিস্টরি রিপোর্ট নিয়ে। সব রেখেছি এতে। গেলে, মরলাম!'

রবিনের ডিস্কটা স্লটে ঢোকাল কিশোর।

টেবিলে হাত রেখে ঝুঁকে মনিটরের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। উদ্বেগে কুঁচকে গেছে মুখচোখ।

রিপোর্ট ফাইল কল করল কিশোর।

টোও-টোও করে দু-বার সঙ্কেত দিল কম্পিউটার। পর্দায় ফুটল সেই একই কথা:

FATAL DISK ERROR!

'গেছে!' গুঙিয়ে উঠল রবিন। বিশ্বাস করতে পারছে না। 'সত্যিই গেল! আবার নতুন করে লিখতে হবে সব! পুরো পনেরো পাতা লিখেছিলাম!'

রবিনের কাঁধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল মুসা। দুটো চেয়ার টেনে আনল তার আর রবিনের বসার জন্যে। জিজ্ঞেস করল, 'কি করা যায়, কিশোর?'

কাজে ব্যস্ত গোয়েন্দাপ্রধান। ঠিক করার জন্যে সে-ও মরিয়া হয়ে উঠেছে। একটা ডিস্ক বের করে দেখিয়ে বলল, 'এটা সেক্টর এডিটর। বাড়ি ফেরার সময় কিনে নিয়ে এসেছি। অনেক শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মত

কাজ করে। দেখো, কি ঘটে?'

ডিস্ক ঢুকিয়ে বোতামে চাপ দিল কিশোর।

চেয়ার থেকে উঠে চলে গেল রবিন। কি করতে যাচ্ছে দেখল মুসা। বুককেসের কাছে গিয়ে একগাদা কাগজ ঘেঁটে কি যেন খুঁজতে শুরু করল রবিন। ভীষণ হতাশ মনে হচ্ছে তাকে।

আবার পর্দার দিকে ফিরল মুসা

'ডিস্ক রিঙের ডাটাগুলো দেখতে সাহায্য করে সেক্টর এডিটর,' বুঝিয়ে দিল কিশোর। 'একটা ডিস্কে অনেক রিঙ থাকে, প্রতিটিতে অন্তত তিনশো বাটটা করে।'

'সিডির ডিস্কে যেমন রিঙ থাকে?'

'হ্যাঁ। আর প্রতিটি রিঙে সেক্টর ভাগ করা থাকে।'

হঠাৎ সারি সারি শব্দ আর নম্বর ফুটতে শুরু করল পর্দায়। কিশোর বলল, 'এই যে, এগুলোই—সেক্টর।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'পারার কথাও নয়।' হতাশ ভঙ্গিতে গাল চুলকাল কিশোর। 'কোন ডাটাই নেই। সব আবর্জনা। সমস্ত ডাটা খতম করে দিয়েছে এই সাংঘাতিক ভাইরাস!'

ঠিক এই সময় চিৎকার করে উঠল রবিন, 'পেয়েছি!' কতগুলো কাগজ নেড়ে দেখাল। 'দু-দিন আগে একটা রাফ প্রিন্ট দিয়েছিলাম লেখাটার। মনে করেছিলাম ফেলে দিয়েছি। কিন্তু আছে। এই যে, ঝুড়িতে পেয়েছি। সামান্য একটু পরিবর্তন করে নতুন করে টাইপ করে নিতে হবে আবার। ব্যস, আর কিছু না। বাঁচলাম।'

হাসি ফুটেছে রবিনের মুখে। মুসার পাশে এসে বসল আবার।

'অত খুশির কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'টাইপ করবে কি দিয়ে? কম্পিউটারই তো কাজ করছে না। আল্লাই জানেন আর কি কি সর্বনাশ হয়েছে! প্রথম ডিস্কটা গেম ডিস্ক, এটা নিয়ে অত মাথা ঘামাই না। কিন্তু ইয়ার্ডের হিসেব-নিকেশের যে ফাইল ছিল, তিন গোয়েন্দার কেসের সমস্ত রিপোর্ট ফাইল যদি চলে গিয়ে থাকে...'

'বলো কি!' আঁতকে উঠল মুসা।

'বহু মাসের কাজ!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের।

ভয়টা এতক্ষণে সংক্রমিত হলো দুই সহকারী গোয়েন্দার মাঝে।

পর্দার আবর্জনার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। নম্বর আর লেখা ফোটার বিরাম নেই পর্দায়। জিরো সেক্টরে এসে ধীরে ধীরে এমন লেখা ফুটল, যার মানে বোঝা যায়। ইংরেজিতে লেখা কথাটার মানে করলে দাঁড়ায়:

স্বাগতম!

হয় পঞ্চাশ লাখ ডলার পরিশোধ করো,

নয়তো তুমি এবং তোমার ডাটা

হারিয়ে যাবে চিরকালের মত!

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'পঞ্চাশ লাখ ডলার দিতে বলছে আমাদেরকে!'

'নাহলে ডাটার মতই আমাদেরও মুছে দেবার হুমকি দিচ্ছে!' বিড়বিড় করল রবিন।

ভারী গলায় কিশোর বলল, 'মনে হচ্ছে সাংঘাতিক কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছি আমরা!'

দুই

'ব্যাপারটা কি, কিশোর? ব্ল্যাকমেল?' রবিনের প্রশ্ন, 'আমাদের পেছনে কে লাগল?'

'যার কপালে দুঃখ আছে!' ভীষণ রাগে চিতার মত গর্জাল মুসা।

'ধীরে, র‍্যাম্বো, ধীরে, আসল কথা শোনো আগে।' দ্রুতে ডিস্ক বদল করল কিশোর, ওটাতেও ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছে কিনা দেখার জন্যে। হতাশায় ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। 'ঘণ্টাখানেক আগে আমাদের কম্পিউটার ক্লাবে রনি ওয়ারনার নামে একজন ফোন করেছিল। বলল, হঠাৎ করেই নাকি তার দুটো ডিস্ক কাজ করছে না।'

'আমাদেরগুলোর মত,' বলল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'গেলাম। ওর কাছে সেক্টর এডিটর আছে। ওর রিংগুলো চেক করতে লাগলাম। জিরো সেক্টরে গিয়ে এই একই কথা...'

'পঞ্চাশ লাখ ডলার দিতে হবে!'

'হ্যাঁ।'

'ও। তারমানে হুমকিটা আমাদের দেয়নি?'

'মনে তো হয় না।'

'আমাদের দেবেই বা কেন?' মুসা বলল, 'পঞ্চাশটা ডলারও নেই এখন পকেটে, লাখ পাব কোথায়?'

'রনির ডিস্কদুটো দেখেই বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'ভাইরাস ইনফেকশন। কয়েক বছর আগের একটা ভাইরাস কেসের কথা মনে পড়ে গেল। কলেজের একজন ছাত্র একটা ভাইরাসের ডিজাইন করেছিল একটা কম্পিউটার কোম্পানির সিকিউরিটি সিসটেম ঠিক আছে কিনা প্রমাণ করার জন্যে। কিন্তু ডিজাইনে ভুল করে ফেলেছিল, তছনছ করে দিল ভাইরাস। ছয় হাজার কম্পিউটারের সর্বনাশ করেছিল, ক্ষতি হয়েছিল দশ কোটি ডলার।'

শিস দিয়ে উঠল মুসা, 'বলো কি!'

'বললাম না, কম্পিউটারের ভাইরাস যে কি ক্ষতি করতে পারে কল্পনাই

করতে পারবে না। রনির ডিস্কে ভাইরাস দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝলাম অনেকদিন ধরে বাসা বেঁধেছে তার কম্পিউটারে। তারমানে ক্লাবের সবার কম্পিউটারেই ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

'তোমরা একে অন্যের ডিস্ক ব্যবহার করো নাকি?' জানতে চাইল রবিন।

'করিই তো,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'রনির গেম ডিস্কটা সবাই ধার নিয়েছে, কপি করে রাখার জন্যে। সে-জন্যেই তার ডিস্কে ভাইরাস দেখে ক্লাবের সবাইকে ফোন করেছে রনি, সাবধান করার জন্যে।'

'ও ভাইরাস আনল কোনখান থেকে?' মুসার প্রশ্ন।

জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে আছে পর্দার দিকে। কয়টা ডিস্ক খারাপ হয়েছে পরীক্ষা করছে সেক্টর এডিটরের সাহায্যে। কয়েক মিনিট পর বলল, 'দুটো পুরোপুরি মুছে গেছে। তিনটার আংশিক ক্ষতি···আরও কত গেছে কে জানে! গেম ডিস্ক আর আমাদের নতুন কেসের ফাইলটা গেছে। আর ইয়ার্ডের কিছু হিসাবপত্র। গেমটার জন্যে ভাবি না, কিন্তু অন্যগুলো···'

'ব্যাকআপগুলোর কি অবস্থা?' রবিন বলল, 'সব কিছুরই তো ব্যাকআপ রাখো দেখেছি।'

'রাখলেই কি? গত হপ্তায় যতগুলোতে কাজ করেছি, আমার ধারণা সব গেছে,' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল কিশোর। এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একগাদা কার্ড বের করল রাবার ব্যান্ড খুলে নিয়ে খুঁজতে শুরু করল ওগুলোর মধ্যে।

'কি খুঁজছ?'

'একজন লোকের ফোন নম্বর। টেমার ভেগাবল, প্রোগ্রামার। গত হপ্তায় লেকচার দিয়ে গেছে আমাদের ক্লাবে। রনিকে গেম ডিস্কটা সে-ই দিয়েছে, তার কাছে অনেকগুলো গেম আছে শুনে নিতে চেয়েছিল রনি। তারমানে টেমারের মেশিনেও ভাইরাস ধরেছে।'

'বলো,' ভীষণ হতাশ হয়ে ফোনটা কিশোরের দিকে ঠেলে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন, 'সু-খবরটা শোনাও!'

'রোববার তো, পাওয়া যাবে কিনা কে জানে,' ডায়াল করতে করতে বলল কিশোর। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আর কোন কাজ না পেয়ে একটা বয়ম থেকে পানাট বাটার বের করে খেতে শুরু করল মুসা। সেই সঙ্গে ইয়াবড় এক সাগরকলা।

ওপাশে রিঙ হচ্ছে। কেউ তুলছে না। মুসার দিকে তাকিয়ে নীরবে হাত বাড়াল কিশোর। খিদে পেয়েছে তারও। উত্তেজনায় মনে ছিল না।

কিশোরকে দিয়ে রবিনকেও দিতে দিতে মুসা বলল, 'খাও। ক্যালোরিতে ভরা।'

'উঁচু মানের প্রোটিন, পটাশিয়ামও আছে প্রচুর,' কিশোর বলল।

'কার্বোহাইড্রেট আর চর্বিরও অভাব নেই,' রবিনের ভুঁড়ি বাড়ানোর ইচ্ছে

নেই. দেহটাকে ছিপছিপে রাখাটা পছন্দ. চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। 'বেশি খাওয়াটা ঠিক না। শরীর ভারী হয়ে যায়।'

'আরে দূর.' তাচ্ছিল্য করে হাত নাড়ল মুসা। 'খেলেই বরং শরীর হালকা লাগে আমার।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে কিশোর বলল. 'জবাব নেই। ওখানেই যেতে হবে আমাদের।' আঙুলে লেগে থাকা পানাট বাটার চেটে পরিষ্কার করতে লাগল।

'এখন?' মুসা বলল. 'এখন পারব না। ভ্যানটা মেরামত শেষ করতে হবে। না হলে পয়সা পাব না। পকেট একেবারে খালি।'

জবাব না দিয়ে ধীরেসুস্থে একটা কলার খোসা ছাড়াল কিশোর। তার ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যায় গভীর চিন্তা চলছে মাথায়। কলাটা একহাতে নিয়ে টেলিফোন ডিরেক্টরি টেনে নিল ঠিকানা বের করার জন্যে। বলল. 'ভ্যান মেরামত পরে করলেও চলবে। ট্রাকটা লাগবে চাচার, সুতরাং তোমার গাড়িটা দরকার হবে। তিন গোয়েন্দার কেস এটা. বুঝতে পারছি। এবং খুব জরুরী কেস।'

'কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকেছে, এটা আর কি এমন জরুরী? মানুষের শরীরে তো ঢোকেনি।'

'এই যে পেয়েছি.' ডিরেক্টরির এক জায়গায় আঙুল রেখে রবিনকে বলল কিশোর, 'টেমারের ঠিকানা. লিখে নাও।' কলার খোসাটা ছুঁড়ে দিল আবর্জনায় প্রায় উপচে পড়া একটা ওয়েস্টবাস্কেটের দিকে। মিস করল। মুসার দিকে তাকাল সে। তার কথার জবাব দিল. 'কি এমন জরুরী, জানতে চাও? ব্যাংকের কম্পিউটার সিসটেমে ভাইরাস ঢুকে পড়লে সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না, বহুলোক তাদের সারাজীবনের সঞ্চয় হারাতে পারে। হাসপাতালের কম্পিউটারে ঢুকলে তো আরও খারাপ অবস্থা। ওষুধ আর ব্যবস্থাপত্র মুছে কিংবা গড়বড় করে দিয়ে রোগী মেরে ফেলতে পারে। আরও যে কত ক্ষতি করবে কল্পনায়ই আসবে না তোমার। যা বলছি শোনো. সব কাজ বাদ. ভাইরাসকে প্রাধান্য দিতে হবে সবার আগে। টেমারের কাছে জানা যেতে পারে সে কার কাছ থেকে গেম ডিস্কটা এনেছে। এভাবে খুঁজতে খুঁজতেই হয়তো আসল অপরাধীর কাছে পৌছে যাব আমরা।'

'কেস তো আসলে দুটো.' দুই আঙুল তুলে মনে করিয়ে দিল মুসা। 'এক. ভাইরাস ছড়াচ্ছে কে জানা। দুই, কেউ একজন কাউকে ব্ল্যাকমেল করছে. কে করছে সেটা বের করা।'

'একটা বেরোলেই আরেকটা বেরিয়ে পড়বে.' উঠে দাঁড়াল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল, 'চলো।'

তিন

মুসার আগের গাড়ি বেচে দিয়েছে। এখন যেটা জোগাড় করেছে, পুরানো একটা নীল রঙের বেবি ডজ। ভেতরে জায়গা খুব কম। সামনে তার পাশে বসল কিশোর। পেছনে রবিন।

এমন একটা জায়গায় পৌছল ওরা, পার্কিঙের জায়গা বড় কম। কিশোর আর রবিনকে নামিয়ে দিয়ে পার্ক করার জায়গা খুঁজতে লাগল মুসা।

রাস্তার দু-ধারে পামের সারি। বাতাসে দুলছে ওগুলোর মাথা। চওড়া একটা হাঁটাপথ ধরে এগোল কিশোর আর রবিন। সামনে এলোমেলো তৈরি একসারি বাড়ি, সব ক'টা গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট। টেলিফোন বুকে এই ঠিকানাই দেখেছে কিশোর। পথের পাশে ফোনবুদে কাঁচের বাক্সে রাখা ছোট আরেকটা ডিরেক্টরিতে জানতে পারল টেমারের বাড়িটার নম্বর সি-এর ৪।

বাগানে খেলা করছে বাচ্চারা। রোববার বলে বাইরে রঙিন ছাতা মেলে তার নিচে চেয়ার-টেবিল ফেলে খাওয়ার আয়োজন করেছে কেউ কেউ।

'কিশোর,' রবিন বলল, 'বার্গারের দুর্দান্ত গন্ধ আসছে।'

'খবরদার, মুসাকে বোলো না। গিয়ে চেয়েই বসতে পারে ওদের কাছে।'

'চেয়ারেও বসে যেতে পারে,' হাসল রবিন।

মূল রাস্তা থেকে শ-খানেক গজ দূরে একটা কোণে সি-এর ৪। আশপাশের অন্য বাড়িগুলোর মতই এটাতে যাওয়ার সরু পথটার ধারেও ফুলগাছ লাগানো। রেডউডের বারান্দা, উঁচু সদর দরজা

বারান্দায় উঠে বলে উঠল রবিন, 'খবরের কাগজ! গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার।'

দুটো খবরের কাগজ পড়ে আছে দরজার সামনে। তুলে নিয়ে দেখল কিশোর। পড়ে বলল, 'শনিবার আর রবিবারের সকাল, দু-দিনের।'

ডাকবাক্সের ঢাকনা তুলল রবিন। 'একটা গ্যাসের বিল আর একটা কম্পিউটার ম্যাগাজিন। শনিবার, অর্থাৎ গতকাল সকালেই এসেছে নিশ্চয়।'

কলিং বেলের ঘন্টার বোতাম টিপে কিশোর বলল, 'টেমার বোধহয় বাড়ি নেই।'

'ছুটিতে বেড়াতে যেতে পারে।'

পনেরো সেকেন্ড অপেক্ষা করল কিশোর। আবার বোতাম টিপল। কান ঠেকাল দরজায়। সামনের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ভেতরে দেখার চেষ্টা করল রবিন। কিন্তু ভারী পর্দার জন্যে ভেতরে গেল না দৃষ্টি।

এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কিশোর। হাত তুলে আরেকটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'ম্যানেজারের।'

'চলো, দেখা করি।'

বারান্দা থেকে নেমে অন্য বাড়িটার দিকে এগোল ওরা।

টেমারের বাড়িটার মতই অবিকল আরেকটা বাড়িতে বাস করে ম্যানেজার। টেলিফোন বুদে ডিরেক্টরি ঘাঁটার সময়ই নম্বরটা দেখে নিয়েছিল কিশোর। কলিং বেলের বোতামের ওপর একটা সাদা প্লেটে লেখা: MANAGER.

বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ শুরু করল একটা কুকুর।

'ডাক শুনে তো মনে হচ্ছে বাঘের বাচ্চা,' বলল কিশোর, 'অনেক বড়।'

'কামড়াবে না তো!'

'কি করে বলি? ডাকটা সুবিধের না।'

দরজার ওপাশে মেঝেতে নখের আওয়াজ পাওয়া গেল। বেরোনোর জন্যে পাগল হয়ে গেছে যেন জানোয়ারটা।

'থাম, এলিফ্যান্ট, থাম!' চিৎকার করে বলল একজন মহিলা। 'চুপ কর!'

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন।

'এলিফ্যান্ট?' রবিনের প্রশ্ন।

'অসুবিধে কি? কুকুরের নাম যদি টাইগার, লায়ন, এমনকি জাগুয়ারও হতে পারে, হাতি হলেই বা ক্ষতি কি? নাম নামই।'

'নাম নামই, সে তো বুঝলাম। কিন্তু দুনিয়ায় এত জানোয়ার থাকতে হাতির সঙ্গে কুকুরের মিলটা কোথায় দেখল?'

ঘেউ ঘেউ থামল। খুলে গেল দরজা। দেখা দিলেন মহিলা। লাল টুকটুকে গাল; ধূসর চুল।

'বলো?' মহিলার জগিং স্যুটের কোমরের পাশ দিয়ে উঁকি দিল একটা কালো নাক, তারপর বেরোল বিশাল মাথাটা।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল কিশোর। তাকিয়ে আছে মস্ত কুকুরটার দিকে। ওজন একশো আশি পাউণ্ডের কম হবে না। হাতি নামটা বেমানান নয়। 'টেমার ভেগাবলকে খুঁজছি আমরা। আপনার পড়শী।'

হঠাৎ পুরো খুলে গেল পাল্লা। লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল এলিফ্যান্ট।

সরে যাওয়ার চেষ্টা করল দুই গোয়েন্দা। সুবিধে করতে পারল না।

'মাগ্গোহ!' করে কিশোর পড়ল একটা ফুলের টবের ওপর। তার কাঁধে দুই পা তুলে দিল কুকুরটা। বেরিয়ে এল বিশাল লকলকে জিভ। চেটে দিতে লাগল কিশোরের গাল, নাক, কপাল।

হাসিতে ফেটে পড়ল রবিন।

'এলিফ্যান্ট, তোর লজ্জা হওয়া উচিত!' ধমক দিলেন মহিলা। চামড়ার গলাবন্ধ ধরে টানতে লাগলেন।

'সর, হাতি, সর!' কুকুরটাকে গায়ের ওপর থেকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা

করল কিশোর। গলা কাঁপছে।

সরল না কুকুরটা। এত ভারী, ঠেলে একচুলও নড়াতে পারল না কিশোর। আদরের নেশায় পেয়েছে যেন কুকুরটাকে

রবিনও এসে হাত লাগাল মহিলার সঙ্গে কলার ধরে টানতে লাগল। হাসির জন্যে কথা বলতে পারছে না।

শেষবারের মত কিশোরের মুখ চেটে নিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তার গায়ের ওপর থেকে নেমে এল এলিফ্যান্ট।

উঠে দাঁড়াল কিশোর চেহারাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। বোঝাতে চাইছে ভয় পায়নি ও।

'শয়তান কুত্তা!' সাংঘাতিক রেগে গেছেন মহিলা। 'যা ঘরে যা! আবার বেরোলে হাড্ডি ভেঙে ফেলব!'

লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে ঘরে চলে গেল কুকুরটা।

ছেলেদের দিকে তাকালেন মহিলা, 'দেখতেই বড়, আসলে মনটা খুব নরম। একেবারে শিশুর মত। কারও ওপরই ওরকম করে গিয়ে পড়ে না। আর একজনের ওপর মাত্র পড়েছিল, আমার বোনঝির ওপর। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। পানাট বাটার আর জেলি স্যান্ডউইচ খাচ্ছিল সে। এলিফ্যান্ট গেল পাগল হয়ে। পানাট বাটার খুব পছন্দ তার, গন্ধ পেলেই হলো।'

হা-হা করে হেসে উঠল রবিন। কিছুতেই আর থামাতে পারছে না

কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন মহিলা, 'সঙ্গে পানাট বাটার আছে নাকি তোমার?'

কুকুরটার অদ্ভুত আচরণের কারণ বুঝতে পেরে লাল হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। আমতা আমতা করে বলল, 'পকেটে নেই··· যাকগে, যা বলছিলাম। মিস্টার ভেগাবল···'

'হ্যাঁ।' ঘরে থাকতে পারেনি কুকুরটা, আবার উঁকি দিল, তার মাথায় আদর করে চাপড় দিয়ে মহিলা বললেন, 'এই নিয়ে তিনবার তার খোঁজ করতে লোক এল আজ অবাক লাগছে খুব শান্ত মানুষ তিনি। খানিকটা পাগলাটে, কিন্তু সেটা তো আমরা সবাই, তাই না?' হেসে এলিফ্যান্টের কানের গোড়া চুলকে দিলেন তিনি।

'অন্য দু-জন কারা এসেছিল?' জানতে চাইল কিশোর।

'নাম জিজ্ঞেস করিনি।'

'চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন? কখন এসেছিল?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন মহিলা। 'একজন এসেছিল আজ সকালে। মাথায় টাক, চেহারাটা কুৎসিত—দেখলে ভয় লাগে বিজনেস স্যুট পরা ছিল। আরেকজন এসেছিল এই খানিক আগে। কালো চুল। গায়ে ছিল গাঢ় সবুজ উইন্ডব্রেকার, পায়ে সাদা স্নীকার।' রবিনের জুতোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর গুলোর মত।'

তথ্যটা মনে গেঁথে নিল কিশোর—ওরা ছাড়াও আরও লোক খুঁজতে

এসেছে! ভাইরাসের ব্যাপারেই নয়তো?

'কেন এসেছে, বলেছে?'

'বলেছে, বন্ধু দেখা করতে এসেছে। তোমরাও কি বন্ধু?'

'অনেকটা। যে কম্পিউটার ক্লাবের মেম্বার আমি, তিনিও মাঝে মাঝে ওখানে যান। তিনি এখন কোথায় বলতে পারবেন?'

'কয়েকদিনের জন্যে শহরের বাইরে গেছেন। কোথায় গেছেন বলে যাননি। কেন জানি আমার মনে হচ্ছে শীঘ্রি ফিরে আসবেন

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে এল গোয়েন্দারা বার দুই খেঁক্ খেঁক্ করে বিদায় জানাল এলিফ্যান্ট। ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল পাল্লাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে

'তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে কুত্তাটা, কি বলো?' আবার হাসতে শুরু করল রবিন। 'কি, চুপ করে আছ কেন? আর খাবে পানাট বাটার? ভাগ্যিস মুসা আসেনি, তাহলে তার মুখের ছালই তুলে ফেলত রাক্ষসটা

'অত ছ্যাঁচোমি আর দেখিনি কোন কুকুরের!' মুখ গোমড়া করে বলল কিশোর।

কমপ্লেক্সের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে গেছে একটা পথ, সেটা ধরে হাঁটতে লাগল সে

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কই যাও? রাস্তা তো ওদিকে।'

'টেম্বারের ঘরটা দেখব।'

শেষ বিকেলের লম্বা ছায়া পড়েছে সবখানে। তার মধ্যে দিয়ে হাঁটছে দুই গোয়েন্দা শার্ট-প্যান্ট পরা, সোনালি চুল একটা মেয়ে বাগানের গাছে পানি দিতে দিতে মুখ তুলে তাকাল।

ওদের দিকে হাত নাড়ল মেয়েটা।

কিশোর চুপ করে রইল। হেসে হাত নেড়ে জবাব দিল রবিন।

ওরা কারা, কোথা থেকে এসেছে জানার কৌতূহল বোধহয় মেয়েটার, কিন্তু জবাব দেয়ার জন্যে দাঁড়াল না কিশোর, রবিনকেও দাঁড়াতে দিল না।

টেম্বারের বাড়ির কাছে চলে এল ওরা। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল কিশোর, কেউ লক্ষ করছে কিনা। বারান্দার ধার দিয়ে ঘুরে চলে এল একপাশে। তিনটে জানালা আছে। প্রথমটায় নাক ঠেকিয়ে ভেতরে তাকাল। পর্দা টানা নেই এ পাশে। লিভিং রুমের ভেতরে নজর গেল। সব এলোমেলো হয়ে আছে, যেন ঝড় বয়ে গেছে। সমস্ত ড্রয়ার মেঝেতে নামানো, ছড়িয়ে আছে কাগজপত্র, উপুড় করে ফেলে রাখা হয়েছে একটা ওয়েস্টবাস্কেট, ভেতরের জিনিস মেঝেতে ছড়ানো।

বন্ধ জানালাটা খোলার চেষ্টা করল সে। পারল না। দ্বিতীয় জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। এটাও লিভিং রুমের। এক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। এটা খুলতে আর অসুবিধে হলো না। জানালার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকল কিশোর।

পড়ে থাকা জিনিসগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না, সোজা কম্পিউটারের দিকে রওনা হলো সে। কভারটা খুলে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে। ডিস্কবক্সটা খোলা। ডিস্কগুলোর মধ্যে গেম ডিস্কটা খুঁজল ও। পেল না। কম্পিউটারের স্লটে একটা ডিস্ক ঢুকিয়ে দিয়ে সহজেই খুলে ফেলল সমস্ত ফাইল। আরও দুটো ডিস্ক পরীক্ষা করে দেখল।

ভাইরাসে ধরেনি এগুলোকে।

হাঁটু গেড়ে বসে মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসের মধ্যে কি যেন খুঁজতে শুরু করল কিশোর।

গাদা করে ফেলে রাখা কিছু পেপারব্যাক বইয়ের দিকে এগোতেই কেঁপে উঠল মেঝের তক্তা। স্তব্ধ হয়ে গেল ও। বোঝার চেষ্টা করল কিসে নেড়েছে।

কানে এল চাকার ওপর ভর করে ভারী কিছু গড়িয়ে আসার শব্দ।

ঝট করে ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ছুটে আসছে একটা ঠেলাগাড়ি, ভারী মাইক্রোওয়েভ কার্ট। সোজা ওর দিকে।

চার

ধক করে উঠল বুক। ডাইভ দিয়ে একপাশে সরে গেল কিশোর। গাড়িটা চলে গেল ইঞ্চিখানেক দূর দিয়ে। ওটার বাতাস এসে লাগল গায়ে।

গাড়িটা চলে যাওয়ার পর পরই পাশ দিয়ে ছুটে গেল সাদা জুতো পরা একজোড়া পা। পরনে সবুজ জ্যাকেট। সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। কিশোর যখন বারান্দায় এসে দাঁড়াল, লোকটা তখন হারিয়ে যাচ্ছে পথের গাছপালার আড়ালে।

'কিশোর?' দৌড়ে আসছে রবিন, 'কি হয়েছে?'

'লোকটার চেহারা দেখেছ?'

'না, শুধু পেছনটা। কি হয়েছে?'

হাত নেড়ে উঠে আসার ইশারা করল কিশোর রবিন উঠলে নীরবে আবার হাত তুলে ঘরের ভেতরটা দেখাল।

আঁতকে উঠল রবিন। 'সর্বনাশ! তুমি করেছ এ কাজ?'

'না। মনে হয় ওই লোকটা আমার গায়ে ঠেলাগাড়ি ফেলতে চেয়েছিল কি ঘটেছে রবিনকে খুলে বলল কিশোর। তারপর বলল, 'টেমারের ডিস্ক ঠিকই আছে। তাহলে কি খুঁজতে এসেছিল লোকটা? নিশ্চয় ভাইরাস।'

'চলো, কেউ দেখে ফেলার আগেই পালাই নইলে সব দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপবে।'

তাড়াতাড়ি দরজা লাগিয়ে দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল দুই গোয়েন্দা। হাঁটাপথ ধরে এগোল।

'লোকটার সবুজ জ্যাকেট আর সাদা জুতো দেখেছ?' রবিন বলল. 'ম্যানেজার এই লোকের কথাই বলেছেন।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমি দেখার আগেই ও আমাকে দেখে ফেলল। খারাপ হয়ে গেল ব্যাপারটা।'

এই সময় নাম ধরে ডাকতে শুনে ফিরে তাকাল দু-জনে। মুসা আসছে।

ও কাছে এলে কিশোর বলল, 'আর পাঁচ মিনিট আগে আসতে পারলে না? কাজে লাগতে।'

'কি করে আসব? গাড়ি রাখার জায়গা আছে নাকি এখানে! হয়েছে কি?'

কি হয়েছে মুসাকে জানাল কিশোর। মাঝে মাঝে ওকে সাহায্য করল রবিন।

'তোমাকে আঘাত করতে চাইল কেন?' মুসার প্রশ্ন। 'কিছু পেয়েছ নাকি?'

'নাহ্.' মাথা নাড়ল কিশোর।

গাড়ির কাছে পৌছল তিন গোয়েন্দা। পেছনের সীটে উঠে বসল কিশোর। বলল. 'আঘাত করার ইচ্ছে বোধহয় অতটা ছিল না। আসলে আমার নজর আরেক দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিল. যাতে তাকে না দেখি। ভাবছি. হঠাৎ করে এত লোক যে দেখা করতে আসবে বুঝে ফেলেছিল নাকি টেমার? সে-জন্যেই পালিয়েছে?'

'ভাল লোক তো আসছে না,' বলল রবিন। মুসার পাশে প্যাসেঞ্জার সীটে বসেছে সে। 'আচার-আচরণ যা করছে তাতে সুবিধের মনে হচ্ছে না একজনকেও।'

গাড়ি চালাল মুসা। পথে আর তেমন কোন কথা হলো না। চুপ করে ভাবছে কিশোর, লোকটা কেন ঢুকেছিল টেমারের ঘরে? কি খোঁজার জন্যে?

ইয়ার্ডে পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

দেখে গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিকি পাঞ্চ। আবার ফিরে এসেছে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যায় সে, ফিরেও আসে তেমনি করেই। মোটর গাড়ির জাদুকর বলা যায় তাকে।

'নিকিভাই এসেছ!' চিৎকার করে এগিয়ে গেল মুসা।

'তোমার ভ্যানটায় তো ইঞ্জিনের গোলমাল.' হেসে বলল নিকি।

'ও, দেখে ফেলেছ! ঘটনাটা কি বলো তো?'

গাড়ি নিয়েই আলোচনা চলবে এখন মুসা আর নিকির মাঝে কিশোরের মাথায় ঘুরছে ভাইরাস। ইঞ্জিনের ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারল না।

জিজ্ঞেস করল নিকি, 'ব্যাপার কি? কোন নতুন কেস?'

সংক্ষেপে ভাইরাসের কথা জানাল কিশোর।

আবার জানতে চাইল মুসা, 'ইঞ্জিনের ঘটনাটা কি? গোলমাল কোথায়?'

'ইঞ্জিনের কমবাসন চেম্বারে তেল আর বাতাস মিশে জ্বলে ওঠায় শক্তি

তৈরি হয়, জানো।' বুঝিয়ে দিল নিকি, 'মাঝে মাঝে এই মিশ্রণে গোলমাল হয়ে যায়। তখনই বার্স্ট করে, পিস্তলের গুলি ফোটার মত শব্দ হয়। তোমার ইঞ্জিনের কমবাসন চেম্বারে এই মিশ্রণের গোলমাল হচ্ছে।'

'ইঞ্জিন ঠিকমত চলে না, এটা তো দেখলামই। আর কোন ক্ষতি করে?'

'করে। ডেটোনেশন ঠিক না হলে চেম্বারের তাপমাত্রা এত বাড়া বেড়ে যায়, ধাতু গলিয়ে ফেলে। পিস্টন আর ভালভ-এর অবস্থা শেষ করে দেয়।'

আঁতকে উঠল মুসা, 'খাইছে!'

'অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' হেসে বলল নিকি। 'তোমারটার কিছুই হয়নি। সামান্য টিউনিং করে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'সামান্য টিউনিঙেই?'

'হ্যাঁ। ইগনিশন টাইমিংটা বন্ধ হয়ে আছে, আর কিছু না।'

'অথচ এত চেষ্টা করেও ধরতে পারিনি আমি...'

আচমকা চিৎকার করে উঠল রবিন, 'কিশোর, দেখো!'

ফিরে তাকাল চারজনেই।

ততক্ষণে দৌড়াতে শুরু করেছে রবিন। চেঁচিয়ে বলল, 'একটা লোক, নজর রাখছিল! গায়ে সবুজ জ্যাকেট, পায়ে সাদা জুতো!'

পাঁচ

গেটের দিকে দৌড় দিল ওরা। ছায়ায় ঢাকা রাস্তার এ-মাথা ও-মাথা দেখল। কেউ নেই।

'কোথায় গেল?' মুসার প্রশ্ন।

'ওদিকে,' রাস্তার লাইটপোস্টের পাশে একটা মরিচ গাছের ওদিকটা দেখিয়ে বলল রবিন।

গর্জে উঠল একটা মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন। পরক্ষণে বন্ধ হয়ে গেল।

'ওই যে!' রবিন বলল।

মোটরসাইকেলের দিকে দৌড় দিল ওরা।

আবার স্টার্টারে কিক দিল লোকটা। গর্জে উঠল ইঞ্জিন, এবার বন্ধ হলো না।

'এসো!' বলেই ঘুরে তার গাড়িটার দিকে দৌড় দিল মুসা।

গেটের কাছেই পার্ক করা আছে গাড়িটা। তাতে চড়ল তিন গোয়েন্দা। তীব্র গতিতে ছুটে বেরোল গাড়ি।

'ওই, ওই তো!' একটা রাস্তার দিকে হাত তুলল কিশোর।

অন্য দু-জন তাকাতে তাকাতে পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মোটরসাইকেল।

মোড় ঘুরতেই আবার চোখে পড়ল লোকটাকে।

উত্তেজিত হয়ে সামনে ঝুঁকে আছে তিনজনে।

রবিন বলল, 'ধরা দরকার!'

তাকিয়ে আছে মুসা। আবার মোড় নিল মোটরসাইকেল। হারিয়ে গেল একটা ব্লকের মাঝের গলিপথে।

পিছে লেগে রইল মুসা। গলিতে ঢুকতেই চোখে পড়ল একটা পাবলিক পার্কিং লট। মোটরসাইকেলটা উধাও।

'এদিকেই ঢুকেছিল?' শূন্য পার্কিং লটের দিকে তাকিয়ে থেকে মুসাকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আর কোথায় যাবে?' এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ কমাল মুসা। ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে এগোল গাড়ি। অস্বাভাবিক নীরব লাগছে পার্কিং লটটা।

'এত চুপচাপ কেন?' এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল রবিন, 'এ তো কবর।'

'ইঞ্জিনের শব্দ নেই কেন?' বিড়বিড় করল কিশোর। 'গেল কোথায়?'

লটের অন্য প্রান্তে চলে এল গাড়ি।

সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে আছে গোয়েন্দারা, দেখে বোঝার চেষ্টা করছে কোথায় যেতে পারে মোটরসাইকেলটা।

'বাতাসে মিলিয়ে গেল মনে হয়!' বিস্ময় চাপতে পারল না রবিন।

তারপর, হঠাৎ করেই আবার গর্জে উঠল ইঞ্জিন। চমকে গেল গোয়েন্দারা।

'ওই তো!' চিৎকার করে বলল মুসা। বড় একটা ডাস্টবিনের অন্যপাশ থেকে বেরিয়ে এল হেডলাইটের আলো। ওদের পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেল মোটরসাইকেল। আলো নিভিয়ে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ।

প্রাণপণে গাড়ি ঘোরাতে শুরু করল মুসা।

ইতিমধ্যে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল মোটরসাইকেল।

মাথা ঘুরছে কিশোরের।

'গেল আবার!' গুঙিয়ে উঠল রবিন।

'এত সহজেই!' মুসা বলল, 'শক্ত হয়ে বসো!'

এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ অনেকখানি বাড়িয়ে দিল সে। তীব্র গতিতে ছুটতে লাগল ছোট গাড়িটা।

'উফ্, পেটের মধ্যে এমন করছে কেন!' দু-হাতে পেট চেপে ধরেছে কিশোর। মনে হচ্ছে খিদের জন্যেই মাথা ঘুরছে। কিংবা কলা আর পানাট বাটার একসঙ্গে খাওয়াটা ঠিক হয়নি, হজমে গোলমাল করছে।

আবার গর্জে উঠল মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন, আলছা অন্ধকারের চাদর ফুঁড়ে দিল হেডলাইট। সেদিকে ছুটল মুসা

'আরও জোরে!' চেঁচিয়ে বলল রবিন। 'ধরতেই হবে!'

পথের মোড় ঘুরল মোটরসাইকেল।

মুসাও ঘুরল। ঘুরেই গুঙিয়ে উঠল, 'খাইছে!' সামনে একঝাঁক

মোটরসাইকেল, মোটরসাইকেলের গ্যাং। আরোহীদের পরনে চামড়ার পোশাক, লম্বা চুল ঘোড়ার লেজের মত করে বাঁধা, হাতে ট্যাটু আঁকা। ফিরে তাকাল একজন। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। একই গতিতে চলছে, পথ ছাড়ার কোন লক্ষণ নেই। যেন দেখেইনি গাড়িটাকে।

'পাগল হয়েছে।' হতাশ হয়ে সীটে হেলান দিল কিশোর।

'আর ধরতে পারব না,' মুসাও আশা ছেড়ে দিয়েছে।

'কি আর করা,' চুলে আঙুল চালাল রবিন।

ইয়ার্ডের দিকে গাড়ি ঘোরাল মুসা। জোরে জোরে নিজেকে প্রশ্ন করল, 'লোকগুলো কে?'

রাত হয়ে গেছে। সেদিনকার মত ইয়ার্ডের বিক্রি বন্ধ। রবিনের কাজ আছে, লাইব্রেরির [illegible] যেতে হবে। রওনা হয়ে গেল।

গ্যারেজে আলো জ্বলছে। কাজ করছে নিকি। ভ্যানের টিউনিঙের কাজ।

'তারপর? হলো?' ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল নিকি।

তাকে সব কথা জানিয়ে কিশোরের ওঅর্কশপে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। বড় কাজের টেবিলটায় ইলেকট্রনিক জিনিসের অভাব নেই। তিনটে কম্পিউটারের টুকরো-টাকরা, নানা রকম যন্ত্রপাতি, তার, বাতিল টিভি সেট, ভি. সি. আর, টেপ ডেক পড়ে আছে মেরামতের অপেক্ষায়।

রেফ্রিজারেটর থেকে সোডার ক্যান বের করে কিশোরকে দিল মুসা।

অতিরিক্ত পেকে যাওয়া একটা কলার খোসা ছাড়িয়ে তাতে পানাট বাটার মাখিয়ে নিল কিশোর। এর জন্যেই পেটে মোচড় দিচ্ছে কিনা শিওর হতে চায়।

দরজায় উঁকি দিল নিকি, 'এটা কি?'

'খাবার,' এক কামড়ে কলার তিন ভাগের একভাগ কেটে নিয়ে চিবাতে লাগল কিশোর। 'খিদে পেয়েছে।'

'এটা একটা খাবার হলো!'

'কেন, খেতে তো খারাপ লাগছে না।'

'এই জিনিস তো হাতিতে খায়। বেশি খেলে মুটিয়ে যাবে।'

নিকির কথায় মুসাও হাসতে লাগল।

তাদের হাসির পরোয়া করল না কিশোর। শান্তকণ্ঠে বলল, 'এই জিনিস বানরেও খায়। কই, ওরা তো মোটা হয় না। বরং অনেক বেশি স্লিম। অনেক বেশি এনার্জি। কিছুতেই ক্লান্ত হয় না।' কলায় বড় আরেক কামড় বসাল সে। 'আমিও দেখি চেষ্টা করে। [illegible] করতে দোষ আছে?'

'তা নেই।' মাথা নাড়ল নিকি। চেয়ারে ফেলে রাখা খালি কয়েকটা বাক্স মাটিতে ফেলে দিয়ে তাতে বসল। হাতে সোডার ক্যান।

কলা খাওয়া শেষ করে বড় একটা কী-বোর্ড টেনে নিল কিশোর।

'একটা ব্যাপার হিসেবের মধ্যে রাখতে পারো,' নিকি বলল, 'ওই টেমার

আর সবুজ উইন্ডব্রেকারের মধ্যে কোন একটা সম্পর্ক আছে

'কিন্তু সবুজ জ্যাকেটের সঙ্গে ভাইরাসের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা-ও আমরা জানি না,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'টেমারকে পেলে কাজ হত,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর।

ওপর দিকে মুখ করে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল সে হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটুকরো কাগজ বের করল, তাতে টেমার ভেগাবলের নাম আর টেলিফোন নম্বর লেখা।

'এটা কি দরকার?' জানতে চাইল মুসা

'টেমার কোথায় কাজ করে ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু বিবিএস-এ নোটিশটা টানিয়ে দেব...'

হাত তুলল নিকি, 'বিবিএসটা কি?'

'এক ধরনের ইলেকট্রনিক বুলেটিন বোর্ড সিসটেম,' বুঝিয়ে দিল কিশোর। 'কম্পিউটারে একে কল করতে পারো তুমি, স্ক্রীনে দেখিয়ে দেবে তোমাকে বিবিএস-এ কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা তাদের মেসেজ রেখে আসে, দরকারে কারও সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করে, সফটওয়্যার শেয়ার করে...এবং কম্পিউটার প্রোবলেম সমাধান করতে সাহায্য করে একে অন্যকে...'

'বুঝলাম,' আবার বাধা দিল নিকি। 'কিন্তু তুমি নোটিশ রেখে এসে কি সাহায্য চাও?'

'আমাদের কম্পিউটার ক্লাব যখন ঠিক করল বাইরে থেকে লেকচারার আনাবে, তখন ভলান্টিয়ারের জন্যে মেসেজ দিয়েছিলাম আমি। টেমার ভেগাবল ফোন করে বলল কম্পিউটার গেম ডিজাইনিঙের ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়...'

'হয়েছে, মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার!' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল নিকি, 'কম্পিউটার আমার দরকার নেই। যেটা বুঝি সেটা করিগে।'

হাসল কিশোর, 'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও আমি আসলে বলতে চাই, নরটন করপোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আমাদের টেমার বলেছিল সে ওখানে প্রোগ্রামারের কাজ করে। এই কাগজটাতে লিখে নিয়েছিলাম।'

কিছু না বলে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল নিকি।

'কাল সোমবার,' কিশোর বলল। টেলিফোন ডিরেক্টরি টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল। 'অফিস খুলবে। গিয়ে দেখতে পারি টেমার এল কিনা।'

'তা পারো,' সোডার খালি ক্যানটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নিকি। 'তুমি ঠিকানা খুঁজতে থাকো, আমি আমার কাজ করিগে। মুসা, আসবে?'

'চলো,' নিজের ক্যানটাও ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'ভ্যানটা সারানো খুব জরুরী। হাতে টাকাপয়সা একদম নেই।'

দরজার দিকে রওনা দিল দু-জনে।

কিশোর বলে উঠল, 'আশ্চর্য! নরটন করপোরেশন বলে তো কিছু নেই ডিরেক্টরিতে!'

'ইনফরমেশনে খোঁজ নাও,' পরামর্শ দিল মুসা।

তাই করল কিশোর। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অপারেটরের কথা শুনল। মুসা আর নিকির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে জানাল, 'তার খাতায় নেই। নামটা নাকি শোনেওনি কখনও।'

'যে প্রতিষ্ঠানটা নেইই সেখানে কাজ করে কি ভাবে একজন লোক?'

'মিথ্যে কথা বলেছে হয়তো।'

মুসা বা নিকির কিছু করার নেই এ ব্যাপারে। বেরিয়ে গেল ওরা।

আরেকটা কলার খোসা ছাড়িয়ে তাতে পানাট বাটার মাখাল কিশোর। গভীর ভাবনা চলেছে মাথায়। জট ছাড়ানোর চেষ্টা করছে সমস্যাটার। আপনমনেই মাথা নাড়াল। পারছে না। অত সহজ না ব্যাপারটা।

খাওয়া শেষ করে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল সে। কম্পিউটারে জমে যাওয়া ভাইরাসের আবর্জনা পরিষ্কার করতে লাগল। একসময় ফোন করে রনি জানাল—ক্লাবের সব সদস্যের কম্পিউটারেই ভাইরাসের আক্রমণ হয়ে গেছে। যাদেরকে ডিস্ক ধার দিয়েছে, সবাইকে ফোন করে সাবধান করে চলেছে। কিশোরকেও সাহায্য করতে অনুরোধ করল।

কম্পিউটার পরিষ্কার শেষ করে ফোন করা শুরু করল কিশোর। উঠল মাঝরাতে। বহু আগেই বাড়ি চলে গেছে মুসা, নিকি কোথায় গেছে কে জানে।

হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে, নির্জন, নিঃশব্দ ইয়ার্ডের বিশাল চত্বর পেরিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকল কিশোর। নিজের ঘরে এসে দাঁত ব্রাশ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। বড় বেশি ক্লান্ত। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

স্বপ্ন দেখতে লাগল, সব ঝামেলা মিটে গেছে, আবার স্বচ্ছন্দে কাজ করছে কম্পিউটার···

হঠাৎ কানে ঢুকল শব্দটা। চমকে জেগে গেল সে। অন্ধকার ঘরে চোখ বুলিয়ে দেখার চেষ্টা করল।

আবার শুনতে পেল শব্দ।

ঘরে নয়। বাইরে।

ছয়

জোরে জোরে দু-বার দম নিয়ে চুপ করে পড়ে রইল সে। আবার শোনার আশায়। শব্দ হলো। বুঝতে পারল কোথায় হয়েছে। ঢিল পড়েছে জানালায়। মেরিচাচী আর রাশেদ পাশাকে না জানিয়ে কেউ তাকে জাগানোর চেষ্টা করছে।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে জানালা খুলে নিচে তাকাল। 'নিকিভাই! দাঁড়াও, আসছি।'

পা টিপে টিপে নিচে নেমে দরজার তালা খুলে বেরোল কিশোর। 'কি ব্যাপার?'

'জেনে এসেছি,' বারান্দার আলো পড়েছে নিকির মুখে। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে এ কান ও কান।

'আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম। নরটন করপোরেশনের ঠিকানা জেনে এসেছি।' তেলকালি লেগে থাকা একটুকরো কাগজ কিশোরের হাতে ধরিয়ে দিল নিকি।

'কি করে পেলে!'

'নামটা গেঁথে ছিল মাথায়। কয়েক দোস্তকে জিজ্ঞেস করলাম। একজন বলল, সে দেখেছে। জায়গাটার নাম বলল। মনে পড়ল তখন, আমিও দেখেছি। কয়েক মাস আগে ওই রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়েছিলাম, তখন চোখে পড়েছে সাইনবোর্ড।'

কাগজে লেখা ঠিকানাটার দিকে তাকাল কিশোর। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, নিকিভাই। কিছু খাবে?'

'না না, মাপ করো,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল নিকি। 'শুধু কলা জিনিসটাই ভাল্লাগে না আমার, তার ওপর আবার মাখন! বাপরে বাপ! খেতে চাপাচাপি না করলেই বরং ধন্যবাদ দেব। আমি যাই।...ও হ্যাঁ, ঠিকানাটা পাওয়ার পর গিয়েছিলাম করপোরেশনের কাছ থেকে একটু ঘুরে আসতে। দেখে ভাল লাগল না আমার।'

'খারাপটা কি লাগল?'

মাথা নাড়ল নিকি, 'কি জানি! বলতে পারব না।'

যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও পরদিন সকালে উঠেই বেরোতে পারল না কিশোর। ইয়ার্ডের অনেক কাজ চেপে গেল। কিছুতেই বেরোতে দিলেন না তাকে মেরিচাচী।

মুসাও ব্যস্ত রইল। ভ্যানের ইঞ্জিন মেরামত হয়ে গেছে। ওটাকে রঙ করতে লাগল সে।

রবিন আসেইনি। সে-ও কাজে ব্যস্ত।

দুটোর সময় কিশোরকে মুক্তি দিলেন চাচী। ততক্ষণে মুসারও স্প্রে করা প্রায় শেষ।

'আর কতক্ষণ?' তাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এই তো, দশ মিনিট।'

'করো। আমি খাবার নিয়ে আসি।'

মুসার স্প্রে শেষ হলো। খেতে বসল দু-জনে। ইতিমধ্যে এসে হাজির হলো রবিন। কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'অত জরুরী তলব কেন? বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতে বের করে দিল মা। বলল, তুমি নাকি আসতে বলেছ।'

একটা স্যান্ডউইচ বাড়িয়ে দিল কিশোর, 'খাবে?'
মাথা নাড়ল রবিন, 'না, খেয়ে এসেছি।'
'ও। চলো, এক জায়গায় যাই।'
'কোথায়?'
'নরটন করপোরেশন।'
'খুঁজে পেয়েছ?'
'নিকিভাই পেয়েছে।' সব জানাল কিশোর।
'কিন্তু তার ভাল লাগল না কেন?'
'বুঝতে পারছি না। গেলেই হয়তো বুঝব।'
মুসার ছোট গাড়িটাতে উঠে বসল তিনজনে।
বিশ মিনিট পর রকি বীচ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার একটা সরু, ধুলোঢাকা গলিতে বাড়িটা খুঁজে পেল ওরা। ধূসর রঙ করা একটা পুরানো অনেক বড় বাড়ি, উঁচু দেয়ালে ঘেরা। বাড়ির সদর দরজার ওপরে কাঠের একটা সাইনবোর্ডে লেখা কোম্পানির নাম, মলিন হয়ে এসেছে লেখাগুলো। কি জিনিস তৈরি করে, কিংবা কি কাজ করে, কোথাও লেখা নেই।
'ভূতের বাড়ি নাকি?' মুসা বলল, 'নিকিভাইয়ের বোধহয় এ জন্যেই ভাল লাগেনি।'
জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে আছে উঁচু দেয়ালের দিকে। দেয়ালের ওপরের অংশটা আরও উঁচু করা হয়েছে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। ভেতরে মূল বাড়িটা ছাড়াও আরও ছোট ছোট ঘরবাড়ি আছে, বড় গাছ আছে।
'পাহারা আছে কিনা দেখা দরকার,' রবিন বলল।
বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখে আসার জন্যে আবার স্টার্ট দিল মুসা। ঢোকার এবং বেরোনোর আলাদা আলাদা গেট, দেয়ালের চেয়ে দুই ফুট উঁচু ভারী ইস্পাতের গেট লাগানো। একটা গেটের পাশে ইলেকট্রনিক সেন্ট্রি বক্স।
'বড় বড় ব্যাংকে থাকে ও রকম,' আনমনে নিজেকেই বলল কিশোর। 'কর্মচারীদের কাছে প্লাস্টিকের আইডেনটিটি কার্ড থাকে। স্লটে ঢোকালে নম্বর পড়ে চিনে নেয় ইলেকট্রনিক চোখ। চিনতে পারলে গেট খুলে ঢুকতে দেবে, নাহলে বন্ধ।'
রবিন বলল, 'কিন্তু এখানে এত কড়াকড়ি কেন?'
'কেউ যাতে ঢুকতে না পারে।'
'তারমানে কিছু লুকিয়ে রাখতে চাইছে, যেটা লোকে দেখে ফেললে অসুবিধে।'
'সেটা কি, বলো তো?' মুসার প্রশ্ন।
'না ঢুকলে বলা যাবে না।'
রবিন বলল, 'ইন্টারকমে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক ঢুকতে দেয় কিনা।'
'দেবে না,' মুসা বলল। 'কোন কারণ নেই। বরং দেখা যাবে সাবমেশিনগান উঁচিয়ে কেটে পড়ার হুমকি দিচ্ছে। ঢুকলে গোপনে ঢুকতে

হবে।'

কয়েকটা ইউক্যালিপটাস গাছের পাশ দিয়ে আসার সময় কিশোর বলল, 'এখানে রাখো তো। গাছগুলোর আড়ালে। সহজে কেউ দেখতে পাবে না গাড়িটা।'

রাস্তায় কোন মোড় নেই এখানে। গাছগুলোর পেছনে খোলা মাঠ।

'গাড়ি লুকাব কেন?'

'ঢুকব।'

'কি করে? তার কেটে?'

'দেখা যাক। ওইয়্যার কাটার তো আছেই।'

মাঠ একপাশে রেখে গাছের জটলার মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে রাখল মুসা। বলল, 'এটা ভূতের বাড়ি। দয়া করে আমাকে আগে যেতে বোলো না।'

কথা না বলে গাড়ি থেকে নামল কিশোর। পায়ের নিচে মড়মড় করে উঠল শুকনো পাতা আর বাকল। নীরবতার মাঝে অনেক জোরাল মনে হলো শব্দটা। বাড়িটার দিকে তাকাল।

'বেআইনী কিছু করছে নিশ্চয়,' মুসাও এসে দাঁড়িয়েছে কিশোরের পাশে।

রবিন বলল পেছন থেকে, 'কি জানি, সন্ত্রাসীদের আড্ডাও হতে পারে। ঢুকে দেখা যাবে, গোলাবারুদ আর অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই। কিশোর, কি বলো?'

'কিছু একটা ব্যাপার তো নিশ্চয় আছে...'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই ভেতর থেকে চিৎকার শোনা গেল।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' উঁচু দেয়ালের ওপাশ থেকে এসে চিৎকারটা ভেসে চলে গেল যেন রাস্তার একমাথা থেকে আরেক মাথায়।

স্তব্ধ করে দিল গোয়েন্দাদের।

আবার শোনা গেল আর্তচিৎকার।

ভূতের ভয় ভুলে গেল মুসা। 'নিশ্চয় কেউ বিপদে পড়েছে!' বলেই গাড়ির দিকে দৌড় দিল তার কাটার যন্ত্র বের করে আনার জন্যে।

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল কিশোর। তারপর ছুটল দেয়ালের দিকে। রবিন ছুটল তার পেছনে। কিন্তু ওরা দেয়ালের কাছে পৌছার আগেই ওইয়্যার কাটার হাতে ওদের পাশ কাটিয়ে গেল মুসা

'বাঁচাও!' আবার শোনা গেল চিৎকার, 'কে আছ, দয়া করে আমাদের বাঁচাও!'

বাঁচাতে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

সাত

লাফিয়ে উঠে ছয় ফুট উঁচু দেয়ালের ওপরটা ধরে ফেলল ওরা। কাঠবেড়ালির মত বেয়ে উঠে গেল মুসা, ওপরে উঠে বসল। কটকট করে কেটে ফেলতে

লাগল তার।

কিশোর আর রবিন তার কাছে পৌছতে পৌছতে কাজ প্রায় শেষ করে আনল সে।

আবার করুণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল বিপদে পড়া কণ্ঠটা, 'বাঁচাও আমাদের!'

গ্যারেজের দরজার মত বড় একটা দরজা দেখিয়ে মুসা বলল, 'ওদিক থেকে আসছে।'

দেয়ালের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে লন পেরিয়ে সেদিকে দৌড় দিল তিনজনে।

আগে পৌছল মুসা। থমকে দাঁড়াল। তার পাশে এসে হাঁপাতে লাগল অন্য দু-জন। বেশি হাঁপাচ্ছে কিশোর, কলা আর পানাট বাটার বানরের এনার্জি দিতে পারেনি ওকে। ঘরের ভেতরে এক অদ্ভুত দৃশ্য। হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওরা।

প্রায় দোতলার সমান উঁচু ছাত। মেঝেতে পড়ে আছে মানুষের দেহের সমান দুটো দেহ। বাদামী রঙের দুটো বস্তু, তাতে জন্মেছে সবুজ ফাঙ্গাস, মোচড় খাচ্ছে ক্রমাগত। ওগুলোর পাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে কুচকুচে কালো আরেকটা শরীর, পিচ্ছিল পদার্থে মাখামাখি।

'আল্লাহরে, বাঁচাও!' বলে উঠল আতঙ্কিত মুসা।

বিড়বিড় করে রবিন কি বলল বোঝা গেল না।

আচমকা মানুষের মত পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিম্ভূত তিনটে দেহ। আঁটো পাজামা পরনে। শরীরের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করা। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল।

'না! না!' মানুষের মত করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল একজন।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' চেঁচাল আরেকজন।

অনেক বড় সিলিন্ডারের মত একটা শরীর হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে উঠল। গান শেষ হলে মাথা নুইয়ে ওপরের অংশটাকে তাক করল বন্দুকের মত করে, অন্য দু-জনের ওপর ছিটিয়ে দিল খানিকটা করে সাদা পাউডার।

'সরো! সরো!' বলে চিৎকার করে একলাফে পিছিয়ে গেল মুসা।

পেছন থেকে বলে উঠল একটা রাগত কণ্ঠ, 'এখানে কি করছ? কে তোমরা?'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

খাটো একজন মানুষ। মোটা ঘাড় থেকে ঝুলছে হুইসেল। এগিয়ে এল। দেয়ালে ঝোলানো একটা টেলিফোন থেকে রিসিভার নামিয়ে ডায়াল করে বলল, 'গণ্ডগোল হয়ে গেছে! একবার আসতে হবে।'

লোকটা রিসিভারে কথা বলছে, ইতিমধ্যে তিন গোয়েন্দাকে ঘিরে ফেলল দুই ফাঙ্গাস আর সাদা পাউডার।

'ঢুকলে কি করে?' জানতে চাইল এক ফাঙ্গাস।

ওরা যে মানুষ, রবারের পোশাক পরে ওই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বুঝে

ফেলেছে ছেলেরা।

'এখানে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না,' বলল আরেক ফাঙ্গাস। 'গোপনে সেট সাজিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছিলাম আমরা...'

'ঢোকেই চুরি করার জন্যে,' বলল সাদা পাউডার। 'এই তো কয়েকদিন আগে কয়েকটা ছেলে ঢুকেছিল। গ্রিম স্পীকারের অনেক দামী মুখোশ আর টুপিগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে।'

গ্রিম স্পীকার কে জানা আছে তিন গোয়েন্দার। সিনেমার ই. টি. আর ব্যাটম্যানের মতই আরেকটা বিখ্যাত চরিত্র, যেটা ঝড় তুলেছে সারা বিশ্বের চিত্রামোদীদের মাঝে।

'এক মিনিট,' হাত তুলল কিশোর, 'গ্রিম স্পীকারের সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক?'

'আমাদের কোম্পানিই তৈরি করে দিয়েছিল তাকে,' জবাব দিল সাদা পাউডার। 'ওকে বানিয়ে এখানেই রিহার্সাল দেয়ানো হয়, তারপর শূটিং।'

'বুঝলাম না,' বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। 'আমি তো জানতাম স্পেস অ্যান্ড পিকচার কোম্পানি বানিয়েছে ওকে? ওরা তো থাকে লস অ্যাঞ্জেলেসে।'

'আমরাই ওরা,' গর্বিত কণ্ঠে জবাব দিল এক ফাঙ্গাস। 'এখানে সরে এসেছি। আমরাই স্পেস অ্যান্ড পিকচার।'

'আপনারাই সেই বিখ্যাত স্পেশাল-ইফেক্ট কোম্পানি?' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন রবিন। 'স্পেস ওয়ারের মত বক্স অফিস হিট ছবির ইফেক্ট আপনারাই করেছিলেন?'

'ফগ, চুপ করো! কি বকর বকর করে সব ফাঁস করে দিচ্ছ!' ধমক দিয়ে ফাঙ্গাসকে থামিয়ে দিলেন টাকমাথা একজন লোক। বিজনেস স্যুট পরনে। ঘরের পেছনের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। ওইয়্যার-রিমড চশমার কাঁচের ওপাশ থেকে তাকালেন ছেলেদের দিকে।

কিশোরও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। এই ভদ্রলোককে কোথাও দেখেছে মনে হচ্ছে।

গলায় বাঁশি ঝোলানো খাটো লোকটা এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। এঁকেই ফোন করেছিল। 'মিস্টার পানশ,' ছেলেদের দেখাল সে, 'চুরি করে ঢুকেছে। মতলব বুঝতে পারছি না।'

'কে তোমরা?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন চশমা পরা ভদ্রলোক। 'সত্যি বলো, নইলে জেলে যাবে!'

ছেলেদের দিকে মাথা নোয়াল সাদা-পাউডার। ওর চাঁদি থেকে পাউডার ছিটকে বেরনোর কথা মনে হতেই তাড়াতাড়ি সরে গেল গোয়েন্দারা।

হেসে উঠল সিলিণ্ডার।

দ্রুত সামলে নিল কিশোর। নিজের নাম বলল। মুসা আর রবিনের নামও। চশমা পরা ভদ্রলোকের কথার জবাব দিল, 'বাইরে থেকে চিৎকার

শুনলাম তো, বাঁচাও, বাঁচাও করছে; ভাবলাম বাঁচিয়ে দিয়ে হিরো হয়ে যাই। কল্পনাই করিনি এখানে রিহার্সাল চলছে। এখন তো বোকা লাগছে নিজেকে।'

হেসে উঠল তিন অভিনেতা।

চশমা পরা ভদ্রলোক বললেন, 'আমি ওগোরফ পানশ। এখানকার চীফ অভ সিকিউরিটি। আর ইনি,' বাঁশিওয়ালা খাটো ভদ্রলোককে দেখালেন তিনি, 'হেগ পিতিয়ানো, ডিরেক্টর।'

ছেলেদের সঙ্গে হাত মেলাতে এগোলেন না কেউই

কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন পানশ, 'কেন ঢুকেছ, সত্যি কথা বলো!' কিশোরের হিরোইজমে তাঁর বিশ্বাস জন্মেনি।

'সত্যি বলব?' বুঝে গেছে কিশোর, মিথ্যে বলে ফাঁকি দিতে পারবে না এই লোককে। 'আপনাদের একজন প্রোগ্রামারকে খুঁজতে এসেছিলাম। তারপর চিৎকার শুনে তাড়াহুড়ো করে ঢুকেছি যাকে খুঁজতে এসেছি তার নাম টেমার ভেগাবল।'

'টেমার?' কথা বলল একজন ফাঙ্গাস, 'ওই আজব লোকটা! সে-ই তো...'

'ফগ!' ধমক দিয়ে ফাঙ্গাসকে থামালেন পানশ।

'সরি!' পিছিয়ে গেল ফগ।

অধৈর্য হয়ে উঠলেন পিতিয়ানো হুইসেল মুখে লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে বললেন, 'যাও, তোমরা তোমাদের কাজ করোগে।'

ঘরের মাঝখানে ফিরে গেল অভিনেতারা

গোয়েন্দাদের মুখের দিকে ভাল করে তাকালেন সিকিউরিটি চীফ। চেহারাটা ভাল না তাঁর। মুখের ভাঁজগুলো প্রকট হয়ে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলল চেহারাটাকে। তারপর বদলে আরেক রকম হয়ে গেল। টেমার ভেগাবলের নামটা বেশ ধাক্কা দিয়েছে তাঁকে; পরিচালকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা রিহার্সাল চালিয়ে যাও। আমি এদের নিয়ে যাচ্ছি ' স্বর মোলায়েম করে গোয়েন্দাদের ডাকলেন, 'এসো, আমার অফিসে, ওখানে কথা বলব।'

'চলুন!' খুশি হয়ে বলল মুসা। 'স্পেস অ্যান্ড পিকচারের নাম অনেক শুনেছি বাবার মুখে। স্পেশাল ইফেক্টে নাকি জুড়ি নেই। অনেক কিছু দেখতে পারব।' মুসার বাবা রাফাত আমানও সিনেমার লোক, উঁচুদরের টেকনিশিয়ান, তাঁর স্পেশালিটিও স্পেশাল ইফেক্ট

রিহার্সাল হলের একটা দরজা দিয়ে তিন গোয়েন্দাকে ভেতরে নিয়ে এলেন পানশ। করিডর ধরে এগোলেন একপাশে কাঁচের জানালা লাগানো একসারি অফিস ঘর। অন্য পাশের দেয়ালে সাঁটানো বিখ্যাত সব ছবির স্টিল। ওগুলো সব স্পেস অ্যান্ড পিকচারের করা। কয়েকটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেখা গেল দেয়ালে।

মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে বললেন সিকিউরিটি চীফ, 'লোকের যন্ত্রণায় এখানে সরে আসতে বাধ্য হয়েছি আমরা।'

'ছদ্মনাম নিয়েছেন,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'যাতে লোকে এসে বিরক্ত না করে?'

মাথা ঝাঁকালেন পানশ 'লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকতে গার্ড বাড়াতে বাড়াতে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। তা-ও লোক ঠেকানো যেত না। ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে এ রকম নানা জিনিস চুরি করে নিয়ে যেত, স্যুভনির রাখার জন্যে। অত্যাচার বন্ধ করতে না পেরে পালিয়েছি লুকিয়ে আছি এমন ভাবে, লোকে যাতে ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে এবার জেনেই গেল!'

'গ্রিম স্পীকারের কথা কিন্তু অনেক শুনেছি আমরা,' রবিন বলল

'ওইটার খ্যাতিই তো সর্বনাশটা করেছে।'

কিশোরের বাঁয়ে বিশাল এক কাঁচের দেয়ালওয়ালা ঘরের মধ্যে গাদাগাদি করে বসানো অনেকগুলো কম্পিউটার। দরজার দেয়ালে লেখা রয়েছে:

কম্পিউটার গ্রাফিক ডিপার্টমেন্ট

তিনটে কম্পিউটার বাদে কোনটারই মনিটরে আলো নেই, বন্ধ করে রাখা হয়েছে। চালু তিনটের ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে অপারেটররা। ঝড়ের গতিতে কী-বোর্ডে আঙুল চালাচ্ছে।

থমকে দাঁড়িয়ে মনিটরগুলো দেখতে লাগল কিশোর। পর্দায় কিছু অর্থহীন নম্বর আর লেখা ফুটে আছে।

পেছনে হাঁটছিল রবিন। কিশোর দাঁড়িয়ে যেতেই তার পিঠের ওপর এসে পড়ল। 'কি হয়েছে? দাঁড়ালে কেন?'

ফিরে তাকিয়ে তাগাদা দিলেন পানশ, 'কই, এসো।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার পানশ, মনে হচ্ছে প্রচুর কম্পিউটার গ্রাফিকস করতে হয় আপনাদের?'

'এটা আমাদের অনেক স্পেশালিটির একটা,' চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন সিকিউরিটি চীফ। তাড়াতাড়ি সরে এলেন কম্পিউটার রুমের সামনে থেকে 'স্পেস ওয়ার হিট করার পেছনে এই গ্রাফিকসের অবদান অসামান্য। স্টার ওয়ারস ছবিতে প্রথম কম্পিউটার অ্যানিমেশন শুরু হয়। কিন্তু নামেই কেবল অ্যানিমেশন, কাজ যা হয়েছে এখনকার তুলনায় কিছুই না। খুদে স্পেসশিপ, ফ্লোটিং কার এ সবের অ্যাঙ্গেল কি হবে, স্পীড কত, এটাই কেবল হিসেব করে বলে দিয়েছিল তখন কম্পিউটার, আর কিছু করেনি।'

'তাতেও যা হয়েছে,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল মুসা, 'আঠারো বার দেখেছি আমি ছবিটা। আমার অবশ্য বিশ্বাস ছিল মহাকাশের সমস্ত যুদ্ধগুলো কম্পিউটারে অ্যানিমেট করা হয়েছে।'

'লোকের সে-রকমই ধারণা। আসলে তো তা নয় অতি সাধারণ কাজ করেছে তখন কম্পিউটার। সে-জন্যেই স্পেস ওয়ারের ধারেকাছেও যেতে পারেনি।'

করিডরের মাথা থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে। ছেলেদের নিয়ে সেটা বেয়ে

ওপরে উঠলেন পানশ। একপাশে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা দেয়ালে বিরাট একটা পেইন্টিং. স্পেসস্যুট পরা এক মহিলা হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

চিনে ফেলল কিশোর. 'নোরা ডফম্যান না?'

'স্পেস অ্যান্ড পিকচারের প্রতিষ্ঠাতা!' ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন।

'সারা দুনিয়ায় ভক্তের ছড়াছড়ি.' মুসা বলল।

'হ্যাঁ. নোরা ডফম্যান।' বাঁয়ের প্রথম দরজাটা খুললেন সিকিউরিটি চীফ।

তাঁর পেছনে লম্বা একটা অফিসঘরে ঢুকল গোয়েন্দারা। একপাশের দেয়ালে পিকচার উইন্ডো। পুরো বাড়িটা দেখা যায় সেটা দিয়ে। মূল বাড়ির আশেপাশে আরও যে সব ছোট ছোট ঘর আর ছাউনি আছে. তা-ও দেখা যায়। আরেক প্রান্তের দেয়ালে বসানো এক ডজন টেলিভিশন. সিকিউরিটি মনিটর। বাইরের কিছু অংশ. স্টুডিও আর প্রোডাকশন রুম দেখা যায় ওগুলোতে।

'বাপরে বাপ. কি সাংঘাতিক সিকিউরিটি!' বলে উঠল রবিন. 'একেবারে জেমস বন্ডের ছবির মত!'

'বসো.' ডেস্কের সামনে তিনটে ক্যানভাস চেয়ার দেখিয়ে বললেন পানশ। নিজে গিয়ে বসলেন টেবিলের ওপাশের চেয়ারে. ভিডিও মনিটরগুলোর দিকে মুখ করে।

'টেমার ভেগাবলের জন্যে এসেছ তোমরা বললে.' বললেন সিকিউরিটি চীফ। 'কেন. বলতে অসুবিধে আছে?'

'না.' জবাব দিল কিশোর। 'আমাদের কম্পিউটার ক্লাবে লেকচার দিতে গিয়েছিল। একটা জিনিস ফেলে এসেছে। সেটা ফেরত দিতে চাই।'

'ছুটিতে আছে। লম্বা ছুটি। ইচ্ছে করলে আমার কাছে রেখে যেতে পারো। ও এলে আমি দিয়ে দেব।'

'না নিলেই ভাল করবেন.' হুঁশিয়ার করল মুসা।

'নেয়ার মত জিনিস নয়.' বলল রবিন। 'কম্পিউটারে ঢোকালেই ভাইরাসে ধরবে।'

'সে-ভয় করার বোধহয় আর কোন কারণ নেই.' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর 'ইতিমধ্যেই ভাইরাসে ধরে ফেলেছে এখানকার কম্পিউটারগুলোকে।'

'মানে?' অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মুসা আর রবিন।

রাগ ফুটল পানশের চেহারায়। একটা পেপারওয়েট তুলে নিয়ে তাক করলেন স্পেস ওয়ার ছবির লেসার গানের মত করে। 'কি বলতে চাও?'

'কি বলতে চাই বুঝতে পারছেন.' পেপারওয়েটের লেসার গানকে একটুও ভয় পেল না কিশোর। 'আপনাদের পুরো কম্পিউটার গ্রাফিকস ডিপার্টমেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ এ সময় অনেক বেশি ব্যস্ত থাকার কথা.

কারণ রিহার্সাল হচ্ছে। তিনটে কম্পিউটার যা-ও বা চালু আছে, ওগুলোতেও ভাইরাসের ছড়াছড়ি। আমার কম্পিউটারে যে জিনিস ধরেছে, একই জিনিস দেখলাম আপনাদের তিনটেতেও।'

উঠে দাঁড়ালেন পানশ। 'হয়েছে, আমার কথা শেষ। এবার যেতে পারো। একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি, চুরি করে তার কেটে ভেতরে ঢুকেছ, এটা মস্ত অপরাধ। ইচ্ছে করলে পুলিশকে বলে তোমাদের জেলে পাঠাতে পারি। কিন্তু আপাতত ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু কম্পিউটারের কথাটা বাইরের কাউকে বললে আর মাপ করব না। পুলিশকে জানিয়ে দেব…'

ওইয়্যার-রিমড চশমার কাঁচের ওপাশে বড় বড় হয়ে গেল পানশের চোখ। তাকিয়ে আছেন সিকিউরিটি মনিটরগুলোর দিকে।

ঘুরে তাকাল গোয়েন্দারাও। আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেন ছিটকে বেরোচ্ছে মনিটরের ছবি থেকে। কড়কড়, চটচট করে নানা রকম বিচিত্র শব্দ করছে স্পীকার। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'আগুন!…আগুন লেগেছে!'

আট

'নিচতলায় ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেখেছি!' বলে দরজার দিকে দৌড় দিল মুসা।

থাবা দিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে নম্বর টিপতে শুরু করলেন পানশ। 'মেইনটেন্যান্স? পানশ বলছি। আগুন লেগেছে এখানে। ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট হয়েছে বোধহয়। ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে জলদি চলে এসো।' তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আলো নিভে গেল। রকি বীচ ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে ফোন করতে লাগলেন তিনি।

হঠাৎ ভিডিও মনিটরে দেখা গেল আগুনের লকলকে শিখা।

'মরেছে!' ঘামছে রবিন।

'সব কটা মনিটরেই!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'একই সঙ্গে সবগুলোতে ধরল কি করে?'

'তাড়াতাড়ি নেভাতে না পারলে কাবাব হয়ে যাব পুড়ে!'

ছুটে ঘরে ঢুকল মুসা। ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে এসেছে। একটা করে আগুন নেভানোর যন্ত্র কিশোর আর রবিনের দিকে ছুঁড়ে দিল।

কিশোর দেখল ওগুলো ড্রাই-কেমিক্যাল এক্সটিংগুইশার। কাগজ, কাঠ, কাপড়, তরল দাহ্য, গ্যাস, যানবাহন এবং বিশেষ করে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন ধরলে নেভাতে সাহায্য করে এ ধরনের যন্ত্র।

যন্ত্রের সেফটি পিন খুলে ফেলল ওরা। মাথার কাছের লেভার চেপে দিয়ে নিশানা করল আগুনের দিকে। তীব্র গতিতে বেরোতে শুরু করল রাসায়নিক

পাউডার।.

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল মেইনটেন্যান্সের কর্মীরা। সবার হাতে এক্সটিংগুইশার একসারিতে দাঁড়িয়ে নিশানা করল আগুনের দিকে পাউডারের মেঘ তৈরি করে ফেলল। পরাস্ত হতে বাধ্য হলো আগুন।

'বাঁচা গেল!' স্বস্তির হাসি ফুটল মুসার মুখে তাকিয়ে আছে পোড়া মনিটরগুলোর দিকে সাদা পাউডার তুষারের মত জমে আছে

তিন গোয়েন্দাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে কর্মীদের নেতা বলল, 'তোমরা ঠিক সময়ে পাউডার ছড়াতে না পারলে এত সহজে কন্ট্রোল করা যেত না। ঘরের পাল্লার কাছে ছড়িয়ে যেত আগুন। পাল্লা পুড়লে তো বোঝোই, ঘরই ধসে পড়ত।'

কর্মীদের নিয়ে বেরিয়ে গেল নেতা, পরিষ্কার করার সরঞ্জাম নিয়ে আসার জন্যে।

আবার ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে ফোন করে জানিয়ে দিলেন পানশ, দমকল আর লাগবে না। গাড়ি যেন ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

কিশোর বলল তাঁকে, 'ভাইরাস কন্ট্রোল রুমের প্রধানকে ফোন করছেন না কেন?'

উঁচু হয়ে গেল পানশের ভুরু। 'কি জন্যে···'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'সাইন্স ম্যাগাজিনে পড়েছি দুটো মনিটরের স্ক্যান কন্ট্রোলে গোলমাল বাধিয়ে একটাতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে ভাইরাস। আপনাদের গ্রাফিকস কম্পিউটারে যে লোক ভাইরাস ঢুকিয়েছে সে ভিডিও সিকিউরিটি সিসটেমেও ঢুকিয়ে রাখতে পারে। আর তাহলেই···'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল পানশের মুখ থাবা দিয়ে তুলে নিলেন আবার রিসিভার, কিশোরের কথা বুঝে গেছেন 'জলদি মারথা গানকে পাঠিয়ে দাও! এখানে ভিডিও মনিটর চেকআপ দরকার ' ভাইরাসের সাহায্যে আগুন লাগার সম্ভাবনাটা বুঝিয়ে দিয়ে রিসিভার রেখে দিলেন।

'মিস্টার পানশ,' সহানুভূতির সঙ্গে বলল কিশোর, 'আপনার সমস্যাটা বুঝতে পারছি কোন কোম্পানিতে ভাইরাসের আক্রমণ হলে সেটা তারা প্রকাশ করতে চায় না।'

মাথা ঝাঁকালেন পানশ, জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন, 'হ্যাঁ কম্পিউটারের ওপর যারা নির্ভরশীল তাদের জন্যে ব্যাপারটা মারাত্মক ইমেজ নষ্ট হয়ে যায়। কোম্পানির ওপর যারা টাকা খাটায় তারা বিশ্বাস হারায় আর টাকার ঘাটতি হলে কোম্পানিও শেষ।'

'আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন। একটা কথাও ফাঁস করব না।'

দ্বিধা করছেন পানশ। হাসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু দ্বিধাটা গেল না চোখ থেকে।

বালতি, মোছার কাপড় আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল মেইনটেন্যান্স কর্মীরা।

'এখানে বসে থাকা যাবে না,' গোয়েন্দাদের বললেন পানশ, 'চলো বেরোই।' ভাইরাসের কথাটা ওদের কাছে স্বীকার করে ফেলায় অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে তাঁর আচরণ। 'চলো, নরটন করপোরেশনটা ঘুরিয়ে দেখাই তোমাদের। আগুন নেভাতে নিজেদের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করোনি, দেখাটা তোমাদের প্রাপ্য।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে অন্য একটা করিডর ধরে এগোলেন পানশ. কম্পিউটার গ্রাফিকস যেটার পাশে পড়ে সেটা ছাড়িয়ে চলে গেছে এই করিডর। এটার একধারেও সারি সারি কাঁচের জানালা।

'এগুলো প্রোডাকশন রুম,' পানশ বললেন। 'এই যে প্রথমটা, এটা ম্যাট রুম। আর্টিস্টরা এখানে নকল ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে সিনেমা আর বিজ্ঞাপনের দৃশ্য শূটিং করার জন্যে।'

জানালায় উঁকি দিল গোয়েন্দারা। কাজ করছে কয়েকজন আর্টিস্ট। কালো মহাকাশে রূপালী তারা আর গ্রহ আঁকছে। দুটো সূর্য ডোবার ছবি এঁকেছে, মনে হচ্ছে একেবারে আসল।

'স্পেস ওয়ারের আদিম বনের মত লাগছে!' ছাদ ছোঁয়া ক্যানভাসে আঁকা দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। 'এ রকম জিনিস দিয়ে স্পেশাল-ইফেক্ট করেই নিশ্চয় অস্কার পেয়েছেন আপনারা?'

'হ্যাঁ,' পানশ বললেন, 'স্পেস ওয়ারের বনটা অনেকটা এ রকমই ছিল। এবারও জেতার ইচ্ছে।' পাশের ঘরটার কাছে ওদের নিয়ে এলেন তিনি। 'এটা মডেল শপ।'

ভেতরে কাজ করছে অনেক শ্রমিক। খুদে স্পেসশিপ, গাড়ি, তলোয়ার আর ফলের মডেল তৈরি করছে।

'এত ছোট করে বানাচ্ছে কেন?' জানতে চাইল রবিন।

'কারণ মহাশূন্যে ছোটাতে হবে ওগুলোকে। গাড়ি আর তলোয়ার উড়তে থাকবে কালো আকাশে। ফলগুলো পার হয়ে যাবে সময়ের সীমানা, আজকের সময় পেরিয়ে চলে যাবে লক্ষ লক্ষ বছর সামনে। টিভি বিজ্ঞাপনের জন্যে তৈরি হচ্ছে এগুলো।'

'অনেক বিজ্ঞাপন তৈরি করেন আপনারা, তাই না?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'করি। বেশ মোটা টাকা আসে এ থেকে। সহজ একটা হিসেব দিই তোমাকে, বিজ্ঞাপনের জন্যে প্রতি বছর দুই লক্ষ কোটি ডলার খরচ করে আমেরিকানরা। এ সব বিজ্ঞাপনের বেশির ভাগটাই তৈরি হয় লস অ্যাঞ্জেলেসে। নিউ ইয়র্কেও এতটা হয় না।'

কিম্ভূত সব জানোয়ার, মহাজাগতিক কল্পিত জীব, আর নানা আকারের মানুষের মত জীবের মডেলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন। পানশকে বলল, 'লোকে যে চুরি করার জন্যে ঢোকে, তাদের দোষ দেয়া যায় না। আমারই তো নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। আশ্চর্য এক ফ্যান্টাসির জগৎ!'

হাসলেন পানশ। 'এটাকে ক্রিয়েচার রুম বলি আমরা। এখানে বসেই বানানো হয় ওগুলো।'

'ওই যে গ্রিম স্পীকার,' হাত তুলল কিশোর। দুই সহকারীকে বলল, 'দেখেছ? টিয়াপাখির ঠোঁটওয়ালা গরিলাটার পেছনে?'

ছবিতে দেখেছে, তারপরেও এখানে গ্রিম স্পীকারকে দেখে অবাক না হয়ে পারল না গোয়েন্দারা। লম্বা বিচিত্র মূর্তিটার পরনে মাকড়সার জালের মত করে তৈরি কাপড়ের সবুজ আলখেল্লা। মানুষের মত হাত, কিন্তু অস্বাভাবিক বড় থাবা: বড় বড় গোঁফওয়ালা বেড়ালের মুখ।

'একেবারে জ্যান্ত লাগছে!' মুসা বলল। 'মনে হচ্ছে জিজ্ঞেস করলেই কথা বলে উঠবে!'

প্রশংসায় খুশি হলেন পানশ। বললেন, 'এত প্রশংসা যখন পাচ্ছি, বুঝতে পারছি কাজটাজ ভালই করি আমরা। এসো, নতুন একটা জিনিস দেখাই।' গোয়েন্দাদের বাইরে বের করে এনে সরু একটা গলিপথ ধরে এগোলেন তিনি। ছাউনি, গ্যারেজ আর ফিল্ম লট পার করিয়ে নিয়ে এলেন একটা খোলা জায়গায়।

'খাইছে!' তিনতলা সমান উঁচু একটা রকেটের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা। রূপালী রঙ করা চকচকে শরীর। খাটো বেড়ায় ঘেরা। বড় বড় গাছপালার আড়ালে থাকায় রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না।

এই সময় গমগম করে উঠল লাউডস্পীকার, 'ওগোরফ পানশ! ওগোরফ পানশ! অফিসে ফিরে আসুন, প্লীজ!'

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে পানশ বললেন, 'মনে হয় কিছু আবিষ্কার করেছে মারথা। তোমরা দেখো। ইচ্ছে করলে রকেটের ভেতরও গিয়ে দেখতে পারো।'

তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন পানশ।

রকেটের চারপাশটা ঘুরে এল তিন গোয়েন্দা। কাজের সময় এখন, সবাই কাজে ব্যস্ত। নানা রকম পোশাক, পুতুল এ সব নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল কয়েকজন শ্রমিক।

রবিনকে বলল মুসা, 'কি জন্যে এসেছিল কিশোর, সেটাই ভুলে গেছে। ওর মুখ দেখেছ?'

'কি ভুলে গেছি?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

রবিন বলল, 'টেমার ভেগাবলকে খুঁজতে এসেছিলাম আমরা। ওর কথা তোমাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন পানশ।'

'না,' শুধরে দিল কিশোর, 'ভোলাতে পারেননি। আমিই তাঁকে বোকা বানাচ্ছি। কেন, নরটনের কম্পিউটারেও যে ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছে স্বীকার করতে বাধ্য করিনি?'

'করেছ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'এখন আমাদের ঘুরিয়ে দেখাতে বের করে এনেছেন পানশ। এটা ছুতো।

আসলে কথা বলে আমরা কতটা জানি বের করতে চাইছেন।'

'কি কি বলেছি আমরা?' রবিনের প্রশ্ন।

'প্রায় কিছুই না। তবে সেটা তিনি বুঝতে পারেননি। আমি বরং তাঁর কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছি, বোঝোনি সেটা?' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর, চকচক করছে চোখ। 'যে দু-জন লোক দেখা করতে গিয়েছিল বলেছেন টেমারের বাড়ির অ্যাপার্টমেন্ট ম্যানেজার, তার একজনের সঙ্গে পানশের অনেক মিল আছে। দেখে তাই চেনা চেনা মনে হচ্ছিল।'

'তাই তো!' কপাল চাপড়াল রবিন, 'আমি একটা গাধা! বিজনেস স্যুট, টাকমাথা, কুৎসিত চেহারা। ভুলে গিয়েছিলাম! কিন্তু টেমারকে খুঁজতে গিয়েছিলেন কেন পানশ?'

'আমারও সেটাই প্রশ্ন।'

'হয়তো চিন্তায় পড়ে গেছেন,' মুসা বলল। 'কোম্পানির সিকিউরিটি চীফ তিনি, আর টেমার তাঁরই অফিসে কাজ করে। দুশ্চিন্তা হওয়াটা স্বাভাবিক।'

'হতে পারে।' রকেটের দিকে এগোল কিশোর। ঢুকে দেখবে।

উঁচু, রুপালী রঙের আকাশযানের মডেলের ভেতর ঢুকল ওরা।

ভেতরে শুধু কাঠের ছড়াছড়ি। কাঠামো তৈরি করতে অনেক কাঠ লেগেছে। হতাশ হয়ে রবিন বলল, 'ওসব আজব যন্ত্রপাতিগুলো কই? লেসার গান, হলোগ্রাম...এ সব?'

দেয়ালগুলো কাঠের তৈরি। খসখসে। চেঁছে মসৃণ করারও প্রয়োজন বোধ করেনি। সরু একটা কাঠের সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে ওপরে।

'ঠিক বলেছ,' একমত হলো মুসা। 'সাংঘাতিক সব যন্ত্রপাতিতে ঠাসা থাকার কথা ভেতরটা। কন্ট্রোল প্যানেলটাও তো দেখছি না।' ওপর দিকে তাকাল সে, 'ওখানে থাকতে পারে।'

একেকবারে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ টপকে ওপরে উঠতে শুরু করল সে। তার পেছনে রবিন আর কিশোর।

চূড়ার কাছাকাছি চলে আসতে মনে হলো সিঁড়িটা কেঁপে উঠল। থেমে গেল গোয়েন্দারা। রেলিঙ চেপে ধরল।

'মনে হয় সর্বনাশটা ঘটিয়ে ফেলেছ!' মুসাকে বলল কিশোর।

'ভূমিকম্প নাকি?'

বাড়ছে কম্পন। দুলতে শুরু করল সিঁড়ি। দেয়াল কাঁপছে থরথর করে।

'ভূমিকম্পই তো!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

'বেরনো দরকার!' তাড়াহুড়ো করে নিচে নামতে শুরু করল রবিন।

মাথার ওপরে, চারপাশে গুঙিয়ে উঠছে কাঠামোর ধাতব জোড়াগুলো, কাঠ ভেঙে খুলে আসছে মড়মড় করে।

ওপরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ছাদ ধসে পড়ছে!'

রকেটের বডি থেকে খুলে গিয়ে বসে যাচ্ছে চোখা চূড়াটা।

ওটা পড়ার আগে নিচে নামতে পারবে না ওরা। তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব

পাশে সরে গেল। ওদের পাশ দিয়ে, প্রায় গা ছুঁয়ে নেমে গেল চূড়াটা, ধড়াস করে নিচে পড়ে ভাঙল।

গোঙানো আর কাঠ ভাঙার শব্দ থামল না ওপরে। বাড়ছে আরও।

আবার ওপরে তাকাল কিশোর। মোচড় দিয়ে উঠল পেট।

'পুরো রকেটটাই ধসে পড়বে!' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল ও।

নয়

রেলিঙ ধরে প্রাণপণে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল ওরা। ফনা তোলা গোখরোর মত দুলছে রকেট। আচমকা ভয়াবহ এক ঝাঁকুনি।

'লাফ দাও!' বলে উঠল মুসা।

সিঁড়ি ছেড়ে দিয়ে অনেক ওপর থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ল গোয়েন্দারা। পড়েই সরে গেল। ঠিক এক সেকেন্ড পর খসে পড়তে লাগল সিঁড়িটা।

দরজার দিকে দৌড় দিল ওরা। কাঠ আর ধুলোর ঝড় বইতে লাগল যেন। নাকেমুখে ধুলো ঢুকে কাশি উঠতে লাগল।

কিন্তু কোন কিছুই ঠেকাতে পারল না ওদের। জানে, ভেতরে থাকলে মরতে হবে। পুরো রকেটের কাঠ ধসে পড়লে থেঁতলে মরবে।

কি ভাবে যে দরজা দিয়ে ছুটে বাইরে বেরোল বলতে পারবে না।

বিমূঢ় শ্রমিকেরা দৌড়ে আসছিল তাদের দিকে। থমকে দাঁড়িয়ে জড় হয়ে দেখতে লাগল রকেটের পতন।

গোয়েন্দাদের জিজ্ঞেস করল, 'এর মধ্যে ঢুকেছিলে তোমরা?'

ওরা জবাব দেয়ার আগেই পানশের কথা শোনা গেল। এদিক ওদিক ছুটে পালাল দর্শকেরা।

গোয়েন্দাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'ঠিক আছ তোমরা?' উদ্বেগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

হাত-পা টিপেটুপে দেখল মুসা। 'না, ভাঙেনি কিছু।'

পানশের দিকে তাকাল কিশোর। 'আমরা ভেতরে ঢুকলে আপনাআপনি ধসে পড়েছে রকেটটা। কেন?'

'ক্যামেরার সামনে ধসে পড়ার কথা ছিল,' পানশ জানালেন। 'তোমাদের ওপর নয়। ভাগ্যিস কোন ক্ষতি হয়নি তোমাদের।'

কি ঘটেছে আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন তিনি। বেড়ার গায়ে লাগানো একটা সুইচ দেখালেন। 'রকেটের দেয়ালে তার পেঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। এই সুইচটা একটা উইঞ্চের সঙ্গে যুক্ত। টিপে দিলেই চালু হয়ে যায় উইঞ্চ, টেনে টাইট করে তারগুলোকে। ভীষণ টান পড়ে। তারমানে কেউ সুইচ টিপে দিয়েছিল। তাতে খসে গেছে রকেটের কাঠামোর কাঠ। ধসে পড়েছে ওটা।'

'কে টিপে দিয়েছে?'

'হবে কোন গাধা। যে জানত না ওটা টিপলে কি সর্বনাশ হয়ে যাবে…'

সুইচ বক্সের ওপরে হুঁশিয়ারি লেখা রয়েছে। সেটা দেখিয়ে কিশোর বলল, 'অত গাধা বলে তো মনে হচ্ছে না লোকটাকে।'

'তাকায়নি আরকি ওটার দিকে। অহেতুক টেপাটেপির জন্যে হাত সুড়সুড় করে না অনেকের…যাকগে, কোথাও ব্যথা পেয়েছ?…ওষুধ-টষুধ লাগবে? খরচ আমরাই দেব।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, 'সামান্য কয়েকটা আঁচড়ের জন্যে আর কি ওষুধ লাগবে?'

পানশ কিছুতেই স্বীকার করবে না যে ইচ্ছে করে ওদের ওপর ধসানো হয়েছে রকেটটা—ভাবল কিশোর, তাই কথাটা নিয়ে চাপাচাপি করল না। তবে তাঁর কথাও ঠিক হতে পারে। হয়তো ব্যাপারটা স্রেফ দুর্ঘটনাই।

'তোমার কথাই ঠিক কিশোর,' প্রসঙ্গটা থেকে সরে যাওয়ার জন্যে বললেন পানশ, 'সিসটেমের মধ্যে ভাইরাসই ঢুকিয়ে দিয়েছিল, যাতে স্ক্যান কন্ট্রোল আক্রান্ত হয়ে আগুন ধরে যায়।'

'আমি শিওরই ছিলাম এ ব্যাপারে,' ভোঁতা গলায় বলল কিশোর। 'কিন্তু কেন করল এ কাজ?'

'হয়তো হুমকি দেয়ার জন্যে, কিংবা সাবধান…' থেমে গেলেন পানশ। আর বললেন না কিছু।

পরিষ্কার করার জন্যে লোক এল। রকেটের ধ্বংসস্তূপ সাফ করার কাজে লাগল ওরা।

চারপাশে তাকাল কিশোর। দূরে দাঁড়িয়ে এখনও উঁকিঝুঁকি মারছে কয়েকজন। একটা লোকের পেছনটা চোখে পড়ল, চলে যাচ্ছে, সবুজ জ্যাকেট গায়ে। এই লোকটাই টেমারের বাড়িতে তার দিকে ঠেলাগাড়ি ঠেলে দেয়নি তো?

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'এই, এই শুনুন!' লোকটার দিকে দৌড় দিল সে।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইলেন পানশ।

জবাব দেয়ার সময় নেই কিশোরের। ছুটছে।

রবিন আর মুসাও ছুটল কিশোরের পেছনে। লোকটাকে দেখেনি।

ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে দেখেই দৌড় দিল সবুজ জ্যাকেট পরা লোকটাও। বাড়ির কোণ ঘুরে চলে গেল অন্য পাশে।

কিশোরও ঘুরতে গেল। এই সময় ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল ভাঁড়ের পোশাক পরা কয়েকজন লোক সরু রাস্তা জুড়ে আসছে ওরা। ওদের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল সে। একজনকে নিয়ে পড়ে গেল রাস্তায়।

পেছনে এসে দাঁড়াল মুসা আর রবিন। টেনে তুলল কিশোরকে।

মুসা বলল, 'ভাঁড়ামির অভিনয়ের ইচ্ছে?'

তার রসিকতায় কান নেই কিশোরের। 'আরেকটু হলেই ধরে ফেলেছিলাম!'

'কাকে?' জানতে চাইল রবিন।

'সবুজ জ্যাকেট।'

'খাইছে! এখানেও এসেছে?' চোখ সরু হয়ে গেল মুসার।

পানশ এসে দাঁড়ালেন পেছনে। 'কে এসেছে?'

সবুজ জ্যাকেট পরা লোকটার কথা জানাল কিশোর। বলল, 'সুইচটা হয়তো সে-ই টিপে দিয়েছিল। ইচ্ছে করে। গতকাল মাইক্রোওয়েভ কার্ট ঠেলে দিয়েছিল আমাকে ভর্তা বানানোর জন্যে। আজ চেয়েছে তিনজনকেই বানাতে।'

'ওর মুখ দেখেছিলে কাল?'

মাথা নাড়ল কিশোর।

'তাহলে বুঝলে কি করে ওই লোকই? সবুজ জ্যাকেট এখানে অনেকেই পরে। আজও খুঁজলে অন্তত পঞ্চাশজনের গায়ে ওই রঙের জ্যাকেট দেখতে পাবে। হয়তো প্রশ্ন করবে, দৌড় দিল কেন তাহলে? এ রকম রকেট ধসে পড়ার পর আমাকে কেউ তাড়া করলে কিছু না বুঝেই আমিও দৌড় দিতাম।'

পানশের কথায় যুক্তি আছে।

'বেশ,' অন্য পথ ধরল কিশোর, 'তাহলে টেমার ভেগাবলের বাড়িতে গেল কেন লোকটা? ওখানে কি?'

ভারী দম নিলেন পানশ। আগেও লক্ষ করেছে কিশোর, টেমারের কথা বললেই নার্ভাস হয়ে যান তিনি।

'তোমরা আসলে কি, বলো তো? গোয়েন্দার মত জেরা করো কেন?'

'সত্যি বলতে কি, গোয়েন্দাই আমরা।'

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিল কিশোর।

কার্ডটা দুই আঙুলে টিপে ধরে বললেন পানশ, 'তাহলে টেমারের ব্যাপারে তদন্ত করছ তোমরা?'

'ওর ডিস্ক থেকে আমাদের কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকেছে। আপনাদের কম্পিউটারেরও একই অবস্থা। ভয় লাগছে, সবখানেই না ছড়িয়ে পড়ে।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন পানশ। 'তোমাদের উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারছি। একটা নিশ্চয়তা অবশ্য দিতে পারি, আমাদের কম্পিউটার থেকে আর বাইরে যাবে না ভাইরাস। তোমরা আরও ছড়াও কিনা সেদিকে বরং খেয়াল রাখো।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ টেনে বের করলেন সিকিউরিটি চীফ। একটুকরো কাগজ পড়ে গেল। দেখতে পেলেন না পানশ। তিন গোয়েন্দার কার্ডটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলেন।

নিচু হয়ে কাগজটা তুলল কিশোর। কুঁচকে গেল ভুরু। কম্পিউটারে যে হুমকি দেয়া হয়েছে, তারই তিনটে শব্দ লেখা।

'দেখি, দাও!' তার হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিলেন পানশ।

তিনটে শব্দই যথেষ্ট। বাকি শব্দগুলো কিশোরের জানা। পঞ্চাশ লাখ ডলার না দিলে সর্বনাশ করে দেয়ার হুমকি।

স্থির দৃষ্টিতে সিকিউরিটি চীফের দিকে তাকিয়ে রইল সে। অনেক প্রশ্নের জবাব পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে।

দশ

কিশোরের পরিবর্তন লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কি হয়েছে?'

জবাব দিল কিশোর, 'বুঝে ফেলেছি!'

'কী?'

বুঝিয়ে দিল কিশোর, 'আমাদের কম্পিউটারের মেসেজটার কথা মনে আছে না? পঞ্চাশ লাখ ডলারের জন্যে চাপ? আসলে আমাদের দেয়নি হুমকিটা।' সিকিউরিটি চীফের দিকে তাকাল সে, 'টেমারের কথা বললেই যে মিস্টার পানশ নার্ভাস হয়ে যান সেটা এই মেসেজের জন্যেই। নরটন কোম্পানিকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে টেমার।'

গোঁ গোঁ করে বললেন পানশ, 'বাজে কথা!'

'তাহলে টেমারের বাড়িতে ঢুকেছিলেন কেন চুরি করে?'

'কে বলল তোমাকে?'

'আপনার চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন অ্যাপার্টমেন্ট ম্যানেজার। দেখুন, স্যার, বস্ কিংবা মালিককে প্রোগ্রামাররা অনেক সময় ব্ল্যাকমেল করে, পত্রিকায় পড়েছি আমি। টেমারও তাই করছে। হয় তাকে পঞ্চাশ লাখ ডলার দেবেন, নয়তো নরটনের কম্পিউটার সিসটেমের সর্বনাশ করে দেবে তার ভাইরাস। সব মুছে দেবে। আমাদের গেম ডিস্কেও একই ভাইরাস ট্র্যান্সফার করে দিয়েছে টেমার। এ কাজটা কেন করল সে, বুঝতে পারছি না।'

'হয়তো না জেনেই করে ফেলেছে, ভুলে,' রবিন বলল। 'কপি করতে গিয়ে অনেক সময়ই ভুল হয়ে যায়। আমিও বহুবার করেছি এ রকম, দুই-তিন হপ্তা পেরিয়ে গেছে, ধরতেই পারিনি।'

সিকিউরিটি চীফকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'পঞ্চাশ লাখ ডলার দিলে বিনিময়ে আপনাকে কি দেয়ার কথা দিয়েছে টেমার?'

ছাই হয়ে গেছে পানশের মুখ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তারমানে আমাকে বলিয়েই ছাড়বে। আর কোন ডাটা হারাতে রাজি নই আমরা। মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। কোটি কোটি ডলার। সেই সঙ্গে গুডউইলও যাবে। ধ্বংস হয়ে যাব আমরা। টেমারকে টাকাটা দিতেই হবে বুঝতে পারছি। দিলে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট দেবে আমাদের।'

'এটা আবার কি?' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

'ভাইরাস মোছার প্রোগ্রাম,' বুঝিয়ে দিল কিশোর। 'চেনা ভাইরাসের জন্যে বাজারে নানা রকম অ্যানটিডোট পাওয়া যায়। কিন্তু টেম্যার যেটা আবিষ্কার করেছে, সেটা অচেনা, একমাত্র সে-ই জানে এই ভাইরাস নিরাময়ের ডিজাইন। সুতরাং তার কাছ থেকেই অ্যানটিডোট নিতে হবে, যে কোন মূল্যে।'

'অবস্থা তো খুব খারাপ,' মন্তব্য করল রবিন।

'হ্যাঁ,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন পানশ। 'তোমরা বুদ্ধিমান ছেলে। অনেক কিছুই বুঝে ফেলেছ। তবু আমি তোমাদের অনুরোধ করব টেমারের কাছ থেকে দূরে থাকতে।'

'তা আর থাকছি না!' জেদ করে বলল মুসা।

মাথা নাড়লেন পানশ, 'অহেতুক জেদ করছ। নরটনের উপকার করতে পারবে না তোমরা। বরং খবরের কাগজওলাদের কানে চলে গেলে ক্ষতি হবে। টেমারকে টাকাটা দিয়ে দিলেই আর সমস্যা নেই। আবার কাজ চালু করতে পারব আমরা। গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয় আমাদের। সব ব্যবসাতেই বিজনেস সিক্রেট আছে। কথা দাও এ কথা কাউকে বলবে না, টেমারের ব্যাপারে আর নাক গলাবে না।'

এই সময় মেয়েকণ্ঠে ডাক শোনা গেল, 'মিস্টার পানশ! মিস্টার পানশ!...ওই তো উনি!'

ঘুরে তাকাল গোয়েন্দারা। তাজ্জব হয়ে দেখল স্পেস ওয়ারের দু-জন বিখ্যাত তারকাকে—লাল-চুল ডট হুগো ফান আর সোনালি-চুল মিরা হুগো ফান। এদিকেই আসছে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা আর রবিন।

কাছে এসে দাঁড়াল দুই তারকা। ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ডট হাত মেলাল পানশের সঙ্গে। আঁটো বিচিত্র পোশাক পরনে, যেন এইমাত্র মহাকাশের কোন গ্রহ থেকে নেমে এসেছে। কঠিন, অনেক বড় চোয়াল। পেশীবহুল শরীর। কোমরে ঝোলানো রত্নখচিত খাপে পোরা তলোয়ার।

'ডট আর মিরা এসেছে সফট ড্রিংকের একটা বিজ্ঞাপন করতে,' গোয়েন্দাদের জানালেন পানশ। তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সিনেমার মহাকাশচারীদের।

'বেশি আগে চলে এলাম নাকি?' লম্বা ভেলভেট কাপড়ের স্কার্টের ঝুলে টান দিয়ে ছেড়ে দিল মিরা। 'ডট খালি তাড়া দিচ্ছিল। সময়টা বোধহয় ভুল শুনেছে সে। অহেতুক বায়োলজি বই থেকে তুলে এনেছে আমাকে এত আগে। জ্বালা!'

কাঁধের ওপর নেমে এসেছে তার সোনালি চুল। প্রায় ছয় ফুট লম্বা। সুন্দর চেহারা। মহাকাশের রাজকুমারীর সাজে সেজেছে। রাজকুমারীর মতই লাগছে। তার বায়োলজি প্রীতি চেহারার সঙ্গে বেমানান, ভাবছে কিশোর।

যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই মিরা বলল, 'বিজ্ঞাপনের কাজটা এমন সময় পড়ে গেল যখন আমার পরীক্ষা। টিউটর কালকেই একটা টেস্ট

নেবেন বলেছেন। বইও ছাড়তে পারি না, এদিকে বিজ্ঞাপনেরও শিডিউল। কোনটা করব?' হতাশার হাসি ফুটল ঠোঁটে।

'বললাম না অত মাথা ঘামিয়ো না,' ডট বলল। 'তোমার অসুবিধে হবে না। বইয়ে একবার চোখ বোলালেই যথেষ্ট। সে-সময় পাবে।' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বোনের প্রশংসা করে বলল, 'সাংঘাতিক স্মরণশক্তি ওর। একেবারে কম্পিউটারের ডাটা ব্যাংক। একবার পড়লে কিছু আর ভোলে না। পড়তেও পারে বটে! যা পায় তাই গেলে!'

প্রশংসায় লজ্জা পেল মিরা। চোখ ওল্টানোর ভঙ্গি করল।

ডটের পক্ষ নিয়ে সরব হলেন পানশ, 'সত্যিই ট্যালেন্ট আছে মিরার।'

'হয়েছে হয়েছে, আর অতিমানব বানাতে হবে না আমাকে।'

'অভিনয়েও ভাল করবে।'

'কিন্তু আমি অভিনয় করতে চাই না। হলিউডের চেয়ে কলেজই আমার বেশি পছন্দ।'

ডট আর মিরা যমজ ভাইবোন, পত্রিকায় পড়েছে গোয়েন্দারা।

পানশ বললেন, 'ট্যালেন্ট থাকলে সেটা কাজে লাগানো উচিত। অভিনয় ছাড়াটা তোমার উচিত হবে না।'

'ছাড়ব কেন? গরমের ছুটিতে বই বাদ। তখন শুধু অভিনয়।'

রবিন বলল, 'আমিও মিস্টার পানশের সঙ্গে একমত। অভিনয় ছাড়াটা উচিত না আপনার, আমিও বলি। ভক্তদের নিরাশ করার অধিকার নেই আপনার।'

মুসা বলল, 'কে বিশ্বাস করবে ভিনগ্রহের সুন্দরী রাজকুমারী বেশির ভাগ সময়ই বায়োলজি বইয়ে মুখ গুঁজে থাকে!'

'শুধু বায়োলজি নয়,' মনে করিয়ে দিল ডট। 'যা পায় তাই পড়ে। অনেক জ্ঞান ওর, অনেক কিছু জানে। পড়লে ভোলে না তো।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মিরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'অনেক পড়াশোনা করেন আপনি?'

কিশোরের দিকে নীল চোখ মেলে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রাজকুমারী। বুঝে ফেলল এই ছেলেটা আর দশটা সাধারণ ছেলের মত নয়, ভক্তিতে গদগদ হয়ে যাবে না। সাবধানে কথা বলতে হবে এর সঙ্গে। মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, পড়ি। সব সময়ই পড়ি। তবে বিশেষ কিছু জিনিস পড়তে আমার বেশি ভাল লাগে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর তথ্য জানতে ইচ্ছে করে। এই যেমন ধরো, সাধারণ সাগরের এক চামচ পানিতে যত অণু আছে, আটলান্টিক মহাসাগরের পানিতেও তাই আছে। অবাক কাণ্ড না? এটা জেনেছি আমি দা অড বুক অভ ফ্যাক্টস বইটা থেকে।'

হাসল ডট। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। বোঝাল, কি বলেছিলাম?

ডটের এই আচরণ বাড়াবাড়ি মনে হলো রবিনের। সে নিজেও কম জানে না, প্রচুর পড়াশোনা করে। মিরা নাহয় জানেই, সেটা জানানোর জন্যে অত

ঢাকঢোল বাজানোর কি হলো? একবার বললেই যথেষ্ট। রাগ লাগল তার। ডটের বোন ছাড়াও আরও যে অনেকে অনেক কিছু জানে, এটা বোঝানোর জন্যেই বলল, 'এ ব্যাপারে আমাদের কিশোরও কম যায় না। সে-ও অনেক পড়াশোনা করে।'

জ্ঞানের ব্যাপারে মিরা ওদেরকে একহাত দেখিয়ে দেবে এটা মুসাও সহ্য করতে পারল না, বলল, 'কিশোরের স্মরণশক্তিও বিস্ময়কর। কিচ্ছু ভোলে না। এই কিশোর, তুমিও কিছু বলো না?'

বাস্তবে ফিরে এল যেন কিশোর। এ ভাবে জ্ঞানের প্রতিযোগিতা চালানোটা সে পছন্দ করে না, বিদ্যে জাহির করার প্রবণতা বলে মনে হয়, তবু দুই বন্ধুকে নিরাশ করতে চাইল না। বলল, 'শনি গ্রহের ঘনত্ব এতই কম, কোন প্রকাণ্ড বাথটাবে পানি ভরে যদি তাতে ফেলে দেয়া হয়, তো ভেসে থাকবে। আমি জেনেছি এটা কনটেমপোরারি অ্যাসট্রোনমি থেকে।'

আনন্দে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল মিরা। 'ইস্, কিশোর, আরও আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলো না কেন! খুব মজা হত!'

প্রশংসায় খুশি হলেও সেটা প্রকাশ করল না কিশোর। বলল, 'আরেকটা ফ্যাক্ট বলি। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার রোববারের একটি সংখ্যার একটি মাত্র প্রবন্ধ পঁচাত্তর হাজার গাছের জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কোথায় লেখা হয়েছিল, বলুন তো?'

'পারলাম না,' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল মিরা।

আড়চোখে ডটের দিকে তাকাল কিশোর। মুখ লাল হয়ে যেতে দেখল। মিরার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জিরো পপুলেশন গ্রোথ রিপোর্টার।'

'চমৎকার!' চোখ চকচক করছে মিরার। 'তোমার সঙ্গে কথা বলে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়া যাবে!'

ঘড়ি দেখলেন পানশ। 'ইয়ে, আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। মিরা, তুমি আর ডট ওদেরকে ক্লাব ডেডটা দেখাতে নিয়ে যাও। আমি যাব আর আসব।' গোয়েন্দার দিকে ফিরলেন। 'যা বলেছি ভেবে দেখো। তোমাদের সিদ্ধান্তটা আমাকে না জানিয়ে যাবে না। আশা করি নিরাশ করবে না আমাকে।'

চলে গেলেন তিনি।

ডট আর মিরার সঙ্গে মূল বাড়িটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে রবিন জানতে চাইল, 'ক্লাব ডেডটা কি?'

হেসে উঠল ডট। রহস্যময় কণ্ঠে বলল, 'গেলেই দেখবে। ভেব না অপছন্দ হবে।'

ডটের দিকে বার বার তাকাচ্ছে মুসা। লোকটার সুন্দর স্বাস্থ্য ঈর্ষাই জাগাচ্ছে তার। কথা বেশি বলে বটে, তবে মানুষ হিসেবে খারাপ না, এতক্ষণে বুঝে গেছে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি রোজ ব্যায়াম করেন?'

'করি। অনেকক্ষণ ধরে। তোমারও তো সুন্দর শরীর। তুমিও করো নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। স্বাস্থ্য আর ব্যায়াম নিয়ে আলাপ জমে গেল দু-জনের।

বাড়ির মধ্যে ঢুকল ওরা। গাঢ় রঙের কাঠের দেয়াল। একসারি দরজা, ওগুলো অফিস।

'এমন জায়গার জায়গা,' রবিন বলল, 'একেবারে অ্যানটিক!'

'হ্যাঁ, এখানকার কোন কিছুকেই স্বাভাবিক বলতে পারি না,' একমত হলো ডট। করিডরের শেষ মাথার একটা দরজা খুলল সে।

'খাইছে!' বিরাট গুহার মত একটা ঘরে ঢুকে বলে উঠল মুসা।

'এটাই ক্রাব ডেড?' কিশোরের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ডট। 'নরটনে ডেড শব্দটার একটা বিশেষ অর্থ। যে জিনিস আর কাজে লাগে না, সেটাকে ডেড বলা হয়। ফেলে রাখা হয় এখানে এনে। আসলে ক্রাব ডেড না রেখে স্টোর ডেড নাম রাখা উচিত ছিল ঘরটার।'

দোতলা সমান উঁচু একটা ফ্যান্টাসিল্যান্ড যেন ঘরটা। ঢোকার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একটা ধাতব রোবট। হাতের থাবার জায়গায় কাঁকড়ার দাঁড়ার মত দাঁড়া। নানা রকম বিচিত্র জীবের মডেল, দৃশ্যপট, আর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা ঘর।

'এখানে এলে আমার খুব ভাল লাগে,' ডট বলল। 'সময়টা ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়।'

'ওই দেখো একটা ম্যাজিক স্ক্রীন,' হাত তুলল মিরা।

ডানে দেয়ালে বসানো বারো ফুট একটা টিভির পর্দা। সুইচ টিপতেই চালু হয়ে গেল। তাজ্জব হয়ে দেখল গোয়েন্দারা, বিশাল সব ভালুক ছোট হতে হতে টেনিস বলের সমান হয়ে যাচ্ছে। পেছনে গজিয়ে উঠছে একশো তলা, দেড়শোতলা উঁচু বাড়ি। মনে হচ্ছে যেন পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে আসবে।

'কম্পিউটার গ্রাফিকস?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল মিরা। 'কম্পিউটারে আউটলাইন তৈরি করে দেয়া হয়। কম্পিউটার সেগুলোকে জ্যান্ত ছবিতে রূপান্তরিত করে।'

'তারমানে বলতে চান টু-ডাইমেনশন ছবিকে থ্রী-ডাইমেনশন করে ফেলে!'

'প্রায় তাই করে,' ডট বলল। 'এ ভাবেই অ্যানিমেশন করা হয় এখন।'

'কিন্তু সব কম্পিউটার সেটা করতে পারে না,' মিরা বলল।

'জানি,' বলল কিশোর। 'প্রতি সেকেন্ডে টুয়েলভ ট্রিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে পারে যেগুলো, সেগুলো দিয়েই কেবল সম্ভব হয়। থ্রী-ডাইমেনশনকে নড়ানো বড় শক্ত কাজ।'

ঝট করে তার দিকে ঘুরে গেল মিরা, তার নীল চোখে বিস্ময়। 'কি করে জানলে?'

হাসল কিশোর, 'পত্রিকা পড়ে। টাইম ম্যাগাজিন।'

দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল শুধু পানশের টাকমাথা, শরীরটা

বাইরে। ডট আর মিরাকে বলল, 'তোমাদের সেট রেডি। ওরা অপেক্ষা করছে।'

'আসছি।' পকেট থেকে তিনটে প্লাস্টিকের ছোট মডেল বের করল মিরা। স্পেস ওয়ার ছবিতে রাজকুমারীর পোশাক পরা তার নিজের মডেল। তিন গোয়েন্দাকে দিয়ে বলল, 'স্যুভনির দিলাম। আমাকে মনে রাখার জন্যে। কিশোর, সময় পেলে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভীষণ ভাল লাগবে।'

দরজার দিকে এগোল সে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল গোয়েন্দারা, বেরিয়ে গেল ডট আর মিরা। বিড়বিড় করলেন পানশ, 'কি যে হচ্ছে, বুঝতে পারছি না! একের পর এক অঘটন...এখন একটা খবর শুনলাম। টিফিনের জন্যে খাবার এনে রাখে, সেই খাবার চুরি হয়ে যাচ্ছে কর্মচারীদের লকার থেকে। অদ্ভুত কাণ্ড! এই খাবার চোর আবার এল কোত্থেকে?' অস্থির ভঙ্গিতে টাকে হাত বোলালেন তিনি। গোয়েন্দাদের দিকে তাকালেন, 'তোমাদের দেখা শেষ হয়েছে?'

ঘড়ি দেখল রবিন, 'বাপরে, সাড়ে চারটে বেজে গেছে!'

'তাই তো বলি,' মুসা বলল, 'পেটের মধ্যে মোচড় দেয় কেন?'

কিশোর বলল, 'না, আর কোন কাজ নেই এখানে।'

'তো, কি ঠিক করলে?' জিজ্ঞেস করলেন পানশ, 'টেমারের ব্যাপারে তদন্ত বন্ধ করবে?'

'আরেকটু ভেবে দেখি,' জবাবটা এড়িয়ে গেল কিশোর।

চিন্তিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলেন পানশ। বললেন, 'বেশ, দেখো।'

দরজার কাছে ওদেরকে এগিয়ে দিয়ে এলেন তিনি।

ওরা গেটের কাছে পৌঁছলে ইস্পাতের পাল্লা খুলে দিল একজন গার্ড।

গাছের জটলা থেকে গাড়িটাকে রাস্তায় তুলে এনে ইয়ার্ডে রওনা হলো মুসা।

খানিক পরেই রিয়ার ভিউ মিররে দেখল কালো পিকআপ গাড়িটাকে, পেছনে লেগে রয়েছে। গতি কমিয়ে সাইড দিয়ে দিল সে, বিড়বিড় করে বলল, 'যাও, বেরিয়ে যাও!'

কিন্তু গেল না ওটা। একই দূরত্ব রেখে পেছনে রয়ে গেল। তারমানে অনুসরণ করছে।

হঠাৎ গতি বাড়িয়ে এসে গুঁতো মেরে বসল মুসার গাড়ির গায়ে।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'ব্রিজ থেকে ঠেলে ফেলে দিতে চায় আমাদের!'

ফিরে তাকাল কিশোর। ড্রাইভারের দিকে একনজর তাকিয়েই সে-ও চিৎকার করে উঠল, 'এ-কি! টেমার ভেগাবল!'

এগারো

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে টেমার। গোলগাল তেলতেলে চেহারা, কোন বাছবিচার না করে প্রচুর খায় মনে হয়।

'এই তাহলে টেমার ভেগাবল!' রবিন বলল, 'এমন বিশ্রী কেন চেহারাটা…'

আবার ঝটকা দিয়ে আগে বাড়ল কালো পিকআপ, মুসার গাড়িটাকে ধাক্কা মারার জন্যে। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল ব্রিজের কিনারের গার্ডরেইলের কাছে। ঘষা লেগে আর্তনাদ করে উঠল ধাতব শরীর, স্ফুলিঙ্গ ছুটল।

'আমাদের মেরে ফেলতে চায়!' চিৎকার করে বলল কিশোর। নিচের গভীর খাদের দিকে তাকাল।

দাঁতে দাঁত চেপে মুসা বলল, 'শক্ত হয়ে বোসো!'

শক্ত হয়ে বসল কিশোর আর রবিন। মুসার ওপর ভরসা আছে ওদের। আগেও এ রকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে সে। ভাগ্য খারাপ না হলে এবারও পারবে।

অ্যাক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়িয়ে বাঁয়ে কাটল মুসা। ধ্যাপ করে একটা শব্দ হলো। দাঁতে দাঁত চেপে থাকায় বাড়ি লাগল। ব্যথা পেল। পিকআপের ফেন্ডারে ঘষা লাগিয়ে পিছলে বেরিয়ে এল তার গাড়ি।

'হয়ে গেছে!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'বাঁচলাম!'

ব্রিজের ওপর থেকে নেমে এসেছে গাড়ি। তীব্র গতিতে ছুটল নীরব গ্রামের পথ ধরে। সাইড দিচ্ছে না, আগে বাড়তে দিচ্ছে না পিকআপটাকে।

'গতি বাড়িয়ে সরে পড়া যায় না?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সেই চেষ্টাই করছি,' জবাব দিল মুসা।

অ্যাক্সিলারেটরে চাপ আরও বাড়াল সে। রিয়ার ভিউ মিররের দিকে এক পলক তাকাল। 'এখনও লেগে আছে।'

মুসার জানালার পাশ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল বুলেট

আঁতকে উঠল রবিন। 'সর্বনাশ! গুলি করছে!'

একের পর এক ফন্দি আসছে মুসার মাথায়। পেছনের খেপা লোকটাকে খসাতে হবে, যে করেই হোক। অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা তুলে আনল, যাতে গতি কমে যায় গাড়ির। রাস্তার ডান পাশে রইল।

'করছ কি?' ভয় পেয়ে গেল রবিন।

'মারবে নাকি সবাইকে!' বলল কিশোর।

'কথা বোলো না!' মুসা বলল।

'কি করতে চাও?' চুপ থাকতে পারল না রবিন।

পিকআপটা চলে এল গাড়ির পাশে। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল মুসা। তার

মতলব বুঝতে পারেনি ওটা, তীব্র গতিতে চলে গেল সামনে।
'ব্যস, হয়েছে,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল মুসা।
সামান্য ডানে মোড় নিল পিকআপ। আবার গুলি করল টেমার। সে-জন্যে পেছন ফিরতে হলো তাকে। একহাতে স্টিয়ারিং ধরেছে।
আবার অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরল মুসা। এগিয়ে গেল পিকআপের পেছনে। এপাশ ওপাশ যতই মোড়ামুড়ি করুক এখন টেমার, পেছনে ফিরে আর গুলি করার সুযোগ পাবে না।
'বুদ্ধিটা ভালই করেছে,' প্রশংসা করল কিশোর।
'এখনই আশা কোরো না,' মুসা বলল। 'বলা যায় না কিছু।' টেমার এরপর কি করবে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে।
গতি বাড়িয়ে সরে যেতে লাগল পিকআপ। কিছু যে আর করতে পারবে না বুঝে ফেলেছে বোধহয়।
ছাড়ল না মুসা। সে-ও গতি বাড়াল।
আচমকা ব্রেক কষল পিকআপ। পিছলে গেল চাকা। সরু রাস্তায় ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি।
'দিল তো আটকে!' চেঁচিয়ে বলল রবিন।
ড্রাইভারের পাশের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল বড় একটা পিস্তল। পেছন দিকে তাক করল।
'মাথা নামাও! মাথা নামাও!' সাবধান করল কিশোর।
কিন্তু অন্য ফন্দি করে ফেলেছে মুসা। চেপে ধরল অ্যাক্সিলারেটর। বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট। ঝাঁকি দিয়ে আগে বাড়ল তার গাড়ি। ডানে কাটল। উঁচুনিচু পথে লাফাতে লাফাতে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটল। পিকআপের পাশ কাটিয়ে আবার আগে চলে এল।
হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কিশোর।
পেছনে ফিরে দেখল পিকআপ থেকে নেমে পড়েছে টেমার। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। হঠাৎ ব্রেক কষায় বন্ধ হয়ে গেছে ইঞ্জিন। বোধহয় চালু করতে পারেনি। ওদেরকে ধরার আশা বাদ দিতে হয়েছে তাকে।
'বাঁচালে!' রবিন বলল।
ক্রমশ গতি বাড়াচ্ছে মুসা। 'বাড়ি ফিরতে হবে এখন যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। লোকটাকে বিশ্বাস নেই!'

ইয়ার্ডে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে কোন কাস্টোমার নেই।
গাড়ি থেকে নেমে ওঅর্কশপে ঢুকল তিন গোয়েন্দা
রবিন জানতে চাইল, 'এবার কি করা?'
'অবশ্যই কেসের কাজ। এর সমাধান এখনও হয়নি।'
'কিন্তু মিস্টার পানশ তো চান না আমরা আর তদন্ত করি।'

'তিনি বললেই তো আর হলো না। ব্যাপারটাতে আমরাও জড়িয়ে গেছি। টেমার আমাদের খুন করতে চেয়েছে। সবুজ জ্যাকেট পরা লোকটাকেও বাদ রাখা যায় না। হয়তো সে-ই সুইচ টিপে রকেটটা ধসিয়ে দিতে চেয়েছিল আমাদের ওপর।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। হাত মুঠো করে বলল, 'টেমারের নাকে একটা ঘুসি বসিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

'আগে তাকে খুঁজে তো পেতে হবে। সবুজ জ্যাকেটকেও। আমার বিশ্বাস, একসাথে কাজ করছে ওরা। একই দলের লোক।'

'রাতে কি এখানে থাকতে বলছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'অসুবিধে আছে?' কিশোর জানতে চাইল।

'তা নেই।'

'থাকো তাহলে।'

উঠে দাঁড়াল রবিন। 'গাড়িতে আমার কিছু জরুরী কাগজপত্র রয়েছে রাতে থাকবই যখন, এখানে বসেই দেখে ফেলব। আসছি।'

মুসা বলল, 'খাওয়ার কি ব্যবস্থা?'

উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলল কিশোর। বয়মে অল্প খানিকটা পানাট বাটার আছে। ব্যস। মুসার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'নেই। বাইরে যেতে হবে। চাচীর সামনে পড়তে চাই না, আবার কোন কাজে লাগিয়ে দেবে। তার চেয়ে দোকান থেকে পিজা নিয়ে আসি।'

'যাওয়ার দরকার কি? ফোনে অর্ডার দিলেই তো হয়

'তা-ও তো কথা,' ফোনবুকটা টেনে নিল কিশোর। ডায়াল করতে করতে বলল, 'মনে আছে, পানশ বলেছেন কিছু খাবার চুরি হয়েছে?'

'আছে। তাতে কি?'

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল রবিন। উত্তেজিত ফিসফিস স্বরে বলল, 'বললে বিশ্বাস করবে না, ইয়ার্ডে ঢুকে বসে আছে সে!'

'কে, সবুজ জ্যাকেট?' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

খেপা চিতার মত গরগর করে উঠল মুসা, 'ধরতে পারলেই হয় আজ!'

'সাবধান, তাড়াহুড়া করবে না। এমন করে বেরোও যেন কিছুই হয়নি,' কিশোর বলল।

ইয়ার্ডের অফিসে ঢুকে সুইচ টিপে আলোগুলো নিভিয়ে দিল ও। আস্তে করে আবার চত্বরে বেরিয়ে এল মুসা ও রবিন। কিশোর এল ওদের পেছনে। জঞ্জালের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল তিনজনে।

আড়ালে আড়ালে ঘুরে চলে এল সামনের দিকে।

ফিসফিস করে রবিন জানাল, 'ওই ওদিকটায়, হিবিসকাস ঝাড়ের আড়ালে লুকাতে দেখেছি।'

'তুমি ওদিক দিয়ে যাও,' ডানপাশ দেখিয়ে রবিনকে বলল মুসা। কিশোরকে দেখাল বাঁ পাশ। মাথা নুইয়ে পা টিপে টিপে নিজে এগোল

সরাসরি।

বারো

বেড়ার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল মুসা। চোখ হিবিসকাস ঝাড়টার দিকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পুরস্কার মিলল অবশেষে। মৃদু একটা নড়াচড়া লক্ষ করল।

ডানে তাকিয়ে দেখল, একটা ছায়া ছুটে গেল রবিনের ফোক্সওয়াগেন গাড়িটার কাছে। নিশ্চয় রবিন। লুকিয়ে পড়ল গাড়ির আড়ালে। চোখের কোণ দিয়ে জঞ্জালের একটা স্তূপের কাছে কিশোরকেও দেখতে পেল।

এইবার সময় হয়েছে। লোকটাকে লক্ষ্য করে দৌড় দিল মুসা।

লোকটাও বুঝে ফেলল তার অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেছে। উঠে দৌড় মারল মুসা আর কিশোরের মাঝখানের খোলা পথটা দিয়ে।

তবে পেরোতে পারল না। তার আগেই পৌঁছে গেল মুসা। কারাতের লাথি চালাল।

তাকে অবাক করে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে সরে গেল লোকটা। পাল্টা লাথি হাঁকাল। তার মানে সে-ও কারাত জানে।

চেষ্টা করেও কিছুতেই তাকে কাবু করতে পারল না মুসা।

পাশ থেকে এগিয়ে এল কিশোর।

দু-জনকে দেখে বুঝতে পারল সবুজ জ্যাকেট, মারামারি করে আর ঠেকাতে পারবে না। ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বলে উঠল, 'খবরদার, আমার পকেটে কিন্তু পিস্তল আছে!'

থমকে গেল মুসা।

কিশোরও দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝার চেষ্টা করছে কোথায় আছে পিস্তলটা।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'টেমার কোথায়?'

অন্য পাশ থেকে এগিয়ে আসছে রবিন, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। 'কে?'

'টেমার, টেমার ভেগাবল!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'গুলি খেতে না চাইলে জলদি বলো!'

মুসা দেখল লোকটার বাঁ হাত খালি। ডান হাত জ্যাকেটের পকেটে। উঁচু হয়ে আছে পকেটটা, তবে পিস্তল থাকলে যতটা ফোলার কথা ততটা নয়। কেবল হাতের মুঠো।

'কি দিয়ে গুলি করবেন?' ঝাঁঝাল স্বরে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'খালি আঙুল দিয়ে?'

কিশোর আর রবিনও বুঝল ব্যাপারটা।

তিন দিক থেকে আক্রমণ চালাল ওরা। কাবু করে মাটিতে ফেলে দিল লোকটাকে।

রবিন বলল, 'হয়েছে, এবার উঠুন। আর কোন চালাকির চেষ্টা করবেন না।'

নড়ল না লোকটা।

নিচু হয়ে পরীক্ষা করে দেখল মুসা। 'উঠবে কি? বেহুঁশ হয়ে গেছে তো।'

উদ্বিগ্ন হলো তিন গোয়েন্দা। বুকে কান পেতে দেখল কিশোর। হার্টবিট ঠিকই আছে।

ধরাধরি করে লোকটাকে নিয়ে আসা হলো ওঅর্কশপে।

একটা কাউচে শুইয়ে দেয়ার পর কিশোর বলল, 'টেমারকে খুঁজতে এসেছে, তারমানে সে তার সঙ্গে কাজ করছে না।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' একমত হলো রবিন। 'কিন্তু টেমারের খবর আমরা জানি জানল কি ভাবে?'

এই সময় গুঙিয়ে উঠল লোকটা। চোখ মিটমিট করল। চুলের মতই চোখও তার কুচকুচে কালো। হতাশ কণ্ঠে বলল, 'টেমারকে তাহলে তোমরাও পাওনি?'

'এ সব অভিনয় বাদ দিন,' ধমক দিয়ে বলল মুসা। 'না জানার ভান করে পার পাবেন না। কিশোরের গায়ে ঠেলাগাড়ি ফেলতে চেয়েছিলেন কেন?'

'টেমারের ঘরে?' সোজা হয়ে বসল লোকটা। কপালের একটা জায়গা সুপারির মত ফুলে আছে। আঙুল দিয়ে ডলল। 'ও-ই তাহলে কিশোর?' হাত তুলে ওকে দেখিয়ে বলল। 'ভয় পাচ্ছিলাম রান্নাঘরে ঢুকে আমাকে দেখে ফেলবে। তাই ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম।'

'আমাদের ওপর রকেট ধসিয়েছে কে?' জানতে চাইল কিশোর। 'সেটাও কি ভয় দেখানোর জন্যে? না বোঝার ভান করবেন না। নরটন কোম্পানিতে আপনাকে দেখেছি আমি।'

'প্রথম কথা হলো, তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমার, শত্রুতা নেই। রকেট ধসানোর প্রশ্নই ওঠে না। আমি কেবল তোমাদের পেছনে লেগে থেকে টেমারকে খুঁজে বের করতে চেয়েছি। বহু জায়গায় খুঁজেছি তাকে, পাইনি। রকেট ধসাতে দেখে অনুমান করলাম টেমারের কাজ। ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখেছিলাম। ঠিক একই সময়ে তুমিও আমাকে দেখে ফেলে তাড়া করলে। পালালাম। তাকে আর ধরতে পারলাম না।'

'টেমার গিয়েছিল ওখানে?'

'গিয়েছিল। কেন, জানি না। ভাবসাবে মনে হয়েছে পানশের সঙ্গে কোন ব্যাপার আছে।'

নিচের ঠোঁটে ঘনঘন কয়েকবার চিমটি কাটল কিশোর। বলল, 'এক কাজ করতে পারি, তথ্য বিনিময় করতে পারি আমরা। তার আগে পরিচয়ের পালাটা শেষ করে ফেলি।' নিজের নাম বলে হাত বাড়িয়ে দিল সে। রবিন আর মুসার পরিচয়ও দিল। বলল, 'নরটনে আপনি কি করছিলেন, সেই প্রশ্ন দিয়েই শুরু করা যাক।'

লোকটা বলল, 'আমার নাম কলিন জোনস। টেমারের মতই আমিও

নরটনের একজন প্রোগ্রামার। আমরা দু-জনে বন্ধু ছিলাম। কম্পিউটার গেম থেকেই এই গোলমালের সূত্রপাত। অবসর সময়ে বসে বসে মক ওয়ার খেলতাম আমরা।'

'নকল যুদ্ধ?' মুসার প্রশ্ন। 'ভিনগ্রহবাসীদের সঙ্গে লড়াই করতেন নাকি?'

'না। মক ওয়ার হলো কম্পিউটার প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে লড়াই,' বুঝিয়ে দিল কলিন। 'প্রোগ্রাম ধ্বংস করতে হয়।'

'ভাইরাস দিয়ে?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল কলিন। 'ভাইরাস দিয়েও হয়, তবে তাতে ঝুঁকি বেশি। আমরা অন্য কায়দা বের করেছিলাম। এমন প্রোগ্রাম বের করতাম, যেটা দিয়ে একে অন্যেরটা খেয়ে ফেলতে পারি। যে যত বেশি খেতে পারবে, তার পয়েন্ট বেশি হবে। খেলার পর খুনী প্রোগ্রামগুলো কম্পিউটারের মেমোরি থেকে মুছে দিতাম, তাই ভয়ের কিছু থাকত না।'

'নিরীহ এই মক ওয়ার তাহলে ব্ল্যাকমেলে রূপ নিল কি করে?' প্রশ্ন করল রবিন।

'টেমারের লোভের কারণে,' রাগত স্বরে বলল কলিন। উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করে শরীরের আড়ষ্টতা দূর করার চেষ্টা করল। তারপর দাঁড়াল তিন গোয়েন্দার মুখোমুখি। 'ও আমাকে প্রায়ই বলত, টাকা ছাড়া বাঁচার কোন অর্থ নেই। তার মত বুদ্ধিমান লোকের টাকা থাকবে না, এটা হতে পারে না। যে চাকরি করি আমরা, তাতে কোনদিন টাকা আসবে না, ওতে লেগে থাকাটাও নেহায়েত বোকামি। তারপর এক রাতে আমরা মক ওয়ার খেলার সময় কুমতলবটা মাথায় এল তার। নরটনের কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকিয়ে দেবে।'

'ব্ল্যাকমেল করার জন্যে!' মুসা বলল।

'হ্যাঁ,' আবার কাউচে বসে পড়ল কলিন। 'ওর মাথায় দোষ আছে। খেপা লোক। বিশ্বাস করিনি, ভাবলাম ঠাট্টা করছে। কিন্তু শনিবার সকালে পানশের ফোন পেয়েই মাথায় যেন বাজ পড়ল আমার। বুঝলাম, মোটেও ঠাট্টা করেনি। পানশ জানালেন, নরটনের কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়েছে টেমার, টাকা দেয়ার জন্যে হুমকি দিয়ে মেসেজ রেখে গেছে। ভাইরাস সরানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম, অনেক বেশি জটিল। অ্যান্টিডোট ছাড়া কোন ভাবেই হবে না।'

'সে-জন্যেই টেমারকে খুঁজছেন,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। আগামী কাল রাত বারোটা নাগাদ একটা ফোন করে বলা হবে পানশকে, কোথায় রেখে আসতে হবে পঞ্চাশ লাখ ডলার।'

'তারমানে হাতে আর মাত্র একটা দিন আছে আমাদের!' রবিনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

মাথা ঝাঁকাল কলিন। 'আমার কথা তো শুনলে। তোমাদের কথা বলো এবার। টেমারকে দেখেছ?'

'ঘণ্টা দুই আগে আমাদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা

চালিয়েছিল সে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। পিকআপ নিয়ে তাড়া করার ঘটনাটা জানাল কলিনকে।

কলিনের দিকে তাকাল রবিন, 'ঠিকই বলেছেন, খেপা লোকই

নিজের এক হাতের তালুতে আরেক হাত দিয়ে কিল মারল কলিন। 'ব্যাটাকে এখন ধরতে পারলে হয়! নিজেকে ধনী বানানোর জন্যে আমাদের অত কষ্ট করে করা সমস্ত প্রোগ্রাম ধ্বংস করে দিতে চাইছে!'

কিশোর উঠে পায়চারি শুরু করল এবার। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। জোর ভাবনা চলেছে মাথায়।

'কি ভাবছ, কিশোর?' জানতে চাইল রবিন।

'চাবিটা রয়েছে নরটনে,' আনমনে জবাব দিল কিশোর। 'আমাকে নিশ্চয় সেখানে দেখেছে টেমার। ভেবেছে, আমিও তাকে দেখে ফেলেছি। পানশকে বলে দেব। আমার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে হয়তো রকেট ধসিয়ে দিয়ে। তাতে বিফল হয়ে শেষে পিছে লেগেছে অন্যভাবে মারার জন্যে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'তারমানে নরটনই এখন একমাত্র জায়গা, যেখান থেকে এগোতে পারি আমরা। আজ যখন গিয়েছিল, কালও যেতে পারে টেমার।' সবার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। মন দিয়ে শোনো...'

তেরো

মঙ্গলবার সকাল। ওঅর্কশপে কাজ করছে কিশোর। দুটো ওয়াকি-টকিতে পাওয়ার বুস্টার লাগিয়ে দুই ওয়াট ক্ষমতাকে পাঁচ ওয়াট করে দিল।

'কাজ হবে তো?' গ্যারেজের কাছ থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল মুসা। সে আর রবিন একটা লম্বা কাপড়ে রঙ দিয়ে সাইন লিখছে।

'আশা তো করি,' জবাব দিল কিশোর।

একটা গাড়িতে করে ইয়ার্ডে ঢুকল কলিন। গাড়ি থেকে নেমে বড় বড় ছয়টা বাক্স নামাল। বেকারি থেকে নিয়ে এসেছে। লোভনীয় সব খাবার। বাক্সগুলো তুলতে লাগল মুসার ভ্যানের পেছনে।

লেখা শেষ।

বেশ খানিকটা পিছিয়ে এসে দেখতে দেখতে বলল রবিন, 'চমৎকার হয়েছে, তাই না?'

'দারুণ!' মুসা বলল।

দু-জনে মিলে কাপড়টা নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিল ভ্যানের পাশে।

কিশোরও বেরিয়ে এল। দেখল কাপড়টা। বাঁ দিকে আঁকা হয়েছে একটা কফি কাপ আর কিছু ডোনাট। ডানে চকোলেটের বার। মাঝখানে লেখা:

খাবার চাই? রেডিমেড খাবার? কফি?

এতই সুগন্ধ বেরোচ্ছে, কিশোরের মত খাওয়ার প্রতি অনীহা-ওয়ালা মানুষও লোভীর মত তাকাতে লাগল বাক্সগুলোর দিকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রাশেদ পাশা। হাতে একটা বড় কফি মেকার। কাছে এসে বললেন, 'দেখ, কি এনেছি। এই জিনিস আর আজকাল বানায় না কেউ। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কাপ কফি ইতিমধ্যেই বানানো হয়ে গেছে এটা দিয়ে। আরও অনেক পারা যাবে। পাবি এ রকম?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, চাচা।'

কফি মেকারটা ভ্যানে তুলল মুসা। একে একে তোলা হলো বোতলে ভরা পানি, কফি, শুকনো গুঁড়ো-মাখন, চিনির প্যাকেট।

আগ্রহ নিয়ে সে-সব দেখছিলেন রাশেদ পাশা, একজন কাস্টোমারকে ঢুকতে দেখে তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন তার দিকে।

ভ্যানে তোলা জিনিসগুলো আরেকবার মিলিয়ে দেখল কিশোর। বলল, 'হয়ে গেছে। এবার যাওয়া যায়।'

ড্রাইভিং সীটে বসল কিশোর। পাশে কলিন। মুসার গাড়িতে বসে ওদের পিছে পিছে রওনা হলো সে আর রবিন।

রকি বীচ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার ভেতর দিয়ে এগোল দুটো গাড়ি। কালো চ্যাপ্টা বাক্সটা দেখতে দেখতে বলল কলিন, 'এই তাহলে তোমার হাতে বানানো ওয়াকি-টকি।'

'হ্যাঁ। ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছি। মুসা আর রবিনকে যেটা দিয়েছি সেটারও। আবহাওয়া ভাল থাকলে আর উঁচু কোন বাধা না থাকলে বিশ মাইল দূর থেকেও ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারব।'

'পথে কোন পর্বত পড়বে না।'

'না। আর আবহাওয়াও চমৎকার। অসুবিধে হবে না। টেমারকে দেখতে পেলেই হয় এখন...'

নরটন কোম্পানির কাছে পৌঁছে গেটের পাশে ভ্যানটাকে পার্ক করল কিশোর। যাতে গেট দিয়ে কেউ ঢোকা কিংবা বেরোনোর সময় সহজেই দেখতে পায়।

ভ্যানের পাশ কাটিয়ে চলে গেল মুসা। রাস্তার ধারের ইউক্যালিপটাস ঝাড়ের আড়ালে রাখল তার গাড়ি। ওখান থেকে গেট এবং তার আশপাশের অনেকখানি জায়গার ওপর নজর রাখতে পারবে। টেমার এলে তাকে চোখে পড়বেই, প্রয়োজনে তাড়া করতে পারবে।

কিশোর ভ্যানটা পার্ক করতে না করতেই একটা গাড়ি এসে থামল পাশে। সকেটে কপি মেকারটার প্লাগ ঢুকিয়ে দিল কলিন। পেছনের দরজা হাঁ করে খুলে দিল কিশোর, রাস্তা থেকেও লোকে যাতে ভেতরে কি সামগ্রী আছে দেখতে পায়।

গাড়ি থেকে নামল ডেনিম জ্যাকেট পরা একজন লোক। বিড়বিড় করে পড়ল, 'রেডিমেড খাবার!' এগিয়ে এসে ভ্যানের ভেতরে উঁকি দিল সে। শিস

দিয়ে উঠল। 'বাহ্, দারুণ জিনিস এনেছ তো!' বড় বড় দুটো চকোলেট বার কিনল সে। কফির অর্ডার দিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাস্টোমারের লাইন লেগে গেল ভ্যানের পেছনে। ভেতরে এমন করে বসে থেকে জিনিসপত্র কিশোরের হাতে তুলে দিতে লাগল কলিন, যাতে কেউ তার মুখ দেখতে না পায়। সহকর্মীরা চিনতে না পারে।

ভিড় একটু কমলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল সে, 'দারুণ ব্যবসা তো! সব বাদছাদ দিয়ে এই ব্যবসা করলেও তো পারি।'

মাথা ঝাঁকাল শুধু কিশোর। হাসল। ব্যবসায় মন নেই তার। সে ভাবছে টেমারের কথা। আসবে তো লোকটা? এখনও আসে না কেন? চোখ পড়ল চকোলেট বারের বাক্সের ওপর। খেতে ইচ্ছে করল। হাত বাড়াল নেয়ার জন্যে।

'কিশোর!' ফিসফিসিয়ে বলে উঠল কলিন। 'পানশ এসেছেন!'

হাতটা থেমে গেল কিশোরের। ফিরে তাকাল খোলা দরজার দিকে। পানশের টাক মাথা, চশমা আর কুৎসিত চেহারাটা দেখল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল বাক্সের আড়ালে, যাতে চোখে পড়ে না যায়।

'ভয় নেই,' কলিন বলল, 'বাইরের খাবার সাধারণত খান না পানশ। আর এভাবে গাড়িতে করে আনা জিনিসের দিকে তাকাবেনও না। আসবেন না এদিকে।'

পানশ চলে গেলে আবার চকলেটের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। বের করার আগেই আবার কলিনের কথায় হাত থেমে গেল।

'কিশোর, আরও কাস্টোমার আসছে!'

ধ্যাত্তোরি, কাস্টোমারের নিকুচি করি! মনে মনে রেগে গেল কিশোর। আগে নিজের পেট ভরি, তারপর অন্য কথা!

বিক্রি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেল দু-জনে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ সবগুলো বাক্সই প্রায় খালি হয়ে গেল। কিন্তু টেমারের দেখা নেই।

নরটনের কর্মীরা বেরিয়ে যেতে শুরু করল।

'ভালমত নজর রাখুন,' হুঁশিয়ার করল কিশোর। 'আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এবার যেন আর ঢুকতে না পারে টেমার।'

গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে রবিন আর মুসাও বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিশোরদের তো কাজ ছিল, সময় কেটেছে, কিন্তু ওদের শুধুই বসে থাকা। ভীষণ বিরক্তিকর। দিনটাকে মনে হয়েছে অনেক বেশি দীর্ঘ। ঢিল দিয়েছিল নজর রাখায়। গাড়িগুলো বেরোতে দেখে আবার সতর্ক হয়ে উঠল।

হঠাৎ রাস্তায় টায়ারের ঘষার শব্দ হলো। রূপালী একটা সুবারু গাড়ি এসে দাঁড়াল ভ্যানের পেছনে।

বাক্সের আড়ালে মাথা নুইয়ে ফেলতে ফেলতে কিশোর বলল, 'পানশ! দেখে ফেললেন নাকি?'

সামনের সীটে বসা কলিনও মাথা নোয়াল।

'আর লুকিয়ে লাভ নেই!' চিৎকার করে কিশোরকে ডাকলেন পানশ, 'নেমে এসো! তোমাকে বলেছিলাম এ সব থেকে দূরে থাকতে, শোনোনি! এবার আর ছাড়ব না!'

চোদ্দ

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। সে-ও রেগে গেল। 'আমরা কি করব না করব, সেটা আমাদের ব্যাপার, মিস্টার পানশ। আজ আর চুরি করে ঢুকিনি আমরা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাবার বিক্রি করেছি। কোন দোষ ধরতে পারবেন না। টেমার এখন শুধু আপনার নয়, আমাদেরও শত্রু। কাল মেরে ফেলতে চেয়েছিল আমাদেরকে, অল্পের জন্যে বেঁচেছি।'

চমকে গেলেন পানশ, 'কি করতে চেয়েছিল!'

পিকআপ নিয়ে তাড়া করে কি ভাবে ওদের মারতে চেয়েছিল জানাল কিশোর।

'হুঁ,' মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন পানশ, 'ব্যাপারটা এখন তোমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছে। কিন্তু আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না। নরটনকে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারব না আমি।...এবারও ছেড়ে দিলাম। যাও। তবে আবার এলে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব আমি।'

দাঁড়িয়ে রইলেন সিকিউরিটি চীফ।

দরজা বন্ধ করল কিশোর। ড্রাইভিং সীটে বসল। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

ইউক্যালিপটাসের ঝাড় থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এল মুসা আর রবিন।

আস্তে মাথা তুলে পেছনে তাকিয়ে কলিন বলল, 'এখনও আছেন। আমরা না গেলে যাবেন না। আমি আশা করেছিলাম আটটা পর্যন্ত থাকতে পারব। সবাই চলে যাবে ততক্ষণে।...খামোকাই কষ্ট করলাম সারাটা দিন। কাজ হলো না।'

চোয়াল শক্ত হলো কিশোরের। 'টেমারকে ধরবই আমরা, যে ভাবেই হোক!'

ইয়ার্ডে ফিরে এল ওরা।

সূর্য ডুবে গেছে। একটা দুটো করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। পিজা চিবুচ্ছে তিন গোয়েন্দা আর কলিন।

খাওয়ার পর বেড়ায় হেলান দিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ল কিশোর, রবিন আর কলিন। ভ্যানটাকে পরিষ্কার করতে লাগল মুসা।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে কলিন বলল, 'ব্ল্যাকমেল করে পার পেতে দেয়া হবে না ওকে কিছুতেই।'

'ব্ল্যাকমেল করা বাদ দিলেও এখন আর ছাড়ব না ওকে,' রাগ করে ভ্যানের বডিতে ন্যাকড়া ডলতে ডলতে ফুঁসে উঠল মুসা। 'আরেকটু হলেই এখন মর্গে পড়ে থাকত আমাদের লাশ।'

'কিশোর,' রবিন বলল, 'চুপ করে আছ কেন? কি ভাবছ? এভাবে পরাজিত হতে পারি না আমরা।'

মুখ তুলল কিশোর, 'উঁ? পরাজয়? মোটেও না। উপায় একটা বেরোবেই।'

কলিন বলল, 'এক কাজ করতে পারি আমরা। পানশ টাকাটা কোথায় নিয়ে যান টেমারকে দেয়ার জন্যে, জানার চেষ্টা করব।'

'কি করে?' মুসার প্রশ্ন।

'আজ রাত পৌনে এগারোটা থেকে পৌনে বারোটার মধ্যে তাঁর বাড়িতে ফোন পাবেন পানশ। টাকাটা কোথায় দিয়ে আসতে হবে বলবে টেমার। আমরা পানশকে অনুসরণ করতে পারি।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। 'টাকাটা হাতে পেলে বহুদূরে চলে যাবে টেমার, উধাও হয়ে যাবে, আর তাকে খুঁজে বের করা যাবে না।'

'চলো, বেরিয়ে পড়ি,' মুসা বলল।

ঘড়ি দেখল কিশোর। বলল, 'আরও খানিকক্ষণ বসি। দশটায় রওনা হব আমরা।'

পনেরো

মুসার গাড়িতে বসে আছে সে আর রবিন। পানশের বাড়ির ঠিকানা নিয়েছে কলিনের কাছ থেকে। আবাসিক এলাকায় বাড়ি। চাঁদের আলোয় রাস্তার এ মাথা-ওমাথায় চোখ বোলাল মুসা। ছায়াঢাকা একটা জায়গায় গাড়ি রাখল।

ওয়াকি-টকি মুখের কাছে এনে রবিন বলল, 'পৌছে গেছি।'

'শুনছি,' কলিনের জবাব এল।

রবিনকে বলল মুসা, 'চলো, নামো।'

গাড়ি থেকে নেমে লনের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে এগোল দুই গোয়েন্দা। র‍্যাঞ্চ-স্টাইল বাড়িটার সামনের জানালায় আলো। কাছে এসে ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসল দু-জনে।

'কথা শুনছ?' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন।

আস্তে করে মাথা তুলল ওরা। জানালার ওপাশটা চোখে পড়ল।

'পানশ,' বলল মুসা।

সিকিউরিটি চীফের সঙ্গে বসে আছেন সোনালি চুল এক মহিলা। পরনে কালো চামড়ার প্যান্টস্যুট।

'নোরা ডফম্যান!' রবিন বলল।
মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'নরটন কোম্পানিতে ছবি দেখেছি যাঁর।'
স্পেস অ্যান্ড পিকচারের প্রতিষ্ঠাতা এবং মালিক। সোফায় বসে নার্ভাস ভঙ্গিতে লম্বা বাদামী একটা সিগার টানছেন।
টেলিফোনের কাছাকাছি পায়চারি করছেন পানশ। পরনে বিজনেস স্যুট। কাছেই টেবিলে রাখা একটা কালো প্লাস্টিকে মোড়া প্যাকেট।
নিচু স্বরে কথা বলছেন ওঁরা। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না কিছু।
'ফোনের অপেক্ষায় আছেন,' অনুমান করল রবিন।
মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'চলো, গাড়িতে। কিশোরকে জানাই কি ঘটছে।'

রবিন আর মুসা কি করছে, ওয়াকি-টকিতে জানল কিশোর ও কলিন।
ভ্যানের জানালা নামিয়ে দিয়ে কলিনের আইডেনটিটি কার্ডটা সেনট্রি বক্সের স্লটে ঢুকিয়ে দিল কিশোর। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নিঃশব্দে খুলে গেল নরটন কোম্পানির বিশাল ইস্পাতের গেট।
গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর।
'হোম, সুইট হোম,' সুর করে নিচুস্বরে বলে উঠল কলিন। 'মনে হচ্ছে কত বছর পর ঢুকলাম!'
জায়গাটাকে সত্যি ভালবাসে সে, বুঝল কিশোর।
লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছের মাথা দিয়ে চুইয়ে নামছে চাঁদের আলো। বিশাল চত্বরে আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে গাছগুলো। বাড়ির দেয়ালে আর থামের মাথায় বসানো আলো এসে পড়েছে মাটিতে।
হঠাৎ করেই উদয় হলো লোকটা। ব্রেক কষল কিশোর। টর্চের আলো এসে পড়েছে চোখেমুখে।
'কোথায় যাচ্ছ?' ধমকে উঠল লোকটা। নাকে লাগিয়ে কথা বলে।
'আপনি কে?' কণ্ঠস্বর নরম করল না কিশোর।
পাশ থেকে কাত হয়ে আলোতে মুখ নিয়ে এল কলিন। 'হোরেস, কেমন আছ?'
'আপনি!' কর্কশ হলো নাকে-লাগা কণ্ঠ, আলোটা সরাসরি পড়ল কলিনের ওপর। 'আপনার দোস্ত টেমার কোথায়? খোঁজ পেলেই জানাতে বলেছেন মিস্টার পানশ।'
মুখের ওপর থেকে আলো সরে গেছে, চোখে সয়ে এল কিশোরের। লম্বা একজন মানুষকে দেখতে পেল, গার্ডের ইউনিফর্ম পরা।
'টেমারকে তো দেখি না বেশ কিছুদিন, আমিও তাকে খুঁজছি,' জবাব দিল কলিন। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, 'ও আমার বন্ধু। লোকজন কি সব চলে গেছে?'
'এত রাতে কি আর থাকে কেউ, বহু আগেই চলে গেছে। আপনি আর টেমারই কেবল থাকতেন। তো, কি জন্যে এসেছেন?'
'কাজ করতে,' কলিন বলল। 'বেরোনোর সময় জানিয়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়ির সামনে থেকে সরে গেল হোরেস।
নির্জন পার্কিং লটে এনে গাড়ি ঢোকাল কিশোর।
'মানুষকে চমকে দেয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা লোকটার,' বলল সে।
'হ্যাঁ। এটা তার হবি। মানুষকে ভড়কে দিয়ে আনন্দ পায় সে।'
গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল দু-জনে। 'নটার পরে একমাত্র আমি আর টেমারই কাজ করতাম। অনেক রাতে বেরনোর সময় প্রায়ই দেখতাম, হোরেস চেয়ারে বসে ঢুলছে। তাকে জাগিয়ে দিতাম।'
'ভাবছি কাল এখানে এসেছিল কেন টেমার?' কিশোরের প্রশ্ন।
'হয়তো কিছু নেয়ার জন্যে। জানি না। তবে জরুরী কিছু হবে এটা ঠিক। নইলে এতবড় ঝুঁকি নিত না। পানশের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।'
'টেমারের টেবিলে খুঁজেছেন?'
'খুঁজেছি। লকারেও দেখেছি। তুমিও নাহয় চলো, আরেকবার খুঁজে দেখা যাবে। এলোমেলো করে ফেলেছে সব। তবে সন্দেহজনক কিছু নেই। আমার ধারণা পানশও ঘেঁটেছেন ওসব জায়গা। পাওয়ার কিছু থাকলে পেয়ে গেছেন।'
একটা নিচু ছাতওয়ালা বাড়ি, একটা ওয়েল্ডিং করার ছাউনি, বড় বড় কাঠের স্তূপ, আর নতুন আরেকটা রকেটের কাঠামো পেরিয়ে এল ওরা।
কিশোর বলল, 'আমারও তাই ধারণা। টেমারের বাড়িতেই যখন খুঁজতে চলে গেছেন, অফিসের টেবিল-লকার কি আর বাকি রেখেছেন। গরুখোঁজা করেছেন সব।'
'শুধু তাঁকে সন্দেহ কেন?' মূল বাড়িটায় ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল কলিন। 'আমিও ঢুকেছিলাম। আমিও তো করে থাকতে পারি?'
'না, পারেননি। ওখানে ঢুকেই প্রথমে আপনার কম্পিউটার চেক করার কথা। হাত দিয়ে দেখেছি, ওটা ঠাণ্ডা ছিল। খোলার সময়ই পাননি। তারমানে ঘরটাতে খোঁজার সময়ই পাননি। কম্পিউটার দেখা শেষ করে তারপর তো ঘর খুঁজবেন। আমার ধারণা ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছেন। তারপর গেছেন টেমারের বাড়িতে খুঁজতে। আমি ঢোকার বড়জোর মিনিট পাঁচেক আগে ঢুকেছিলেন।'
'একেবারে ঠিক,' কিশোরের অনুমানে বিস্মিত হয়েছে কলিন।
কাঠের প্যানেল দেয়া অফিস-করিডর ধরে তাকে নিয়ে এগোল সে। অস্বস্তিকর নীরবতা। পিজার হালকা গন্ধ পেল কিশোর। মোচড় দিল পেট। ঠিকমত খাওয়া হয়নি, আবার খিদে পেয়েছে। ভাল করে খেয়ে আসা উচিত ছিল।
স্টোর রুম খুলল কলিন। ক্লাব ডেড।
বিশাল ঘরটায় ঢুকল দু-জনে। দরজার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ধাতব রোবটটা।
'আমার খুব প্রিয় জায়গা এটা,' কলিন বলল। 'রাতে যখন কাজ করতাম আমি আর টেমার, মাঝে মাঝে উদ্ভট পোশাক পরে দেখতাম কেমন লাগে। ভিডিও দেখতাম, খেলনাগুলো চালু করে দিতাম। মজা দেখবে?'

একটা সুইচ টিপল সে। হলুদ, গোলাপী আর নীল আলোর বর্শা ছুটে যেতে লাগল দিকে দিকে, ঘুরে বেড়াতে লাগল মস্ত ঘরটায়।

আরেকটা সুইচ টিপল সে। শুরু হয়ে গেল উচ্চস্বরে বিচিত্র মিউজিক।

'কারনিভালের মত লাগছে,' বিড়বিড় করল কিশোর।

হঠাৎ ভয়ানক গর্জন করে উঠল কিসে যেন। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল কিশোর। ধাতব একটা বিরাট মুখ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বড় বড় চোখ দুটো থেকে কিশোরের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল লাল আলোর বর্শা। ঝট করে বসে পড়ল সে।

হেসে উঠল কলিন।

তার দিকে তাকাল কিশোর।

হাসতে হাসতে আরেকটা সুইচ টিপল কলিন। হুশ করে কালো একটা বাক্স ওপরে ছুঁড়ে দিল একটা মুখোশ পরা জীব, কিশোরের মাথার ওপরে এসে ঝুলে রইল বাক্সটা।

'উদ্ভট সব জিনিস রেখেছেন আপনারা!' অভিযোগের সুরে বলল কিশোর।

'রাখব না? এ সবই তো আমাদের জনপ্রিয়তার কারণ।'

ক্লাব ভেডে খুঁজতে লাগল দু-জনে। এমন কিছু পেল না যেটা প্রমাণ করে ইদানীং এখানে ঢুকেছিল টেমার। আলো নিভিয়ে দিল কলিন, শব্দ বন্ধ করে দিল। কিশোরকে নিয়ে গেল কাঁচের ঘের দেয়া ঘরটায়, যেখানে কম্পিউটারে কাজ করত সে আর টেমার। টেমারের ড্রয়ার আর ডেস্কের ওপরটা তন্নতন্ন করে খুঁজল।

'নেই,' জানত পাবে না, তবু হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কলিন।

'লকারটা কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

পাশের ঘরে তাকে নিয়ে এল কলিন। মাঝের একটা লকার খুলে বলল, 'এটা টেমারের।'

পুরানো স্নীকার, চকলেটের মোড়ক, ভাঙা থার্মোফ্লাস্ক, আর সাইন্স ফিকশন পেপার বইতে ঠাসা লম্বা, সরু লকারটা।

'এখানেও নেই কিছু,' কিশোর বলল। 'কি করতে ঢুকেছিল এখানে বুঝতে পারছি না!'

'চলো, বেরোই। লুকিয়ে থেকে নজর রাখার একটা ভাল জায়গা চিনি। দেখি, আসে কিনা আজ?'

বাইরে রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে দুলছে ইউক্যালিপটাস। কেমন এক ধরনের তেল-তেল গন্ধ ছড়াচ্ছে। একটা ছাউনির সঙ্গে যুক্ত কাঠের সিঁড়ির কাছে কিশোরকে নিয়ে এল কলিন। ওপরে একটা সরু ডেক, অনেকটা জাহাজের ডেকের মত।

'দারুণ জায়গা,' পছন্দ হলো কিশোরের। রেলিঙে পেট চেপে দাঁড়াল। টেমার এলে এখান থেকে সহজেই দেখতে পাবে।

মূল বাড়ি, সামনের গেট, বেশির ভাগ বাড়িঘর, পেছনের বেড়া চোখে

পড়ছে। সামনে আর দু-পাশের খানিকটা দেয়াল কংক্রীটের, এ ছাড়া বেড়ার বাকি সবটা রেডউড কাঠের তৈরি। ওপরে কাঁটাতারের বেড়া। পেছনে বেড়ার ওপাশে শূন্য মাঠ।

দুটো লন চেয়ার টেনে এনে একটাতে বসতে বসতে কলিন বলল, 'কতদিন লাঞ্চ খেয়েছি এখানে বসে। জায়গাটা ভালই, কি বলো? কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে!'

'যতক্ষণ লাগে থাকব,' জবাব দিল কিশোর। 'আজ আর ছাড়ছি না টেমারকে। এখানে এলে আমরা দেখতে পাব, পানশের বাড়ি গেলে মুসা আর রবিনের চোখে পড়বে। কিছুতেই পালিয়ে যেতে দেব না আজ ওকে!'

গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে মুসা আর রবিন। চোখ পানশের বাড়ির দিকে। আচমকা ঝটকা দিয়ে সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন সিকিউরিটি চীফ। হাতের কালো প্যাকেটটা রূপালী সুবারুর সামনের সীটে ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসলেন ড্রাইভিং সীটে।

নিজের গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা।

'ওই প্যাকেটেই আছে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার,' রবিন বলল।

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

রেডিওতে কিশোরকে খবরটা জানাল রবিন।

চলতে শুরু করেছে সুবারু।

ওটা আধব্লক যাওয়ার সময় দিল মুসা, তারপর পিছু নিল।

শহরতলির দিকে চলেছেন পানশ। সামনে কয়েকটা গাড়ি ঢুকে যেতে দিল মুসা, যাতে সহজে সে চোখে পড়ে না যায়। ওগুলোকে সামনে রেখে নিজেকে আড়াল করতে চাইল।

রকি বীচ হাই স্কুলের গাড়িতে ভরা পার্কিং লটে ঢুকল সুবারু। লাফ দিয়ে নেমে অডিটরিয়ামের দিকে ছুটলেন পানশ।

একটা আর-ভি গাড়ি আর একটা বড় ক্যাডিলাকের মাঝে এক চিলতে জায়গা পেয়ে নিজের ছোট্ট গাড়িটা ঢুকিয়ে দিল মুসা। তাড়াতাড়ি নেমে দৌড় দিল দু-জনে। অডিটরিয়ামে ঢোকার আগেই হাঁ হয়ে খুলে গেল অনেক চওড়া দরজা, হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল লোক।

'নিশ্চয় নাটক হয়েছে,' রবিন বলল।

হাসাহাসি আর জোরে কথা বলতে বলতে বেরোচ্ছে ছেলেমেয়েরা। পানশকে আড়াল করে দিয়েছে।

রবিন আর মুসাকে চিনে ফেলল ওদের স্কুলের একটা মেয়ে। কাছে এসে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'দেরি করে ফেলেছ আসতে?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল রবিন।

মেয়েটার কথায় কান নেই মুসার, সবার মাথার ওপর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে পানশকে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। 'নাহ্, হারিয়েই ফেললাম!'

অবাক হলো মেয়েটা, 'কি বললে?'

শুনলই না মুসা। ভিড় ঠেলে এগোনোর চেষ্টা করল। গেলেন কোথায় পানশ?

সাইকেল র‍্যাকের কাছে চলে এল সে। একটা সাইকেলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল এদিক ওদিক। চোখে পড়ল পানশকে। বড় একটা ডাকবাক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ভেতর থেকে একটা খাম বের করে, মুখ ছিঁড়ে, ভেতরের কাগজ বের করে পড়লেন।

লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে নামল মুসা। গাড়ির কাছে যাওয়া দরকার। রবিন কোথায়? দেখল, পিছিয়ে পড়েছে রবিন; মেয়েটা আসছে তার সঙ্গে সঙ্গে। প্রশ্ন করছে একের পর এক। নিশ্চয় রবিনের ভাবভঙ্গি সন্দেহ জাগিয়েছে তার। ওরা যে গোয়েন্দা, জানে।

মেয়েটাকে খসাতে বেগ পেতে হলো রবিনের।

ততক্ষণে ভয়ানক অস্থির হয়ে গেছে মুসা।

দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠল দু-জনে। গাড়িটা বের করে পানশের গাড়ির কাছে নিয়ে এল মুসা। সাইকেলে উঠে যা দেখেছে ইতিমধ্যে রবিনকে বলে ফেলেছে। ওয়াকি-টকি অন করল রবিন, কি কি ঘটেছে কিশোর আর কলিনকে জানানোর জন্যে।

'পানশ এখন কোথাও গিয়ে টাকাটা ফেলে আসবেন,' কলিন বলল, 'টেমারের তুলে নেয়ার জন্যে।'

'নজর রাখছি আমরা,' রবিন বলল।

সামনের গাড়ির ভিড়ের দিকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে মুসা। 'কি ভিড়রে বাবা! বেরোব কি করে?'

পানশের সুবারু আর মুসার গাড়িটার মাঝখানে আরও চারটে গাড়ি প্রায় বাম্পারে বাম্পার ঠেকিয়ে এগোচ্ছে। হঠাৎ একটা সুযোগ পেয়ে গতি বাড়িয়ে রাস্তায় উঠে গেল সুবারু।

'জলদি করো!' চিৎকার করে মুসাকে বলল রবিন।

'কি করে? গেছি তো আটকে!' সামনের চারটে গাড়ির পাশ কাটিয়ে বেরোনোর কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না মুসা।

এক ঝটকায় দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে গিয়ে দৌড় দিল রবিন। গাড়িগুলোর সামনে গিয়ে হাত তুলে ট্র্যাফিক-নির্দেশ দিতে শুরু করল। এখানে কোন ট্র্যাফিক পুলিশ নেই। রবিনের কাজে খুশি হলো ড্রাইভাররা। নির্দেশ পালন করল।

মুসার ভয় হতে লাগল, সামনের জ্যাম আর কাটবে না। হারাল বুঝি পানশকে! একটা মোড়ের কাছে যেতে দেখল একজোড়া লাল টেললাইট। 'না, যায়নি,' বিড়বিড় করল সে, 'আশা আছে এখনও!'

সরে গেল সামনের গাড়িগুলো। ফিরে এসে আবার গাড়িতে উঠল রবিন। যতটা সম্ভব গতি বাড়িয়ে দিল মুসা। রকি বীচের একটা পথে মোড় নিতে দেখল সুবারুকে।

রবিন বলল, 'কেউ পিছু লাগেনি, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছে

হয়তো।'

'করুক।'

দূর থেকে অনুসরণ করে চলল মুসা। কয়েকটা গাড়ি রয়েছে ওদের সামনে।

মোড় নিয়ে চওড়া একটা অ্যাভিনিউতে ঢুকল সুবারু। পথের বাঁ পাশে জলপাই গাছের সারি. ডান পাশে পাতাবাহারের ঝাড়। সামনের গাড়িগুলো সোজা এগিয়ে গেল। একমাত্র মুসাকেই মোড় নিয়ে নামতে হলো অ্যাভিনিউটায়। চোখে পড়ার ভয়ে হেডলাইট নিভিয়ে দিল সে।

'ওপাশে মাউন্ট লরেটো স্কুল,' পাতাবাহারের ঝাড়ের দিকে হাত তুলল রবিন। 'মেয়েদের।'

জবাব দিল না মুসা। তার একমাত্র চিন্তা পানশের চোখে না পড়া।

একটা ব্লকের মাঝামাঝি গিয়ে গতি কমাল সুবারু। জানালা দিয়ে বেরোল পানশের হাত। কিছু একটা ছুঁড়ে মারল পাতাবাহারের মাথার ওপর দিয়ে।

'নিশ্চয় টাকার প্যাকেট!' বলল রবিন। 'দেখলে না কেমন চকচক করে উঠল প্লাস্টিক?'

ব্রেক চাপল মুসা। ব্যাক গিয়ার দিয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল পাতাবাহারের বেড়া যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে। সামনে টায়ারের আর্তনাদ তুলে নাক ঘুরিয়ে ফেলেছে সুবারু।

ফিরেও তাকাল না মুসা। পানশের ওপর আর নজর রাখার দরকার নেই। বেড়ার মাথায় একপাশে পাথরের একটা খিলান। তার নিচ দিয়ে পথ বেরিয়ে গেছে। তীব্র গতিতে সে-পথ ধরে ছুটল সে। টেমারকে ধরার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ষোলো

আলো নিভিয়ে ছুটছে মুসার গাড়ি। চাঁদের আলোয় চারপাশে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছে দুই গোয়েন্দা।

ছায়ার দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'এখানেই কোথাও থাকার কথা টেমারের।'

ডান পাশে বড় একটা বাড়ি। অন্ধকার। একটা জানালায়ও আলো নেই। কোন গাড়ি চোখে পড়ল না গাড়িবারান্দায়। সামনে সোজা চলে গেছে পথ। বাঁয়ে পাতাবাহারের বেড়া, যার ওপর দিয়ে প্যাকেট ছুঁড়েছেন পানশ।

হঠাৎ নীরবতা ভেঙে দিল একটা শক্তিশালী ইঞ্জিনের শব্দ।

'দেখো,' বলে উঠল মুসা, 'নিশ্চয় টেমারের গাড়ি!'

বেরিয়ে এল একটা ছায়া। বড় বাড়িটার গাছের নিকষ কালো থেকে। জ্বলে উঠল হেডলাইট, লাল টেললাইট।

'ওই তো পিকআপটা!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।
তীব্র গতিতে ছুটে গেল গাড়িটা।
পিছু নিল মুসা।
কিন্তু চোখের পলকে সামনে পথের মোড়ে হারিয়ে গেল পিকআপ। মুসা ধারেকাছে যাওয়ার আগেই।
'গেল কই?' অন্ধকারে গলা বাড়িয়ে তাকাচ্ছে রবিন।
একটা পাঁচ-রাস্তার মোড়ে বেরিয়ে এল মুসা। চিহ্নই নেই পিকআপের।
'গেল!' হতাশ কণ্ঠে সীটে হেলান দিল মুসা। 'সাংঘাতিক শক্তিশালী ইঞ্জিন। বারো সিলিন্ডারের কম না।'
ওয়াকি-টকির বোতাম টিপে কিশোরকে দুঃসংবাদটা দিল রবিন।

'হারিয়ে ফেলেছ?' চমকে গেল কিশোর। 'বলো কি?' এরপর কোথায় যাবে টেমার কল্পনা করল সে—কোন চমৎকার দ্বীপে, যেখানে বিলাসবহুল জীবন যাপন করবে চিরকাল।
'এমন একটা জায়গা বেছেছে লোকটা,' রবিন বলছে, 'যেখান থেকে টাকাটা নিয়েই পালাতে পারে। বাধা এলেও সহজে কাটাতে পারে। একটা পাঁচ-রাস্তার মোড়।'
'তার ইঞ্জিনটাও সাংঘাতিক। তাড়া করে পারতাম না আমরা।'
'কাল যে কি করে পেরেছে মুসা, সেটাই বুঝতে পারছি না। আসলে আমাদের ভাগ্যই ভাল ছিল। নইলে ওই গাড়ির সঙ্গে কোনমতেই পারার কথা না।'
'কিন্তু ওকে এ ভাবে পালিয়ে যেতে দিতে পারি না!' কলিন বলল।
'না দিয়ে কি করব? চলেই তো গেল!'
'দেয়াটা উচিত হয়নি!' রেগে গেল কিশোর। 'যাও, খুঁজে বের করো!'
'কোত্থেকে?' বলল বটে, কিন্তু এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ ঠিকই বাড়াল মুসা। তীব্র গতিতে ছোটাল তার ছোট্ট গাড়িটাকে।
'আমাদের কাছে তো আর জাদুর বল নেই যে তার মধ্যে দেখব কোথায় গেছে টেমার,' লোকটাকে হারানোতে রবিনও মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না।
'চুপ করে বসে থাকলে এখন আরও দেখতে পাবে না,' কিশোর বলল। 'খোঁজো, খুঁজতে থাকো, পেয়েও যেতে পারো।
চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল কলিন। 'চলো, আমরাও বেরোই। গাড়ি নিয়ে ঘুরি। ওর বাড়িতে দেখে আসতে পারি।'
'মরলেও যাবে না ওখানে,' কিশোর বলল।
নিরাশ ভঙ্গিতে আবার বসে পড়ল কলিন।
'টাকা নিয়ে তো ভাগল,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'পানশকে অ্যান্টিডোটটা দেবে কি করে? এটা জানা গেলে ধরার আরেকটা চেষ্টা চালাতে পারি।'

'রাত ঠিক বারোটা পনেরো মিনিটে পানশকে ফোন করার কথা টেমারের। অ্যান্টিডোট পাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন পানশ। কথা না রাখলে এইবার টেমারের কপালে দুঃখ আছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন পানশ, তারপর পুলিশকে খবর দেবেন। এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে টেমারের বেরোনোর যতগুলো পথ আছে, সব আটকে দেবে পুলিশ। সমস্ত শক্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে লাগবেন পানশ। কারণ তখন আর কিছু হারানোর ভয় থাকবে না তাঁর।'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'এগারোটা তিরিশ। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি। কিন্তু অ্যান্টিডোট হাতে পাওয়ার পরও তার পেছনে লাগতে পারেন পানশ, টাকাটা ফেরত পাওয়ার জন্যে, সেটা জানে না টেমার?'

হাসল কলিন। 'লাগতেই পারেন। নিশ্চয় বাঁচার কোন প্ল্যান করে রেখেছে টেমার।'

'কি প্ল্যান হতে পারে?'

'তা জানি না। কিছু একটা করবে। তার ব্রেন খুব শার্প, ভীষণ বুদ্ধিমান। খেপামি স্বভাবটাই মেরে দিল তাকে।'

ব্রিজের ওপর দাঁড়ানো লোকটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক ছিল না, উন্মাদের। 'ঠিকই বলেছেন, লোকটা পাগল। বেশি বুদ্ধিমান কিছু কিছু মানুষ ওরকম পাগল হয়ে যায়।'

এই সময় দূরে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। প্রথমে গুরুত্ব দিল না কিশোর। তারপর চোখে পড়ল শূন্য মাঠের ওপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে আসছে একজোড়া হেডলাইট।

উঠে দাঁড়াল সে। 'ওটা কার গাড়ি?'

'কি করে বলব? এদিকেই তো আসছে!'

'পেছনে গেট আছে?'

'না।'

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামল দু-জনে। পেছনের বেড়ার কাছে দৌড়ে এল। ইঞ্জিনের শব্দ বাড়ছে।

'হেভি-ডিউটি মোটর,' কিশোর বলল।

'টেমারের পিকআপ বলে তো মনে হচ্ছে না,' বিশ্বাস করতে পারছে না কলিন। 'নাকি? ওর কথা অবশ্য কিছু বলা যায় না। আমি যে ইঞ্জিনটার শব্দ শুনেছি, হয়তো সেটা বদলে অন্য কোন সুপারপাওয়ার ইঞ্জিন লাগিয়ে নিয়েছে পিকআপে।'

'কিন্তু এখানে আসছে কেন?'

'অ্যান্টিডোট ডেলিভারি দেয়ার জন্যে নয়তো? কিন্তু তা কি করে হয়? তার তো ফোন করার কথা পানশকে।'

পেছনের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর, 'এখানে ফেরত আসছে কেন?' কাঠের গাদা, পুরানো গাড়ি, বাড়িঘর তৈরির জিনিসপত্রের স্তূপ, নানা রকম বাতিল জিনিস সব একজায়গায় জমিয়ে রাখা

হয়েছে। অন্ধকারে ছোটখাট একটা টিলার মত লাগছে।

বেড়ার কাছে এসে স্থির হলো হেডলাইট।

'ঢুকবে কি করে?' কলিনের প্রশ্ন।

'এখনই দেখতে পাব। চলুন, সরে যাই।'

মার্বেল পাথরের বড় একটা চাঙড় পড়ে আছে একটা তেরপলের তলায়। তার কাছে সরে এল দু-জনে।

আস্তে করে বেড়ার একটা অংশ সরে যেতে দেখল ওরা। ওপরের কাঁটাতার সহ। পিকআপে আবার ওঠার আগে লোকটাকে পলকের জন্যে চোখে পড়ল কিশোরের।

'টেমার!' ফিসফিস করে বলল সে।

'গোপন গেটটা সে-ই বানিয়েছে মনে হচ্ছে! এদিকে কাজকর্ম তেমন নেই, তাই বড় একটা আসে না কেউ। সেই সুযোগটাই নিয়েছে সে। আমি বেরিয়ে যাওয়ার পরও অনেকদিন রাতে কাজ করার ছুতোয় থেকে গেছে সে। সেই সময়ই বানিয়েছে নিশ্চয়।'

'কাল এদিক দিয়েই ঢুকেছিল সে, বেরিয়েও গিয়েছিল, সে-জন্যেই তাকে দেখতে পায়নি কেউ,' আন্দাজ করল কিশোর। ওয়াকি-টকিতে ঘটনাটা দুই সহকারীকে জানাল সে।

'আসছি!' জবাব দিল রবিন।

'ওর ঘাড়ে কয়েকটা রদ্দা মারার আগে শান্ত হব না আমি!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মুসা।

'উল্টোপাল্টা কিছু কোরো না,' কিশোরকে হুঁশিয়ার করল রবিন।

'হ্যাঁ, আমরা না আসা পর্যন্ত চুপ থাকো,' মুসা বলল। 'ব্যাটার কাছে পিস্তল আছে।'

পিকআপটা ভেতরে এনে লম্বা একটা ছাউনির পেছনে রাখল টেমার। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে গোপন গেটটা লাগিয়ে দিল। খাপে খাপে মিলে গেল ওটা, ওখানে গেট আছে বোঝারই উপায় রইল না আর। ফিরে এসে গাড়ির সামনের সীট থেকে ছোট একটা কালো প্যাকেট বের করে নিল।

'টাকা!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

তেরপল দিয়ে পিকআপটা ঢেকে দিল টেমার।

দেখছে কিশোর। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চির কম হবে না লোকটা, ওজন দুশো পাউন্ড। গোলগাল মুখ, চোখে চাঁদের আলো পড়ে মৃদু চিকচিক করে উঠল।

'শরীর এত ভারী করে রেখেছে কেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'ও ওরকমই। খাওয়ার কোন বাছবিচার নেই, যা পায় খায়। প্রচুর চর্বিওয়ালা খাবার খেতেও কেয়ার করে না। ওদিকে কায়িক পরিশ্রম নেই, জীবনের বেশির ভাগ সময়ই বসে থেকেছে কম্পিউটারের সামনে। ফুলেছে সে-কারণেই। তবে এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই ওর। গর্ব করে বরং বলে, আসুক না দেখি আমার সঙ্গে লাগতে কেউ, বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব।'

'গায়ে জোর থাক আর না থাক, সঙ্গে একটা পিস্তল আছে ওর। গায়ের

জোরের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর জিনিস।'

তেরপলের কোণগুলো বেঁধে দিয়ে পিকআপটাকে ভাল করে ঢেকে দিতে লাগল টেমার।

'পালিয়ে না গিয়ে এখানে এসে ঢুকল কেন সে?' বুঝতে পারছে না কিশোর।

'যে জন্যেই ঢুকুক, ও যে এখানে এসেছে তাতেই খুশি আমি। ধরার একটা সুযোগ তো অন্তত দিয়েছে।'

একপায়ে ভর রাখতে রাখতে পা ব্যথা হয়ে গেছে কিশোরের, ভার বদল করতে গিয়ে কিসে যেন পা পড়ে শব্দ হয়ে গেল।

পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল টেমার। এক পা আগে বাড়ল নিচু হয়ে একটা পাথর কুড়িয়ে নিল।

মনে মনে নিজেকে একশো একটা লাথি লাগাল কিশোর। আস্তে করে ডেকে উঠল, 'মিয়াঁও!'

উত্তেজনা কমে গেল টেমারের; ফিক করে হেসে ফেলল। বেড়ালের ডাক ভালই নকল করেছে কিশোর। পাথরটা ছুঁড়ে মারল টেমার। অল্পের জন্যে কিশোরের গায়ে লাগল না। ব্যথা পেলে বেড়াল যে ভাবে রেগে গিয়ে ছুটে পালায় তেমন শব্দ করল।

আরেকবার হাসল টেমার। আবার ফিরে গেল তেরপল বাঁধার জন্যে।

বাঁধা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এদিক ওদিক তাকিয়ে শিওর হয়ে নিল কেউ দেখছে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে ঘুরে এগিয়ে গেল মূল বাড়িটার দিকে।

'কোথায় যায়?' কিশোরের প্রশ্ন। 'নিজের ডেস্কে?'

'বুঝতে পারছি না!'

'চলুন, দেখি?'

অদৃশ্য হয়ে গেছে টেমার। অফিস ঘরগুলোর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল দু-জনে। কান পেতে শুনতে লাগল কোন শব্দ আসে কিনা। একেবারে নীরব। কাঠের দেয়ালে বেশ দূরে দূরে লাগানো আলো, করিডরে আবছা অন্ধকার সৃষ্টি করেছে জায়গায় জায়গায়।

করিডরে পা রাখল কলিন। তার পেছনে ঢুকল কিশোর। দরজা বন্ধ করল। মৃদু ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল পাল্লা। নীরবতার মাঝে বড় বেশি কানে বাজল শব্দটা, চমকে দিল দু-জনকে।

'গেল কোথায়?' ফিসফিস করে বলল কিশোর। কোন অন্ধকার কোণে ঘাপটি মেরে আছে ওদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে?

'কি জানি!'

পা টিপে টিপে করিডর ধরে এগোল ওরা।

'ক্লাব ডেডে যায়নি তো?' কিশোর বলল, 'লুকানোর অনেক জায়গা আছে ওখানে।'

'ঠিক বলেছ।'

ক্লাব ডেডের দরজায় এসে কান পাতল দু-জনে।

'কই, কোন শব্দ তো নেই?' কলিন বলল।

নব ঘুরিয়ে দরজার পাল্লা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করল কিশোর।

ঘটল না কিছু।

আরেকটু ফাঁক করতে যেতেই ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল। মনে মনে গাল দিয়ে উঠল কিশোর। সবগুলো দরজার কব্জায় মরচে পড়ে আছে। শব্দ না করে খোলার আর উপায় নেই।

আস্তে করে ভেতরে ঢুকল দু-জনে। ম্লান আলো জ্বলছে বিশাল ঘরটায়। বিচিত্র ছায়া পড়েছে এখানে ওখানে। যান্ত্রিক গরিলা, মধ্যযুগীয় সৈনিকদের ধাতব দেহাবরণ, একটা অদ্ভুত স্পেসশিপের নকল খোল, আর একটা ভয়ানক চেহারার প্রাগৈতিহাসিক দানব টাইরানোসরাস রেক্স-এর মডেল এই আলোতে দৃষ্টি আকর্ষণ করল কিশোরের। ওগুলোর কোনটার আড়ালে লুকিয়ে নেই তো টেমার?

পেছনে নড়াচড়া হতেই চমকে গেল কিশোর। পলকে ঘুরে দাঁড়াল। জুডোর মার মারতে গিয়ে থেমে গেল হাত।

হেসে ফেলল কলিন। 'রোবটকে মেরে কি করবে?'

সোজা হয়ে দাঁড়াল কিশোর। ঘুরতে ঘুরতে কখন চলে এসেছে দরজার কাছের ধাতব রোবটটার কাছে টেরও পায়নি। ওটার একটা হাত তোলা। আগের বার যখন দেখেছিল, দুটো হাতই নামানো ছিল।

হঠাৎ যেন পাগল হয়ে গেল রোবটটা। বারবার হাত তুলে কিশোরের মাথায় আঁকশি দিয়ে বাড়ি মারার চেষ্টা করতে লাগল। চোখ থেকে বেরোচ্ছে তীব্র আলোক রশ্মি, ছবিতে যেটাকে লেজার বীম হিসেবে চালানো হয়। দেহের ভেতরে গুঞ্জন চলছে মোটরের, ভারী পায়ে থপথপ করে এগোচ্ছে, একবার এ হাত, একবার ও হাত তুলে কিশোরকে আঘাত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে কিশোর। পিছিয়ে যাচ্ছে।

রোবটের পেছনের কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচ টিপতে লাগল কলিন।

অবশেষে থেমে গেল ধাতব দানবটা।

'টাইমার সেট করে দেয়া হয়েছে!' কলিন বলল।

'কে দিল?' কপালের ঘাম মুছে বলল কিশোর। টেমারের কথাই সর্বপ্রথমে মনে এল তার। টাইমার সেট করতে হলে এখানে তাকে আসতে হয়েছে, গেল কোথায়? কাজ সেরে বেরোতে গেলে ওদের চোখে পড়তই। পড়েনি যেহেতু, বেরোয়নি। তারমানে লুকিয়ে আছে আশেপাশেই কোথাও। আর তা থাকলে এতক্ষণে দেখে ফেলেছে ওদের। এ সব লুকোচুরি খেলায় যে আগে দেখে তারই সুযোগ বেশি থাকে, তবু খোঁজা চালিয়ে গেল কিশোররা।

নরম কি যেন মাথা ছুঁয়ে গেল তার। আবার চমকে গেল কিশোর। মুখ তুলে তাকাল। বিচিত্র একটা পোশাক তারে ঝোলানো, ওটার নিচ দিয়ে এগোনোর সময় ওর মাথায় লেগেছে। পাশে একটা মই উঠে গেছে। ওপরে মোটা তার ঘরের এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালে বাঁধা। মূল তারটাতে

বাঁধা আরও অনেকগুলো তার। ইচ্ছে করলে ওগুলোতে ঝুলে দড়াবাজিকরের খেলা দেখানো সম্ভব।

কিছু না পেয়ে দরজার দিকে এগোল দু-জনে। টানটান হয়ে আছে স্নায়ু। আরেকটা চাপ পড়লেই যেন ছিঁড়ে যাবে। এখনও ভয় পাচ্ছে, অন্ধকার কোন কোণ থেকে ওদের ওপর এসে পড়বে টেমার।

বেরোনোর আগে কয়েকটা বাক্সের ওপর চোখ পড়ল কলিনের। একটার ওপর আরেকটা রাখা, উঁচু হয়ে আছে।

গিয়ে অন্যপাশে কি আছে দেখে এল সে।

'আছে?' টেমার ওখানে নেই বুঝেও প্রশ্ন করল কিশোর

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কলিন। 'এরপর কোথায় খুঁজব?'

খুট করে একটা শব্দ হলো পেছনে। চোখের পলকে ঘুরে গেল কিশোর। পরক্ষণেই বরফের মত জমে গেল যেন।

কলিনও তাকাল। স্থির হয়ে গেল সে-ও। টেমার ভেগাবলের খেপা চোখের দিকে তাকিয়ে আছে দু-জনে। ওর হাতে একটা বিরাট ওয়ালথার 9mm পিস্তল।

'কলিন,' ব্যঙ্গের সুরে বলল সে, 'সেই প্রবাদটা শোনোনি—বেড়াল মরে কৌতূহলে?'

সতেরো

নরটনের দেয়ালের বাইরে গাড়ি রাখল মুসা।

'ঢুকবে কি করে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সেদিন যে ভাবে ঢুকেছিলাম।'

ওইয়্যার-কাটারটা হাতে নিয়ে দেয়ালে চড়ল সে, আগের দিন দিনের বেলা যে ভাবে চড়েছিল। কাটা জায়গাটা মেরামত করে ফেলা হয়েছে। আবার কাটল ওখানটাতেই। লাফিয়ে নামল ভেতরে। রবিনও নামল

খুব সাবধানে এগোল দু-জনে। গার্ড আছে কিনা দেখল। কোথাও কাউকে চোখে পড়ল না।

পা টিপে টিপে গার্ডরুমের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে গার্ড

মুচকি হাসল সে। সরে এসে ফিসফিস করে সে কথা জানাল রবিনকে।

মূল বাড়িটার সদর দরজা খোলা। সেটা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। করিডর ধরে এগোল। এখানে ওখানে খোঁজাখুঁজি করল খানিকক্ষণ। কেউ নেই। নির্জন

ক্লাব ভেড়ে খোঁজার কথাটা রবিনও মনে করল।

সেদিকে এগোল ওরা

মাটির তলার একটা ঘরে বসে আছে কিশোর আর কলিন। ফোল্ডিং চেয়ারের সঙ্গে কষে বাঁধা হয়েছে ওদের। টেমারকে দেখছে।

গরম করার জন্যে মাইক্রোওয়েভে ঠাণ্ডা পিজা চাপাল টেমার, তারপর ছোট একটা টেবিলের কাছে রাখা চেয়ারে বসে তাকাল বন্দিদের দিকে। হাসল।

প্যাকেট খুলে টাকার বান্ডিল বের করে একটা তোড়া হাতে নিয়ে নাড়ল। আবার হাসল। 'টাকা একটা দারুণ জিনিস, তাই না?'

রাগে সাদা হয়ে গেছে কলিনের মুখ।

'তোমার হিংসে হচ্ছে, না?' তার দিকে তাকিয়ে বলল টেমার। 'হবেই, এত টাকা পেয়ে গেলাম আমি।...ঠিক আছে, টাকার কথা আপাতত থাক। কি করে তোমাদের খোঁজ পেলাম জানতে চাও? বলি। বাইরে বেড়ালের ডাকটা সন্দেহ জাগিয়েছিল। খুঁতখুঁত করছিল মনটা। তারপর দরজার ক্যাচকোচ। সাবধান হলাম। জেনে গেলাম বেড়ালটা আসলে বেড়াল ছিল না, মানুষ।'

'পার পাবে না তুমি, টেমার!' রেগে যাওয়া বেড়ালের মত গরগর করল কলিন।

রাগ দেখিয়ে লাভ নেই। টেমারের অলক্ষে হাতের বাঁধন খোলা যায় কিনা চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। বাতাসে ভাজা মাংস আর পাইনঅ্যাপল পিজার সুগন্ধ। পেটে মোচড় দিল ওর। সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে।

'আজ সন্ধ্যার পর পিজার প্যাকেট খুলেছিলেন আপনি, ওপরে কোন ঘরে,' বলল কিশোর। 'গন্ধ পেয়েছি।'

'গন্ধের এই এক দোষ,' মুখ বাঁকাল টেমার। 'বিশেষ করে খাবারের গন্ধ। গরম করলে কিংবা রান্না করতে গেলেই বেরোবে। কোনমতেই পুরোপুরি ঢাকা যায় না। সে-জন্যেই এখানে রান্নার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সহকর্মীদের খাবার চুরি করে আনতে হয় আমাকে।'

'তুমিই তাহলে শ্রমিকদের খাবার চুরি করো!' রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল কলিনের।

'চুরি না করলে খাব কি?' ওভেন থেকে খাবার তুলে ট্রে-তে নিয়ে আবার টেবিলে এসে বসল টেমার। 'এতই গাধা ওরা, বুঝতে পর্যন্ত পারেনি।'

'গাধা আমিও!' হাত খোলা থাকলে কপাল চাপড়াত কলিন। 'নইলে তুমি যখন অনেক অনেক টাকার গল্প করতে, কোন না কোন উপায়ে হাতানোর কথা বলতে, বিশ্বাস করতাম না কেন!'

'আসলেই গাধা,' পিজায় কামড় বসাল টেমার। 'কম্পিউটারের স্ক্রীন ছাড়া কিচ্ছু বোঝো না।'

'এই ঘরটার কথা জানলে কি করে?'

'হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে ফেলেছি একদিন। খোঁজাখুঁজি করা আমার স্বভাব, জানোই তো। চমৎকার কাজ দিয়েছে ঘরটা আমার। বহুদিন আগে

কোন মদখোর বানিয়েছিল এটা। আমি বের করে ফেলেছি কপালগুণে।'

'উনিশ শো বিশ সালে বানিয়েছিল আমার ধারণা,' কথা বলে টেমারকে অন্যমনস্ক করে রাখতে চাইল কিশোর। 'এইটিনথ অ্যামেন্ডমেন্টে মদ বানানো আর খাওয়া বেআইনী করে দেয়া হয়েছিল আমেরিকায়।'

কিশোরের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল টেমার মাথা ঝাঁকাল 'হ্যাঁ। অনেক পড়াশোনা তোমার। সুন্দর করে ঘরটা বানিয়েছিল লোকটা। বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে। টয়লেট আছে। একটা টিভি. একটা মাইক্রোওয়েভ আর একটা কম্পিউটার নিয়ে এসেছি আমি প্রচুর খাবার থাকলে এখানে বাস করাটা কোন ব্যাপার না। খুব মজায় কাটে।'

'তোমারও কেটেছে?' জানতে চাইল কলিন।

'কেটেছে!'

'ভাল বুদ্ধি করেছেন,' কিশোর বলল। 'এটা একমাত্র জায়গা, যেখানে আপনাকে খোঁজার কথা ভাববেই না পুলিশ। যাদের ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে, তাদের বুকের মধ্যেই বসে আছে ব্ল্যাকমেলার, কে ভাবতে পারবে?'

গর্বে ফুলে উঠল টেমারের থলথলে বুক। 'এখানেই থাকব আমি যতদিন খোঁজা বন্ধ না হবে, পরিস্থিতি শান্ত না হবে, বেরোব না।' বড় এক টুকরো মাংস মুখে পুরে চিবাতে লাগল সে 'তারপর সুযোগ বুঝে টাকা নিয়ে কেটে পড়ব। আর কোনদিন কাজ করা লাগবে না আমার। পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারব বাকি জীবনটা।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'পারবেন না, আমাদের ছেড়ে দিয়ে কোথাও পালাতে না পারলে। আমাকে আর কলিনকে না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত দেবেন না পানশ।'

রাগে জ্বলে উঠল টেমারের চোখ, ফোলা গালে রক্ত জমল। কিল মারল টেবিলে। ঝনঝন করে উঠল ট্রে-তে রাখা চামচ-পিরিচগুলো। 'সে-জন্যেই তো তোমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। পানশের অফিসের মনিটর জ্বালিয়ে ভয় দেখাতে চেয়েছি। পাওনি। রকেট ধসিয়ে আহত করতে চেয়েছি। বেঁচে গেছ। তখন ভাবলাম, ঝামেলা রেখে লাভ নেই, শেষই করে দিই। পালালে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারলে না, আমার হাতের মুঠোয় আসতেই হলো।'

'এ সব করে পার পাবেন না আপনি, টেমার। আমাদের উদ্ধার করতে লোক আসবেই।' মুসা আর রবিনের কথা ভাবল কিশোর।

পকেট থেকে আবার পিস্তলটা বের করল টেমার। টেবিলে রাখল নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্যে পাশে রয়েছে কিশোরের ওয়াকি-টকিটা। ওকে বাঁধার পর ওর পকেট থেকে বের করে নিয়েছিল।

কুৎসিত হাসি হাসল সে। 'তোমার বন্ধুরা উদ্ধার করতে আসবে ভাবছ? এলে ওরাও মরবে।' সিঁড়ির মাথায় লাগানো একটা লাল আলোর দিকে হাত তুলল সে। 'কেউ ঢোকার চেষ্টা করলেই জ্বলে-নিভে সঙ্কেত দিতে শুরু

করবে ওটা

সামনে ঝুঁকল টেমার। 'জ্যান্ত অবস্থায় কোনদিনই আর বেরোতে পারবে না এখান থেকে ' হেসে উঠল সে। 'লাশ বেরোবে তা-ও কোনদিন যদি খুঁজে পায় কেউ!'

বিশাল ঘরটায় অনেক করে খুঁজেও কিছুই পেল না মুসা আর রবিন নিরাশ হয়ে বেরিয়ে আসতে যাবে, এই সময় রবিনের চোখে পড়ল জিনিসটা নিচু হয়ে তুলে নিল

'কী?' জানতে চাইল মুসা।

'এই যে, মডেলটা! মিরা যেটা দিয়েছিল কিশোরকে আজ সকালেও পকেট থেকে বের করে দেখাচ্ছিল।'

'আমাদের জন্যেই তাহলে ফেলে গেছে, কোনভাবে! কিছু একটা হয়েছে ওর! এটা চিহ্ন, কোন সন্দেহ নেই আমার!'

মডেলটা যেখানে পেয়েছে, সেখানে ভাল করে খুঁজতে লাগল ওরা আবার। মেঝের কাছাকাছি দেয়ালের একটা জায়গার ওপর চোখ আটকে গেল। রঙ খানিকটা অন্য রকম। খুব সামান্য পরিবর্তন, কাছে থেকে ভাল করে না তাকালে চোখে পড়ে না।

আর কিছু না পেয়ে মডেলটা দিয়েই ঠুকে মেরে দেখল রবিন ফাঁপা শব্দ হলো

চোখে চোখে তাকাল দু-জনে।

এইবার খোলার চেষ্টা।

বিশেষ বেগ পেতে হলো না। একটা জায়গায় হাতের জোর চাপ লাগতেই সরে গেল বড় একটুকরো কাঠ বেরিয়ে পড়ল একটা ফোকর। ওপাশে সরু করিডর।

করিডর ধরে এগোল মুসা। পেছনে রবিন। কিছুদূর এগোতেই দেখল শেষ মাথায় সিঁড়ি নেমে গেছে।

আরেক পা বাড়িয়েই থমকে গেল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল টেমার। হাতে উদ্যত পিস্তল। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'কাউকে খুঁজতে এসেছ?'

এগিয়ে আসতে লাগল সে।

আঠারো

থমকে দাঁড়িয়েছে মুসা। ঠিক তার পেছনেই রয়েছে রবিন। টেমার কাছে এল। হঠাৎ পেছন থেকে মুসার পিঠে ধাক্কা মেরে বসল রবিন।

রবিন যে এভাবে ধাক্কা মারবে টেমার বুঝতে পারেনি। তার বিমূঢ় ভাবটা

কাটাতে একটু সময় লাগল। ওই মুহূর্তটারই সদ্ব্যবহার করল মুসা। পিস্তলের তোয়াক্কা না করে সোজা গিয়ে পড়ল টেমারের গায়ে। থাবা মারল পিস্তল ধরা হাতে।

বদ্ধ জায়গায় গুলি ফোটার বিকট শব্দ হলো। নিশানা সরে গিয়ে দেয়ালে লাগল বুলেট। বড় একটা ছিদ্র হয়ে গেল। কাঠের টুকরো ছিটকে এসে লাগল রবিনের মুখে।

'রবিন! মুসা! আমরা এখানে!' নিচ থেকে শোনা গেল কিশোরের চিৎকার।

টেমারের হাত ছাড়েনি মুসা। এই অবস্থায়ই আরেক হাতে আঘাত করার চেষ্টা করল। পাশে সরে গেল টেমার। মোচড় লাগল হাতে। পিস্তলটা খসে গেল আঙুল থেকে।

'ছাড়ব না আমি তোমাদের!' গর্জে উঠল সে। 'কোনমতেই ছাড়ব না!' পিস্তলটা তোলার জন্যে নিচু হলো।

লাথি মেরে ওটা দূরে সরিয়ে দিল মুসা।

পিস্তল আনতে দৌড় দিল টেমার।

এই সুযোগে পেছন ফিরে দৌড় দিল মুসা আর রবিন, ক্রাব ডেডের দিকে। ঘরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে রবিন বলল, 'আলাদা হয়ে যাব আমরা। দু-জন দু-দিকে। তুমি টেমারকে ব্যস্ত রাখো। আরেক দিক দিয়ে আমি গিয়ে কিশোরকে ছাড়িয়ে আনব।'

'ঠিক আছে!'

গোপন দরজাটা খোলা। বড় ধাতব রোবটটার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল রবিন। মুসা ছোটাছুটি শুরু করল কতগুলো মডেলের পাশে, যেন লুকানোর জায়গা খুঁজছে।

দরজায় এসে দাঁড়াল টেমার। গর্জে উঠল, 'লুকিয়েছ, না? আমি জানি, এ ঘরেই আছ তোমরা!' রাগে কাঁপছে সে। 'পালাতে আর পারবে না!'

সাড়া-শব্দ না পেয়ে দরজার দিকে এগোল টেমার। বাইরের করিডরে বেরোল দেখার জন্যে। এই সুযোগে রোবটের আড়াল থেকে বেরিয়ে একদৌড়ে গিয়ে ফোকরে ঢুকে পড়ল রবিন।

বিপদটা কত বড় আন্দাজ করতে পারছে মুসা। করিডরে বেশি খোঁজাখুঁজি করবে না টেমার। বুঝে ফেলবে ওখানে বেরোয়নি ওরা। ফিরে আসবে ক্রাব ডেডে। ঘরের মধ্যে খুঁজলে ওকে বের করতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না। কি করবে তখন? গুলি করবে? লোকটা পাগল। ওর মেজাজ-মর্জির ওপর নির্ভর করা যায় না। যা খুশি করে বসতে পারে।

ক্রাব ডেডে ফিরে এল টেমার। খিকখিক করে হেসে বলল, 'ভেবেছ আমাকে ফাঁকি দেবে? পারবে না। আমি জানি, তোমরা এখানেই আছ। ভাল চাও তো বেরোও। আমি খুঁজে বের করলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুলি

চালাব।'

ঝুঁকিটা নিল মুসা। হাত তুলে বেরিয়ে এল মডেলের আড়াল থেকে। আশা করল, সময়মত কিশোর আর কলিনকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে রবিন।

আবার হাসল টেমার। পিস্তল তুলে এক পা এক পা করে এগোল মুসার দিকে। 'তোমার দোস্ত কোথায়?'

জবাব দিল না মুসা

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে রবিনের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল টেমার, 'জলদি বেরোও! নইলে তোমার দোস্তকে গুলি করছি! এক থেকে তিন গুনব, এর মধ্যে না বেরোলে...এক...দুই...'

তিন গোণার আগেই গোলাপী, হলুদ আর নীল আলোর বর্শা ছোটাছুটি শুরু করল সারা ঘরে। অবাক হয়ে মুখ ঘোরাল টেমার। দেয়ালে বসানো বিশাল টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গেল মোটর রেস। প্রচণ্ড শব্দ করে ছুটছে একাধিক কার। মনে হচ্ছে পর্দা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে পড়বে ঘরের মধ্যে। মিউজিক বাজতে লাগল জোরে জোরে। মোটর গাড়ির হর্ন বাজছে, টায়ারের আর্তনাদ উঠছে, একটা ধাতব বাক্স ছিটকে উঠল শূন্যে, থপথপ করে চলতে শুরু করল বিচিত্র চেহারার এক রোবট...

এলাহি কাণ্ড শুরু হলো ক্লাব ডেডের মধ্যে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। দেখল শূন্যে উড়াল দিয়েছে এক বিচিত্র পোশাক, উড়ে আসছে টেমারের দিকে

পাথর হয়ে গেছে যেন টেমার, পা নড়াতে পারছে না। চোয়াল ঝুলে পড়েছে, চোখ বড় বড়।

তারে ভর করে উড়ে আসছে পোশাকটা। ওটার নিচ থেকে ঝুলে আছে জুতোপরা একজোড়া পা। কিশোরের জুতো চিনতে ভুল হলো না মুসার।

টেমারের দিকে ছুটে গেল রবিন, 'ধরো ব্যাটাকে, ধরো!'

গুলি করার কথাও যেন ভুলে গেছে টেমার। তার ওপর দিয়ে ছুটে গেল কিশোর। ওপর থেকেই বুকে লাথি চালাল। ঘর কাঁপিয়ে ধুড়ুস করে চিত হয়ে পড়ল টেমার। হাত থেকে উড়ে চলে গেল পিস্তল। থলথলে দেহ নিয়ে উঠতে পারল না সে। তার আগেই বুকে চেপে বসল রবিন।

পিস্তলটা তুলে নিল মুসা।

আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করতে লাগল টেমার, 'দোহাই তোমার, গুলি কোরো না! মেরো না আমাকে! দোহাই তোমার...'

পাগলই হয়ে গেছে যেন লোকটা।

মাথা নাড়ল কলিন। মায়াই হলো টেমারের জন্যে। বলল, 'না, গুলি করব না। পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছি আমি।'

'দাঁড়ান!' কঠোর কণ্ঠে বলল কিশোর। 'গুলি তো করবই! আমাদের বহুত জ্বালান জ্বালিয়েছে ও। একটা কাজ করলে অবশ্য ছেড়ে দিতে পারি।

অ্যান্টিডোটটা কোথায় আছে বলুক।' টেমারের দিকে তাকাল, 'কোথায়?'
কঁকিয়ে উঠল টেমার, 'আমার টাকা!'
'টাকা আর পাবেন না!' ধমক দিল রবিন, 'না বললে প্রাণটাও যাবে আমরা আপনাকে গুলি করবই!'
কিশোরের মিথ্যে হুমকিটাকে জোরাল করার জন্যে বলল সে।
'না না, গুলি কোরো না! মরতে ভীষণ ভয় লাগে আমার! ঠিক আছে, দেব অ্যান্টিডোট! কম্পিউটারের কাছে নিয়ে চলো আমাকে আমার কম্পিউটার...তবে কথা দিতে হবে, ওটা পাওয়ার পর ছেড়ে দেবে...'
'গুলি যে করব না এ-ই বেশি, ছাড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না,' টেমারের নাকের কাছে এনে পিস্তল ধরল মুসা। 'বলবেন কিনা বলুন, নইলে...'
তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল টেমার, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো...'
নিচতলায় নিয়ে আসা হলো টেমারকে। টেবিলে রাখা টাকার বাণ্ডিলের দিকে তাকিয়েই আবার মাথা গরম হয়ে গেল তার উল্টোপাল্টা কথা বলতে লাগল। অহেতুক কী-বোর্ডের চাবি টিপতে লাগল গুলি করার হুমকিতেও আর কাজ হচ্ছে না। বুঝে ফেলেছে, গুলি করতে পারবে না ওকে গোয়েন্দারা।
দাঁত বের করে হাসল টেমার। 'অ্যান্টিডোট দিতে পারি, এক শর্তে
'কোন শর্ত নেই!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা
সামলে নিয়েছে টেমার বলল, 'ধমক দিয়ে লাভ নেই হয় টাকাসহ আমাকে চলে যেতে দেবে, নয়ত অ্যান্টিডোটের আশা ছাড়তে হবে...'
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। বলে উঠল, 'দাঁড়াও, মনে হয় পেয়েছি!'
ঝট করে তার দিকে ঘুরে গেল চারজোড়া চোখ।
'কোথায়?' জানতে চাইল রবিন
'গেম ডিস্ক! ওর মধ্যেই আছে!'
'মানে?'
'আমাদের কম্পিউটার ক্লাবকে গেম ডিস্কটা দিয়েছিল টেমার, মনে আছে?'
মাথা ঝাঁকাল রবিন আর মুসা।
'কম্পিউটারের পাগল টেমার,' বলতে লাগল কিশোর 'সবাই জানে সেটা। অ্যান্টিডোট প্রথমেই খুঁজবে তার কম্পিউটারে। কাজেই হার্ডডিস্কে রাখবে না সে। রাখবে ফ্লপিতে। গেম ডিস্ক হলো সবচেয়ে উত্তম জায়গা। খেলার ডিস্কে এমন একটা সিরিয়াস জিনিস আছে, সহজে ভাববে না কেউ।'
'পাগল!' সহজ কণ্ঠে বলল টেমার। কথা শুনে মনে হচ্ছে না খেপামিটা আর আছে। তবে তার চোখ অস্থির হয়ে ঘুরছে ঘরের মধ্যে। আড়চোখে মুসার হাতের পিস্তলের দিকেও তাকাল একবার।

'তারমানে গেম ডিস্কেই আছে,' আরও নিশ্চিত হলো কিশোর। 'আপনার আচরণই ফাঁস করে দিল সেটা। আরও একটা চালাকি আপনি করতে চেয়েছিলেন। গেম ডিস্কের গেমগুলোর সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিডোটটাও অন্যখানে স্টোর করতে চেয়েছিলেন। যাতে আপনারটা কোনভাবে নষ্ট হয়ে গেলেও আরও অসংখ্য জায়গায় থেকে যায়। ওটা কি জিনিস, দেখলেও কেউ বুঝতে পারবে না। ভাববে আবোল-তাবোল কিছু। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য, ভুল করে গেম ডিস্কের যে কপিটা দিয়েছেন, সেটাতেও ভাইরাস ঢুকে পড়েছিল, আপনি বুঝতে পারেননি। আমাদের সবার কম্পিউটারে চলে এসেছিল সেই ভাইরাস। না এলে কোনদিনই জানতে পারতাম না এ রকম একটা ব্ল্যাকমেলিঙের ঘটনা ঘটেছে। আপনিও এতগুলো টাকা নিয়ে সহজে পার পেয়ে যেতেন। সাংঘাতিক একটা ভুল করে ফেলেছিলেন আপনি নিজের অজান্তে। মারাত্মক ভুল আসল গেম ডিস্কটা কোথায় রেখেছেন, বলবেন এবার?'

হা হা করে হাসল টেমার। 'ওই একটা ডিস্কই ছিল। কপি-টপি করিনি। ক্লাবে যেটা দিয়েছিলাম, সেটাই আসল। ওটাতে যখন ভাইরাস ধরেছে, অ্যান্টিডোট আর নেই কোথাও। কেবল একটা ডিস্ক ছাড়া।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত টেমারের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। মুচকি হাসল। 'জানি কোন ডিস্কের কথা বলছেন। আপনার মাথা কিন্তু বিশ্বাস করলাম না আপনার কথা অত ক্ষমতাই নেই আপনার। অ্যান্টিডোটের মত একটা জটিল জিনিস ধরে রাখবেন মগজে, হতেই পারে না আপনি কম্পিউটার নন। অহেতুক গুল মেরে লাভ নেই।'

রেগে গেল টেমার, 'আমি বলছি আছে!'

'না, নেই,' মাথা নাড়ল কিশোর।

'আছে!'

'নেই!'

'প্রমাণ চাও?'

'চাইলে কি হবে? প্রমাণ তো করতে পারবেন না

'অবশ্যই পারব।'

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পকেট থেকে রবিনকে কাগজ কলম বের করতে বলল কিশোর। বলল, 'লিখে নাও, পাগলের প্রলাপ। জানি, কোন লাভ হবে না।'

নোটবুক আর পেন্সিল বের করল রবিন। গড়গড় করে কতগুলো নম্বর আর কোড বলে গেল টেমার। দ্রুত সেগুলো লিখে নিল রবিন লেখা শেষ করে টেমারকে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছে সব?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকাল টেমার।

নোটবুকটা রবিনের হাত থেকে নিয়ে গিয়ে কম্পিউটারে বসল কিশোর। কয়েক মিনিট তার আঙুলগুলো উড়ে বেড়াল কী-বোর্ডে। যত্ন করে নোটবুকটা পকেটে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'সত্যি আপনি জিনিয়াস, টেমার। বুদ্ধিটা

সৎকাজে লাগানো উচিত ছিল। মানুষের অনেক উপকার করতে পারতেন। আরেকটা মারাত্মক ভুল করলেন এইমাত্র। আমার অভিনয় ধরতে পারেননি, রেগে গিয়ে বলে দিলেন অ্যান্টিডোটটা। পাগল বলেই করলেন এ কাজ।'

কি বোকামিটা করেছে বুঝতে পেরে রাগে অন্ধ হয়ে গেল টেমার কিশোরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি টিপে ধরার জন্যে পাগল হয়ে গেল

'বেঁধে ফেলো চেয়ারের সঙ্গে,' সহকারীদের নির্দেশ দিল কিশোর 'পুলিশকেও খবর দিতে হবে। তবে সবার আগে মিস্টার পানশকে ফোন করা দরকার তিনি এসে যা করার করবেন '

খেলার নেশা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

তুমুল চিৎকারে কান ঝালাপালা। প্রচণ্ড উত্তেজিত দর্শক প্রেরণা জোগাচ্ছে খেলোয়াড়দের।

দম বন্ধ করে জিমনেশিয়ামের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে মুসা আমান। এমনিতেই বাস্কেটবল খেলায় দারুণ উত্তেজনা, তার ওপর এটা একটা বিশেষ ম্যাচ। খেলা হচ্ছে সান্তা মনিকা বনাম রকি বীচ। স্কোর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সময়ও প্রায় শেষ। সে জানে, তার ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছেন রকি বীচ হাই স্কুল বাস্কেট বলের কোচ অ্যামেন্ডসন।

সময় ঘোষণা করা হলো।

কোচকে ঘিরে দাঁড়াল বেছে নেয়া পাঁচজন খেলোয়াড়। সবার ওপর চোখ বুলিয়ে এনে মুসার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন তিনি। বললেন, 'বিশ সেকেন্ড সময় আছে আর। কি করতে চাও?'

'খেলব!' একই সঙ্গে বলে উঠল পাঁচজন। হাল ছাড়তে রাজি নয় কেউ। একটাই ইচ্ছে, জিততে হবে।

কোর্টে ফিরে এল ওরা।

মুখ ঘুরিয়ে গ্যালারির দিকে তাকাল মুসা। রকি বীচের সমর্থকরা হুল্লোড় করে উঠল: হাত ছুঁড়ে, তালি দিয়ে উৎসাহ জোগাল তাকে। অনেকেই তার পরিচিত। চোখ পড়ল বিশেষভাবে পরিচিত তিনটি মুখের ওপর—রবিন, কিশোর আর জিনা। সে তাকাতেই হাত নাড়ল ওরা।

'বিশ সেকেন্ড বাকি আছে আর,' ঘোষণা করল ঘোষক। 'দুই দলেরই সমান সমান পয়েন্ট, সত্তর-সত্তর। এবার রকি বীচের বল।'

রকি বীচ টীমে মুসাকে গার্ড করছে বিড ওয়াকার। বলটা সে ছুঁড়ে দিল দলের ফরোয়ার্ড টার্নি রোজারকে। হাতছাড়া কোরো না, ধরে থাকো!—মনে মনে বলল মুসা।

পনেরো সেকেন্ড বাকি।

হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল রকি বীচ সমর্থকরা। সান্তা মনিকার বাঘা খেলোয়াড় বাজ নিউম্যান কেড়ে নিয়েছে বল।

সোজা বাস্কেটের দিকে বল নিয়ে ছুটল সে।

বাকি আছে দশ সেকেন্ড।

বাজ বলটা ছুঁড়ে দেয়ার আগের মুহূর্তে লাফিয়ে শূন্যে উঠে পড়ল মুসা।

যেন উড়ে এল। নিখুঁত সময়জ্ঞান। বাজের হাত থেকে বলটা ছুটে গেছে। বাস্কেটে ঢুকতে যাচ্ছে। থাবা দিয়ে সরিয়ে দিল মুসা

মেঝেতে ড্রপ খেল বল, তারপর চলে এল মুসার হাতে।

চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলছে দর্শকরা। বল হাতে কোর্টের অন্য প্রান্তে ছুটেছে মুসা

পাঁচ সেকেন্ড সময় আছে আর।

মরিয়া হয়ে তার পেছনে ছুটে এল সান্তা মনিকার খেলোয়াড়রা কিন্তু ধরতে পারল না। আরেকবার উড়ল মুসা। উঠে এল একেবারে বাস্কেটের কাছে। আলতো করে বলটা ছেড়ে দিল বাস্কেটে রিঙ গলে জালের ভেতর দিয়ে নিচে পড়ল বল।

বেজে উঠল বাজার। সময় শেষ।

চিৎকার করে ঘোষণা করল ঘোষক, 'দুই পয়েন্ট বেশি পেয়ে জিতে গেল রকি বীচ!'

ব্যান্ড বাজাতে আরম্ভ করল। কোর্টে ঢুকে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল রকি বীচের সমর্থক কয়েকটা ছেলে। তীক্ষ্ণ শিস দিচ্ছে। লকার রুমের দিকে রওনা হলো খেলোয়াড়রা।

মুসার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বিড বলল, 'দেখালে বটে!'

মৃদু হেসে একটা তোয়ালে টেনে ঘাড়ে ফেলল মুসা। ঘাম ঝরছে টপ টপ করে। পাশ কাটিয়ে চলে গেল কয়েকজন খেলোয়াড়। ঠাণ্ডা পানির শাওয়ারের নিচে পিঠ পেতে দিতে ব্যস্ত। ভীষণ ক্লান্ত সে। ধীরে ধীরে হাঁটছে

পেছন থেকে ডাক শোনা গেল, 'মুসা।'

ফিরে তাকাল সে। অপরিচিত একজন মানুষ। লকার রুমের বাইরে হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়েস চল্লিশের কোঠায়, পেশীবহুল শরীর। গায়ে গোলাপী উইন্ডব্রেকার। বুকের বাঁ পাশে সাদার মধ্যে পুরানো ফ্যাশনে লেখা একটা S গোলাপী স্পোর্টস ক্যাপের নিচ থেকে নীল চোখ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'মুসা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কথার টানে আন্দাজ করল মুসা, ক্যালিফোর্নিয়ার লোক নন তিনি। হয়তো বোস্টন থেকে এসেছেন। তাঁর দিকে এগোল সে।

'লভেল ম্যাডিরা,' নিজের পরিচয় দিয়ে মুসার হাত ধরে ঝাঁকালেন তিনি। 'শোরমন্ট কলেজের বাস্কেটবল কোচ। নাম শুনেছ কলেজটার?'

'শুনেছি। রকি বীচ থেকে গাড়িতে পনেরো মিনিটের পথ। গত বছর ইউ সি এল এ-কে হারিয়েছিল আপনাদের টীম।'

'হ্যাঁ। তোমার কথা শুনেছি অনেক, তাই আজ দেখতে এলাম। সত্যি ভাল খেল। একটা প্রস্তাব আছে। শোরমন্ট কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। বেতন-টেতন সব ফ্রী করে দেব। আমাদের টীমে খেলবে। তোমাকে এমন ট্রেনিং দিয়ে দেব, বছর চারেক বাদেই এন বি এ-তে খেলতে পারবে।'

তোয়ালে দিয়ে জোরে জোরে ডলে মাথার ঘাম মুছল মুসা। কানে ঠিক শুনছে তো? চেনা নেই জানা নেই, কোথা থেকে এসে এ রকম একটা প্রস্তাব দিয়ে বসেছেন! কি বলবে বুঝতে পারছে না।

'ভাবো,' একটা কার্ড বের করে দিলেন ম্যাডিরা। 'ভেবে দেখো। এখন তুমি ভাল খেলছ বলে প্রস্তাবটা দিলাম, পরে আর এই সুযোগ না-ও পেতে পারো। শীঘ্রি আবার দেখা করব।'

চলে গেলেন কোচ।

'আত্মবিশ্বাস খুব বেশি,' মুসার পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ। 'মনে হচ্ছে যখন যা চেয়েছেন, সব সময় তা পেয়ে এসেছেন।'

ফিরে তাকাল মুসা। কিশোর কথা বলেছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে রবিন।

ওদের দেখে এগিয়ে এল জিনা।

'ভদ্রলোক কে?' জানতে চাইল কিশোর।

'নাম লভেল ম্যাডিরা। শোরমন্ট কলেজের বাস্কেটবল কোচ।'

'নিশ্চয় বলতে এসেছেন কি সাংঘাতিক খেলা খেলেছ আজ রাতে?' রবিন বলল। হাত তুলে বাতাসে ঘুসি মারল সে, ভঙ্গি দেখে মনে হলো বাস্কেটে বল ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। 'বাজ নিউম্যানকে যে ভাবে কুপোকাত করলে!'

খেলার শেষ দৃশ্যটার কথা কল্পনা করে হাসল মুসা। 'তা ভালই বলতে পারো। বোধহয় এটা দেখেই প্রস্তাব দিতে এসেছিলেন আমাকে লভেল ম্যাডিরা শোরমন্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে। বেতন-টেতন সব ফ্রী।'

'তাই নাকি!'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'শুধু বাস্কেটবল খেলার জন্যে সব ফ্রী?'

'তাই তো বললেন।'

'তারমানে তুমি আসলেই ভাল খেলোয়াড়। ভাবছি, একটা স্কুল যখন এই অফার দিল, অন্য স্কুল থেকেও দিতে পারে। কবে দেবে সেটা? মুসা, হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ো না।'

'অন্য স্কুল?' প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা। 'নাহ্, এখন আর কিছু ভাবতে পারছি না। খুব টায়ার্ড লাগছে। গোসলটা সেরে আসি।'

'বাপরে, কি দাম! হিরো হয়ে যাবে তো!' হেসে বলল জিনা।

'আমি যাচ্ছি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কাজ আছে। রবিন, তুমি?'

'হ্যাঁ, যাব।'

লকার রুমে শাওয়ারের বরফ-শীতল পানির নিচে দাঁড়িয়ে পুরো খেলার দৃশ্যগুলো কল্পনা করতে লাগল সে। কিশোরের কথাও ভাবল—অন্য স্কুল থেকেও দিতে পারে। কয়টা থেকে দেবে? পাঁচটা? দশটা? তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে! বাস্কেটবলে সুপারস্টার বনে যাবে! ভাবতেও রোমাঞ্চ

হলো তার।
গোসল সেরে কাপড় বদলে বেরোল। কিশোর আর রবিন চলে গেছে। জিনা কথা বলছে কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে। তাকে দেখে হাত তুলল
ডেকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'বাড়ি যাবে নাকি?'
এগিয়ে এল জিনা।
পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে আছে মুসার নতুন কেনা পুরানো গাড়িটা, বিশ বছরের পুরানো একটা ক্যাডিলাক ফ্লিটউড। বেশ কিছু মেরামতি দরকার। কিন্তু অত টাকা নেই এখন তার কাছে।
জিনার জন্যে দরজা খুলে দিল সে। সৌজন্য কিংবা ভদ্রতা দেখানোর জন্যে নয়, দরজাটা এত শক্ত হয়ে লাগে, খুলতেই পারবে না জিনা।
ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা। একটা খাম দিল তার হাতে জিনা।
ভুরু কুঁচকাল মুসা, 'কী?'
'কি করে বলব? সীটের ওপর পেলাম।'
মাথার ওপরের আলোটা জ্বেলে দিল মুসা। খামটা দেখল সে বেরোনোর সময় ওটা ওখানে ছিল না।
বড় হাতের অক্ষরে টাইপ করে লেখা রয়েছে মুসার নাম। মুখ ছিঁড়ে উপুড় করে ভেতরে কি আছে ফেলল সে।
'খাইছে!'
জিনাও হাঁ হয়ে গেল।
খামের ভেতর থেকে ঝরে পড়ল অনেকগুলো একশো ডলারের নোট।
কুড়িয়ে তুলতে লাগল জিনা। মুসার কোলের ওপর পড়েছে একটা চিঠি। সেটা তুলে পড়ল সে:

শোরমন্টের তোমাকে প্রয়োজন। শোরমন্টের হয়ে বাস্কেটবল খেলো, এমন পুরস্কার পাবে যা কল্পনা করতে পারবে না। যে টাকাটা দিলাম, এটা কেবল শুরু।

'মুসা,' জিনার গলা কাঁপছে, 'তিন হাজার ডলার!'

দুই

নীরবে নোটগুলোর দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওরা।
'এর মানে কি?' অবশেষে মুখ খুলল জিনা।
জবাবে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা।
কিছুদূর এগোনোর পর জিনা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাও?'
'কিশোর আর রবিনকে জানাতে।'

বিরাট গাড়িটা দুলতে দুলতে ইয়ার্ডে ঢুকল। খক খক করে কয়েকটা কাশি দিয়ে স্তব্ধ হলো ইঞ্জিন।

ওঅর্কশপে আরাম করে বসে বিলবোর্ড ম্যাগাজিন পড়ছে রবিন ক্যাসেট প্লেয়ারে মিউজিক বাজছে। ওঅর্কবেঞ্চে বসে কাজে ব্যস্ত কিশোর।

সাড়া পেয়ে মুখ তুলল রবিন। মুসাকে দেখে বলল, 'একটা নতুন ব্যান্ড। কেমন লাগছে শুনতে?' স্পীকারের দিকে মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিত করল সে।

মুসা বা জিনা জবাব দেয়ার আগেই প্লেয়ারটা অফ করে দিল কিশোর। 'গান শুনতে আসেনি ওরা কিছু ঘটেছে।'

'কি করে বুঝলে?' জিনার প্রশ্ন

'তোমাদের মুখ দেখে'

খামটা বের করে ওঅর্কবেঞ্চের ওপর ছুঁড়ে দিল মুসা, 'দেখো।'

অবাক হওয়ার পালা এবার কিশোর আর রবিনের। শিস দিয়ে উঠল রবিন, কিশোরের হাত থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার খসে পড়ল। চিঠির কোণ ধরে সাবধানে তুলে নিল কিশোর

'খোলার আগে আঙুলের ছাপ আছে কিনা দেখার কথা ভেবেছ?'

হেসে উঠল জিনা, 'তোমার মত কি আর শার্লক হোমস নাকি আমরা।'

কিশোর হাসল না একটা নোট আলোর দিকে তুলে পরীক্ষা করল আসল কিনা।

'তিন হাজার ডলার দিয়ে কি করব বলো তো?' মুসা বলল, 'আমার গাড়িটা মেরামত করেও যা থাকবে···'

বাধা দিয়ে জিনা বলল, 'মুসা, এটা ঘুষের টাকা। এটা নেয়া তোমার উচিত হবে না।'

'ভাবতে অসুবিধে কি?'

'খারাপ ভাবনা ভাবাও খারাপ।'

রবিন বলল, 'স্কুল-কলেজে স্পোর্টস রিক্রুটমেন্ট স্ক্যান্ডালের কথা শুনেছ নিশ্চয়। কিন্তু সেটা যে এখানেও ঘটবে, এই রকি বীচে, ভাবাই যায় না।'

'কিশোর,' মুসা বলল, 'টাকাগুলো কে পাঠিয়েছে বলো তো? শোরমন্টের কলেজের কোচ লভেল ম্যাডিরা? আমার সঙ্গে কথা বলে যাওয়ার বিশ মিনিট পরেই গাড়ির সীটে পড়ে থাকল এতগুলো টাকা! আলাউদ্দিনের দৈত্য এসে রেখে গেল যেন!'

নোটটা নামিয়ে রাখল কিশোর। 'টাকা দেবেন বলেছিলেন নাকি ম্যাডিরা?'

'না।'

'তাহলে ধরে নিতে পারি তাঁর কাছ থেকে আসেনি এই ঘুষ। তিনি কেবল বেতন আর কলেজের অন্যান্য খরচ ফ্রী করে দেয়ার কথা বলেছেন। সেটা বেআইনী কিছু নয়।'

'কি করব আমরা এখন?' জানতে চাইল রবিন। 'এন সি এ এ-কে ফোন

করব?'

'না। সোমবারে শোরমন্ট কলেজে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করব। তদন্ত করার প্রস্তাব দেব। টাকা দিয়ে খেলোয়াড়দের খেলতে নিয়ে যাওয়াটা বেআইনী নয়, কিন্তু এভাবে টাকা রেখে যাওয়াটা যেন কেমন। প্রেসিডেন্ট নিশ্চয় আমাদের খোঁজ-খবর করার অনুমতি দেবেন।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'তারমানে আরেকটা নতুন কেস পেয়ে গেলাম আমরা।'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল। 'তবে একটা কথা...'

'আমাদের সঙ্গে এবারেও থাকতে পারবে না এই তো?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। দুই হপ্তা স্কুল ছুটি। লজ চাইবেন তাঁর জন্যে কিছু কাজ করে দিই। সুতরাং...'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বলল, 'ঠিক আছে, কি আর করা। কাজটা আগে।'

সোমবার সকালে কিশোরকে রকি বীচ থেকে দুই মাইল দূরে শোরমন্ট কলেজে নিয়ে গেল মুসা। গাছপালায় ঘেরা সুন্দর ক্যাম্পাস। রকি বীচ বাস্কেটবল টীমের লাল-সাদা জ্যাকেট পরে এসেছে সে। কিশোর পরেছে একটা প্লেটো টি-শার্ট, বুকের কাছে বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর ছবি।

লাল ইটের তৈরি তিনতলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের সামনে এনে গাড়ি রাখল মুসা। এলিভেটরে করে ওপরে উঠে এল দু-জনে।

রিসেপশনে বসে আছে ধূসর-চুল এক মহিলা। নাকের চশমাটা ঠেলে কপালে তুলে দিয়ে তাকাল, 'কি সাহায্য করতে পারি?'

'কলেজের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' কিশোর বলল। 'খুব জরুরী।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মহিলা। ইন্টারকমে কথা বলল। তারপর দুই গোয়েন্দাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল একটা বড় ঘরে, ঘরের দুটো দেয়াল কাঁচের তৈরি। চকচকে পালিশ করা ওয়ালনাট কাঠের এগজিকিউটিভ ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। বয়েস মাত্র তিরিশের কোঠায়। একটা কলেজের প্রেসিডেন্টের জন্যে বয়সটা খুবই অল্প। শার্ট-টাই আছে, তবে জ্যাকেটের বদলে একটা বড় কারডিগান সোয়েটার গায়ে দিয়েছেন।

হাসিমুখে হাত মেলানোর জন্যে এগিয়ে এলেন তিনি, 'আমি ডেভন কলিন।'

হাত মেলাল কিশোর। পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিল।

'তিন গোয়েন্দা?' বললেন তিনি, 'কিন্তু দেখছি তো দু-জন। আরেকজন কোথায়?'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা। ও মুসা আমান। আমাদের তিন নম্বর সদস্য রবিন মিলফোর্ড একটা কাজে গেছে।'

'কি জন্যে এসেছ?'

টাকা আর চিঠিটা দেখিয়ে প্রেসিডেন্টকে অবাক করে দিল কিশোর।

মুসা বলল, 'কোচ লভেল ম্যাডিরা আমার সঙ্গে কথা বলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর গাড়ির সীটে এগুলো পেয়েছি।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বড় একটা চামড়ার কাউচে এলিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন। বললেন, 'কি কাণ্ড! এখানে বসে বসে ক্যাম্পাস দেখি আর ভাবি এই কলেজের সবই আমার জানা। কিন্তু এখন দেখছি...' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'শোনো, তোমাদের কথা থেকে এটাই বোঝা যায় আমার কোচ তোমাদের ঘুষ দিয়ে এসেছে। সে-ই দিয়েছে প্রমাণ করতে পারবে?'

'না, পারব না,' কিশোর বলল। 'ম্যাডিরা দিয়েছেন এ কথা বলিওনি।'

'তবে ম্যাডিরা হতে পারে,' আবার বসে পড়লেন তিনি।

মন্তব্যটা কিশোরকেও চমকে দিল।

'সত্যি বলতে কি,' প্রেসিডেন্ট বললেন, 'যে কথাটা বলব সেটা যেন বাইরে কোথাও ফাঁস না হয়—ম্যাডিরার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ কানে এসেছে আমার। ভাল খেলোয়াড়কে দলে টানার জন্যে নাকি বেআইনী কাজ করেছে সে এর আগে যে স্কুলটাতে ছিল সেখানে। সেটা অবশ্য প্রমাণিত হয়নি। তবে স্কুলটার সুনাম শেষ। তারপরেও তাকে আমার এখানে নিয়েছি, সে নির্দোষ এটা বিশ্বাস করি বলে। কোচ হিসেবে খুব ভাল সে।'

আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, 'ওই যে যাচ্ছে।'

গোলাপী জ্যাকেট আর গোলাপী স্পোর্টস ক্যাপ পরা মানুষটাকে হেঁটে যেতে দেখল কিশোর আর মুসা। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

'খেলার পেছনে খরচ করার মত টাকা আছে ওর,' পেছন থেকে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'অনেক বড় বাজেট করেছে। কাকে কাকে টাকা দেয় কিছু জানি না, বলেও না। এই টাকা দেয়ার ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয় না।'

হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ম্যাডিরা।

'তদন্ত করতে চাও, না?' প্রেসিডেন্ট বললেন, 'কারও চোখে না পড়ে কি ভাবে করবে?'

জবাব দিতে একটা মুহূর্ত দেরি করল না কিশোর, 'ভেতরে-বাইরে দু-দিক থেকেই কাজ চালাব। বাইরে বলতে ঘুষের টাকা দিয়ে মুসা একটা অ্যাকাউন্ট খুলবে। তারপর এমন ভান করবে যেন আবার কখন যোগাযোগ করা হয় সে-ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে।'

'আর ভেতরেরটা?'

'সহজ,' হাসল কিশোর। চোখের তারায় উত্তেজনা। 'আমি ঢুকে পড়ব শোরমন্টে, বাস্কেটবল ক্লাসে যোগ দেব। কাদের কাদের টাকা দেয়া হয়

জানার চেষ্টা করব। কাজ হবে, স্যার, বুঝলেন; কারণ আপনাদের উইন্টার টার্ম সবে আরম্ভ হয়েছে, আর আমাদের দুই হপ্তার ছুটি। সুতরাং স্কুল কামাই হবে না।'

মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট, 'খুব কঠিন কাজ। পড়ো অন্য স্কুলে। এখানে ক্লাস করতে হলে অনেক বেশি জানা থাকতে হবে তোমার।'

জবাবে কেবল একটা ভুরু উঁচু করল কিশোর।

'কিশোরকে আপনি চেনেন না, স্যার,' হেসে বলল মুসা, 'কোন কাজই ওর জন্যে কঠিন নয়, বিশেষ করে পড়ালেখা। চোখের পলকে শিখে ফেলবে, দেখবেন, অবশ্য যদি ওর পছন্দ হয় কাজটা।'

প্রেসিডেন্টও হাসলেন। গিয়ে বসলেন ডেস্কের ওপাশের সুইভেল চেয়ারে। বললেন, 'ঠিক আছে, বাস্কেটবল প্লেয়ারদের শিডিউল দিয়ে দেব তোমাদের। দেখো কি করতে পারো।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

ইন্টারকমের রিসিভার তুলে নিলেন প্রেসিডেন্ট। নিচু গলায় অ্যাডমিশন অফিসের কাউকে বললেন, 'একটা ছেলেকে পাঠাচ্ছি, ওর নাম কিশোর পাশা। কি কি করতে হবে বলছি, শোনো...'

কয়েক মিনিটেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

কিশোর আর মুসাকে বললেন তিনি, 'সাবধান, কেউ যেন ব্যাপারটা জানতে না পারে। ম্যাডিরা দোষী হলে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে। প্রমাণ ছাড়া কিছু করতে পারব না।'

'তা তো বটেই,' কিশোর বলল।

এই সময় ইন্টারকম বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিলেন তিনি রিসেপশনিস্টের কথা শুনে বললেন, 'ওকে বলো, আসছি। এক মিনিট।'

রিসিভার রেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে চিবুকে হাত বোলালেন। 'ব্র্যানসন বার এসেছে, এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নতুন একটা জিমনেশিয়াম বানানোর জন্যে টাকা দিতে চায়। তোমরা কে, জানানো যাবে না তাকে। সন্দেহ করবে। যদি কোনভাবে ভেবে বসে স্পোর্টস স্ক্যান্ডাল হতে যাচ্ছে, একটা পয়সাও আর খরচ করবে না তখন।'

'জানবে না,' কথা দিল মুসা।

'আশা করি পরিস্থিতি বুঝতে পারছ। খুব সাবধানে কাজ করবে।' আবার ওদের সঙ্গে হাত মেলালেন প্রেসিডেন্ট। 'কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করবে। অফিসে আসবে না। তাতে চোখে পড়ে যেতে পারো, তোমার পরিচয় ফাঁস হতে পারে। এখন পেছনের দরজা দিয়ে বেরোও।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

তিন

দোতলার অ্যাডমিশন অফিসের কাছে এসে ফিসফিস করে মুসাকে বলল কিশোর, 'এবার কাটো।'

'কাটব?'

'তো কি? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে নাকি?'

'মানে?'

'গাধা! দু-জনে যে একসঙ্গে কাজ করছি ঢোল পিটিয়ে জানাতে চাও কলেজসুদ্ধ লোককে? এখন থেকে তুমি আর আমি আলাদা স্কুলের ছাত্র। একজন আরেকজনকে চিনি না। বোঝা গেছে?'

'বুঝেছি। কিন্তু আমাকে না চিনলে বাড়ি যাবে কি করে? গাড়ি তো নেই তোমার।'

'বাস আছে। যাতায়াতের অন্য ব্যবস্থা আছে। তোমার গাড়ি নেই বলে কি যাওয়া আটকে থাকবে আমার? যাও। রাতে হেডকোয়ার্টারে দেখা হবে কে জানে কত রাত জেগে কাজ করতে হবে আজ। হোমওঅর্ক।'

'এই একটি কাজ তুমি একাই কোরো, আমি এর মধ্যে নেই,' দু-হাত নেড়ে বলল মুসা। করিডর ধরে রওনা হয়ে গেল সে।

ও চোখের আড়াল হওয়াতক অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর ঢুকল অ্যাডমিশন অফিসে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে শোরমন্টের ছাত্র করে নিল অ্যাডমিশন ক্লার্ক। একটা স্টুডেন্ট হ্যান্ডবুক, ক্যাম্পাসের একটা ম্যাপ আর একটা স্টুডেন্ট আইডেনটিটি কার্ড দিল। আরও একটা জিনিস দিল, যেটা শোরমন্টের কোন ছাত্রকেই দেয়া হয় না—কম্পিউটার প্রিন্টারে ছাপা বাস্কেটবল কোচিং আর প্লেয়ারদের ক্লাসের একটা তালিকা।

বাইরে বেরিয়েই দ্রুত তালিকাটায় একবার চোখ বোলাল কিশোর। কোন কোন ক্লাসে যোগ দেয়া দরকার বুঝে নিল। বেশির ভাগই সহজ—ইনট্রোডাকশন টু আরচারি, সাইকোলজি অভ দা ফ্যামিলি, ইউনিটি, হিস্টরি অভ টেলিভিশন। কিশোরের জন্যে এগুলো কোন ব্যাপারই নয়। কোনটা থেকে শুরু করবে ভাবতে লাগল সে।

ক্যাম্পাস টাওয়ারের ঘড়িতে একটা বাজল। আরেকবার শিডিউলটার দিকে তাকাল কিশোর। ডুয়েন বার নামে বাস্কেটবল টীমের একজন গার্ডের ১-টায় কেমিস্ট্রি ক্লাস আছে, সাইন্স বিল্ডিঙ মার্স হলে। এখান থেকেই শুরু করবে, ভাবল সে।

তাড়াহুড়ো করে ছাত্রদের আসতে দেখা গেল।

একজনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মার্স হলটা কোনদিকে?'

'মার্স হল? পাগলা ছাত্রগুলো যেখানে বোমা বানানো প্র্যাকটিস করে? সাইন্স বিল্ডিঙেরই কোথাও হবে।' চলে গেল ছাত্রটা।

বোধহয় নতুন, জানে না কিছু। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে ম্যাপ বের করল কিশোর।

মার্স হল পাথরে তৈরি একটা পুরানো বাড়ি, আধুনিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের মত নয়। আবছা অন্ধকার হলওয়ে ধরে হেঁটে চলল সে। পুরানো লাইটিঙ সিসটেম, আলো খুব কম। ৩৭৭ নম্বর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। ভেতরে ল্যাবরেটরি। অন্তত চল্লিশজন ছাত্র টুলে বসে কথা বলছে লম্বা লম্বা টেবিলগুলোর সামনে, শিক্ষক আসার অপেক্ষা করছে।

ভেতরে ঢুকল কিশোর। ভয় পাচ্ছে, কেউ না চিনে ফেলে তাকে। কিন্তু কেউ উঠে দাঁড়াল না। নাম ধরে ডাকল না। বেশির ভাগ ছেলে তাকালই না তার দিকে।

ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল সে, যেন বসার জন্যে খালি টুল খুঁজছে। আসলে লুথার ফায়ারস্টোন কে, চেনার চেষ্টা করছে।

যেহেতু বাস্কেটবল খেলে, বেঁটে না হওয়াই স্বাভাবিক, অনেক লম্বা হবে। হয়তো ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা।

কিন্তু তার এই থিয়োরি কাজে লাগল না। এখানে সবচেয়ে লম্বা হলো একটা মেয়ে, ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। পায়ে কালো চামড়ার চকচকে বুট।

তবে কি লুথার নেই এখানে? বাস্কেটবলের মৌসুম অর্ধেক শেষ হয়ে এসেছে। এমনও হতে পারে খেলতে গিয়ে আহত হয়েছে, ব্যান্ডেজ-ট্যান্ডেজ থাকতে পারে।

আবার চোখ বোলাতেই চোখ পড়ল কব্জিতে ব্যান্ডেজ বাঁধা এক যুবকের ওপর। ওই তো! সামনের টেবিলে রেখেছে চামড়ায় বাঁধানো একটা নোটবুক। এককোণে সোনালি অক্ষরে লেখা এল. এফ., অর্থাৎ লুথার ফায়ারস্টোন, অনুমান করল কিশোর। নোটবুকের ওপরে রাখা দামী একটা মন্ট ব্ল্যাঙ্ক কলম।

তারমানে প্রচুর টাকা খরচ করে লুথার। কোথায় পায়? লভেল ম্যাডিরার কাছ থেকে?

আচমকা থেমে গেল ঘরের গুঞ্জন। শিক্ষক এসে গেছেন। ছোটখাট একজন মানুষ, মাথায় সাদা চুল। বোর্ডের কাছে গিয়ে চক দিয়ে লিখলেন:

কুকুরের খাবার
লেটুস
সিরকা
সাবান

তালিকাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। জিনিসগুলো নিশ্চয় কোন সাধারণ রাসায়নিক যৌগ। ঠিক কি বোঝায়, বুঝল না। তারমানে যতটা সহজ মনে করেছিল, এখানে ক্লাস করা তত সহজ নয়।

'স্যার, এটা কি?' জিজ্ঞেস করল একজন বিস্মিত ছাত্র।

ছাত্রদের দিকে ফিরে হাসলেন প্রফেসর। 'এটা কোন পড়া নয়। বাড়ি থেকে আমার স্ত্রী বলে দিয়েছে মুদি দোকান থেকে কি কি নিতে হবে। পড়াতে গেলে আর সব ভুলে যাই তো, তাই লিখে নিয়ে মনে গেঁথে রাখলাম।'

সবাই হেসে উঠল।

পড়ানো শুরু করলেন প্রফেসর। অনেকগুলো সমীকরণ লিখলেন বোর্ডে। তারপর একজন একজন করে ডেকে প্রশ্ন শুরু করলেন।

শান্ত থাকো, নিজেকে বোঝাল কিশোর। একদম চুপ। মাথা নিচু করে রাখো, যাতে স্যারের চোখে চোখ না পড়ে।

জবাব দিতে পারবে না বলে যে ভয় পাচ্ছে, তা নয়, জবাবগুলো তার জানা। বরং বেশি বলতে গিয়ে চোখে পড়ে যাওয়ার, চেনা হয়ে যাওয়ার ভয়ে আছে।

যে ক'জনকে প্রশ্ন করলেন প্রফেসর, একটা ছেলেও জবাব দিতে পারল না। হতাশই হলেন তিনি। শেষে ক্লাসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে পারবে?'

কেউ হাত তুলল না। উঠে দাঁড়াল না।

'কেউ পারো না!'

শিক্ষকের কণ্ঠে ধিক্কার, সহ্য করতে পারল না আর কিশোর, যা থাকে কপালে ভেবে উঠে দাঁড়াল। দিয়ে দিল জবাব।

'হ্যাঁ, হয়েছে,' স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর। 'একটুও ভুল হয়নি। ইয়াং ম্যান, তোমাকে এ ক্লাসে আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না?'

ঢোক গিলল কিশোর। গেল নাকি ধরা পড়ে! 'কয়েকদিন আসিনি, স্যার।'

'কি নাম তোমার?'

'কিশোর পাশা।'

'মনে থাকবে। কিশোর পাশা, মনে থাকবে নামটা।'

ডাস্টার দিয়ে লেখাগুলো মুছে নিয়ে নতুন সমীকরণ লিখলেন প্রফেসর। অর্ধেকটা করে। জিজ্ঞেস করলেন, 'লুথার, তুমি পারবে?'

উঠে দাঁড়াল লুথার।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। নতুন কোন দৃশ্য নয়। জীবনে বহুবার দেখেছে। লুথারের ভাবভঙ্গিই বলছে জবাব জানা নেই তার। ওর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার, দৃষ্টি আকর্ষণ করার এটাই সুযোগ।

তাড়াতাড়ি লুথারের দামী কলমটা তুলে নিয়ে একটা কাগজে লিখল সে,

—২

দেখাল লুথারকে।

উসখুস করতে করতে হঠাৎ জবাব দিল লুথার, 'মাইনাস টু, স্যার।'

'গুড। হয়েছে।'

নতুন সমীকরণ লেখায় মন দিলেন প্রফেসর।

ক্লাস শেষে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা উঠে দাঁড়াল। এগোল দরজার দিকে। লুথারের এক কদম আগে রইল কিশোর। হলে এসে —২ লেখা কাগজটা বের করে দিয়ে হেসে বলল, 'এটা নেবে? স্যুভনির।'

লুথারও হাসল। 'দাও। বাঁচিয়েছ আমাকে, অনেক ধন্যবাদ। না পারলে সাংঘাতিক লজ্জা পেতাম। চেষ্টা করলে উত্তরটা আমিও বের করতে পারতাম। কিন্তু ক্লাসে শিক্ষক কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেই ভয় পেয়ে যাই, সব গুলিয়ে যায়।'

কয়েক পা এগোনোর পর আচমকা মন্ট ব্ল্যাঙ্ক কলমটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল লুথার, 'এটা রাখো।'

'না, না…'

'আরে রাখো তো,' জোর করে কলমটা কিশোরের হাতে গুঁজে দিল লুথার। 'এই জিনিস আরও কয়েকটা আছে আমার।'

মনে মনে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠলেও সেটা প্রকাশ করল না কিশোর। বলল, 'কেমিস্ট্রি অত কঠিন কোন সাবজেক্ট না। যদি চাও, আমি সাহায্য করতে পারি তোমাকে।'

'তুমি? আমার টীচার হবে! চমৎকার প্রস্তাব। কিন্তু মুশকিল হলো সময় নিয়ে, খুবই কম সময় পাই। এক কাজ করতে পারি। বাস্কেটবল প্র্যাকটিসের পর যতখানি পাব, সেই সময়টা কেমিস্ট্রি শেখায় ব্যয় করতে পারি।'

'বিনে পয়সায় কিন্তু পারব না। টীচারের সময়ের দাম আছে।'

'কোন অসুবিধে নেই। পয়সা ছাড়া টীচিং নিতে যাবও না আমি। তা ছাড়া টাকা কোন সমস্যা নয় আমার কাছে।'

হ্যান্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল লুথার। তার মধ্যম আঙুলে একটা ভারী আঙটি। সোনার পুরু পাতে খোদাই করে লেখা নাম: লুথার।

হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল কিশোর। হাসল। মনে মনে বলল, তোমার টাকার কোন প্রয়োজন নেই আমার, লুথার। প্রয়োজন কেবল কোথা থেকে আসে এই টাকা, সেটা জানা।

চার

প্রথম রিঙটা হতেই থাবা দিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল মুসা, 'হ্যালো, তিন গোয়েন্দা।'

'মুসা?' শান্ত কণ্ঠে জবাব এল।

'কে, কিশোর? কোত্থেকে বলছ? ছ'টা তো বাজে। এক ঘণ্টা ধরে বসে

আছি আমি আর জিনা। খিদেয় মারা যাচ্ছি।'

'শোরমন্ট ক্যাম্পাসের বুকস্টোর থেকে কথা বলছি। বাস আসতে এক ঘন্টা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে দু-ঘন্টা।'

'তারমানে আটটার আগে আসতে পারছ না। যাক, ফোন করে ভাল করেছ। অহেতুক বসে থাকতাম।'

তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'মুসা, ছেড়ো না! শোনো, তুমি গাড়ি নিয়ে চলে এলেই আর আটকে থাকতে হয় না আমাকে। গাড়িতে সময় অনেক কম লাগে।'

'কিন্তু কিশোর, তোমাকে তো আমি চিনিই না! দু-জনকে একসঙ্গে দেখা না যাওয়ার কথা তুমিই বলেছ।'

জুতোর ডগা দিয়ে মেঝে ঠুকল কিশোর। 'এমন ভাবে গাড়িতে উঠব, যাতে কারও চোখে না পড়ি।'

'কিশোর, তোমার একটা গাড়ি দরকার। না হলে চলে না।'

দুটো গাড়ি কিনেছে কিশোর, একটাও রাখতে পারেনি, দুর্ঘটনায় কোন না কোন ভাবে নষ্ট হয়েছে। সে কথা মনে করে অদৃশ্য কারও ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো ওর। সেটা ঝাড়ল মুসার ওপর, 'অত কথা না বলে তুমি এসে তুলে নেবে কিনা বলো!'

'বেশ, আসছি।'

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কিশোরকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল মুসা। শোরমন্ট কলেজের নাম লেখা নতুন একটা সোয়েটশার্ট গায়ে দিয়েছে কিশোর। বুকস্টোর থেকে কিনেছে।

মিনিট দুই পরে আরেকটা গাড়ি ঢোকার শব্দ হলো। জিনার গাড়ি। একটা বাক্সে অনেকগুলো পিজা নিয়ে এসেছে।

'ভেরি গুড,' বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'আমারও যে খিদে পেয়েছে বুঝিনি।'

পিজা খেতে খেতে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'এইবার বলো, সারাদিন কি কি করলে?'

'কেমিস্ট্রি ক্লাসে একজন ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাকে পড়ানোর কাজও পেয়ে গেছি। মনে হলো, টাকার মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে।'

'তারপর?'

'কেমিস্ট্রি ক্লাসের পর আরও দুটো ক্লাসে যোগ দিয়েছি, আরও দু-জন প্লেয়ারের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে। কিন্তু দু-জনের একজনও আসেনি। তারপর গেলাম জিমনেশিয়ামে, বাস্কেটবল প্র্যাকটিস দেখার জন্যে। কিন্তু টীমটাকে পেলাম না ওখানে। কেবল কয়েকজন চিয়ারলীডার আড্ডা দিচ্ছে।'

'তারা কি বলল?' জিনার প্রশ্ন।

'তারা আর কি বলবে, জিজ্ঞেসই করিনি। চিয়ারলীডাররা আর কি

জানবে।' বলেই বুঝল কিশোর, জিনার সামনে এ ভাবে বলাটা ঠিক হয়নি। কারণ ও একটা চিয়ারলীডার গ্রুপের নেতা।

প্রতিবাদ করল জিনা, 'বলো কি তুমি? চিয়ারলীডাররা জানে না? কোনও টীমের ব্যাপারে তাদের চেয়ে ভাল খবর আর কে রাখে? তোমার কি ধারণা জিমনেশিয়ামে শুধু শুধু নেচে বেড়াই আর চেঁচিয়ে গলা ফাটাই? ভুল করছ। খেলার ব্যাপারে তোমার আগ্রহ কম তো তাই কিছু জানো না। প্রতিটি গেমের খবর রাখি আমরা। দর্শকদের কাছে বিজ্ঞাপন করি। খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভাব করি, তাদের উৎসাহ জোগাই, যতভাবে সম্ভব। কোন একটা টীম জেতার জন্যে চিয়ারলীডারদের অবদান কম নয়।'

'চিয়ারলীডারদের ছোট করে দেখছি না আমি,' জিনাকে শান্ত করার জন্যে বলল কিশোর। 'বেশ, তোমাকেই জিজ্ঞেস করি, কোন সূত্র দিতে পারো?'

'আপাতত পারছি না। তবে চেষ্টা করলে নিশ্চয় পারব

'তাহলে কাল চেষ্টা কোরো।'

'কাল পারব না। একটা টীমের সঙ্গে স্কিইং করতে যাব।'

'স্কিইং? এ সময়? রকি বীচ বাস্কেটবলকে ডোবাবে নাকি? চিয়ারলীডারদের ক্যাপ্টেন হয়ে...'

'ভয় নেই। ভাইস ক্যাপ্টেন আছে। আমার জায়গা নেবে সে। চিয়ারলীডারদের দলটাকেই বেশি দরকার, আমি একজন না থাকলে কিছু হবে না।'

পরদিন সকালে ক্লাসে যোগদান করল কিশোর, বিকেলে গেল শোরমন্ট জিমনেশিয়ামে। দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখল বাস্কেটবল টীমটা আছে কিনা। পাঁচজন চিয়ারলীডারকে দেখা গেল আড্ডা দিচ্ছে।

ভেতরে ঢুকল সে। মেঝের কাছে একটা সীটে বসল। তার দিকে ফিরেও তাকাল না মেয়েগুলো। গল্পে মশগুল।

লম্বা কালো-চুল একটা মেয়ে ঘোড়ার লেজের মত করে বাঁধা চুল নাচিয়ে বলল, 'তোদের কি ধারণা আর্ট টিলারির টাকা আর করভেট গাড়ির লোভে আমি ওর সঙ্গে মিশি?'

'হ্যাঁ!' জোর গলায় একসঙ্গে জবাব দিল অন্য চারজন।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'তা ছাড়া আর কিসের লোভে?'

কান খাড়া হয়ে গেল কিশোরের। আর্ট টিলারি! একজন বাস্কেটবল প্লেয়ার! ফিরে তাকাল।

একটা মেয়ের চোখ পড়ল তার ওপর। 'আরে, তুমি? কিশোর পাশা!' বন্ধুদের বলল, 'সাংঘাতিক ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। আজ ক্লাসে কি করেছে জানিস? একগাদা শেক্সপীয়ার গড়গড় করে উগড়ে দিয়েছে। স্যার বললেন একটা শব্দও ভুল হয়নি। সবাই অবাক। অত মুখস্থ রাখল কি করে!'

'আসলে মুখস্থ রাখাটা কিছু না, কোরিন,' বিনয় দেখাল কিশোর। 'মন

দিয়ে পড়লে তুমিও পারবে।'

'না, পারব না,' জোরে মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'আরও দশবার জন্মগ্রহণ করলেও পারব না কিছু কিছু মানুষ জন্মায়ই তোমার মত আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি নিয়ে।'

সব ক'টা চোখ এখন কিশোরের দিকে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

মলি নামে একটা মেয়ে—চিয়ারলীডারদের শোরমন্ট টীমের ক্যাপ্টেন সে—বলল, 'এখানে কি করছে সে একা একা? হাতে তো বইও নেই যে মুখস্থ করছে?'

কি করছে এই জবাবটা ওদের কাছে দিতে রাজি নয় কিশোর। এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখার ভান করল। 'একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। মনে হচ্ছে আজ আর আসবে না। তোমাদের বিরক্ত করলাম।'

'না না, ও কিছু না,' বলল নীল চোখ একটা মেয়ে, ওর নাম টারা—সোয়েটারের বুকে নাম লেখা রয়েছে সুতো দিয়ে, 'বিরক্ত আর করলে কোথায়। তুমি তো চুপ করে বসেছিলে।'

মিনিটখানেক পর ক্যাম্পাসের পথ ধরে বুকস্টোরের দিকে এগোল কিশোর, ফোন করার জন্যে। ভাবছে। মেয়েগুলোর আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছে আর্ট টিলারির অনেক টাকা। কোথায় পেল? লুথারের মতই কোন উপায়ে?

বুদে ঢুকে রবিনকে ফোন করল সে। 'রবিন?'

প্রচণ্ড শব্দে মিউজিক বাজছে ওপাশে।

ফোনে চিৎকার করে রবিন বলল, 'টেপ টেস্ট করছেন মিস্টার লজ। জোরে বলো। কেসের ব্যাপারে কিছু?'

'মনে হচ্ছে দু-হাতে টাকা খরচ করছেন ম্যাডিরা। কয়েকজন খেলোয়াড়ের নাম জেনেছি, প্রচুর টাকা ওড়াচ্ছে। দামী অ্যাপার্টমেন্ট, দামী গাড়ি...'

'কে বলল?'

'চিয়ারলীডারদের কাছে জানলাম।'

'কাদের কাছে?'

আরও জোরে চিৎকার করে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, মনে হচ্ছে শব্দের চোটে কানের পর্দা ফেটে যাবে। 'ক্লাসে কোরিন নামে একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আমার প্রতি খুব আগ্রহ দেখাল। তার কাছে জানলাম আর্ট টিলারির কথা।'

'কিশোর, একটা কথাও বুঝতে পারছি না তোমার,' নিরাশ কণ্ঠে বলল রবিন। 'রাতে ফোন কোরো। এখন রাখি।'

লাইন কেটে দিল রবিন।

নাকমুখ কুঁচকে বিরক্ত চোখে রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে আছে

কিশোর।

হঠাৎ তার গলা চেপে ধরল শক্তিশালী দুটো থাবা। আঙুলগুলো সাঁড়াশির মত চেপে বসল কণ্ঠনালীতে।

পাঁচ

দম বন্ধ হয়ে আসছে কিশোরের। বুকের খাঁচায় অস্থির হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। গলা থেকে আঙুলগুলো ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল। লোকটা তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

অনেক কষ্টে কোনমতে গলাটা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল কে ধরেছে।

চিনতে পারল। কোল প্যাসিয়ানো, শোরমন্ট বাস্কেটবল টীমের সেন্টারে খেলে। শজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে আছে খাটো করে ছাঁটা চুল।

'ভু-ভু-ভুল করছ!' হাঁসফাঁস করে বলল কিশোর। দম নেয়ার জন্যে ছটফট করছে।

'ভুলই। আমি না, তুমি করেছ।' বড় বড় দাঁত বের করে হাসল কোল। দুটো দাঁতের গোড়ায় রূপার রিঙ পরানো, অতিরিক্ত বেঁকে গিয়েছিল, সোজা রাখার জন্যে।

অবশ হয়ে আসছে কিশোরের শরীর। হাল ছাড়ার আগে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল। কনুই দিয়ে গুঁতো মারল কোলের পেটে।

কিছুই হলো না কোলের। কিশোরকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'ফোনে যা যা বলেছ সব শুনেছি! তোমাকে আজ শেষই করে ফেলব আমি!'

অক্সিজেনের জন্যে পাগল হয়ে গেছে ফুসফুস। শরীর অবশ হয়ে আসছে। ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে মগজ। তার মধ্যেই ভাবল সে, ঘুষের কথাটা জেনে ফেলেছে বলেই তাকে মেরে ফেলছে কোল। মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্যে।

হাল ছেড়ে দিল কিশোর। চোখ বন্ধ করল। ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে গলার গভীর থেকে।

'কোল, ছাড়ো ওকে!' ধমকে উঠল একটা কঠিন কণ্ঠ।

সঙ্গে সঙ্গে ঢিল হয়ে গেল কিশোরের গলার চাপ। ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হলো তাকে। ওখানেই বসে পড়ে হাঁ করে শ্বাস নিতে শুরু করল সে।

কোলের পেছনে দাঁড়ানো মানুষটাকে দেখতে পেল কিশোর। কোচ লভেল ম্যাডিরা। কোলকে সরিয়ে কিশোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওর দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে কোলের দিকে ফিরলেন, 'বাস্কেটবল কোর্টে সমস্ত শক্তি দিয়ে ফাইট কোরো, কিচ্ছু বলব না, বরং পেছনে লেগে থেকে সাপোর্ট করব তোমাকে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে একজন মানুষকে খুন করে ফেলবে, এটা আমি হতে দেব না কিছুতে।'

কোচকে ভয় পায় কোল, তার আচরণেই বুঝতে পারল কিশোর। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে চোখ নামিয়ে ফেলেছে মেঝের দিকে।

'ছেলেটার ওপর খেপলে কেন?' জানতে চাইলেন কোচ

শীতল দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল কোল চোখে তীব্র ঘৃণা। 'ও আমার গার্লফ্রেন্ডের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছিল!'

গার্লফ্রেন্ড! ভাবল কিশোর কোরিন ওর গার্লফ্রেন্ড? সত্যি বলছে? নাকি ঘুষের ব্যাপারটা ঢাকার চেষ্টা করছে কোচের কাছে?

কিশোর পুরোপুরি স্বাভাবিক হওয়ার আগেই কোচের কাছে মাপ চেয়ে ছুটে পালাল কোল। মিশে গেল ছাত্রদের একটা জটলার মধ্যে। এদিকে তাকিয়ে আছে ওরা। কোল যে কিশোরের গলা টিপে ধরেছিল বোধহয় দেখেছে।

তার চোখের দিকে তাকালেন কোচ। 'বড় বেশি বদমেজাজী।'

'ঠিক বলেছেন। এগুলোকে সামলাতে বোধহয় অনেক কষ্ট হয় আপনার।'

'তা হয়। কাকে ফোন করছিলে? ওর গার্লফ্রেন্ডকে?'

'না, আমার বন্ধুকে। কোরিনের সঙ্গে যে আমার পরিচয় হয়েছে এ কথা বলেছি। তাতেই এত রাগ।'

'ও। ঠিক আছে, আবার করো ফোন।'

'না, আর করা লাগবে না...'

'পয়সার কথা ভাবছ? অসুবিধে নেই, এই নাও, পকেট থেকে টাকা বের করে দিলেন কোচ। 'টাকাটাকে কখনোই বড় করে দেখবে না। ইচ্ছেটাই আগে। সেটা পূরণ করা হলো আসল কথা।'

ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। টাকার ব্যাপারে এত উদার কেন? ফোনে যে কথা বলছিল সে, কতটা শুনেছেন? ম্যাডিরার নামটাও চেঁচিয়ে বলেছে সে। সেটা কি শুনেছেন?

উদ্বিগ্ন হলো কিশোর। নিজেকে ধমক দিয়ে সাবধান করল, ক্যাম্পাসে কথা বলার সময় আরও সতর্ক হতে হবে। নইলে কেস শেষ হওয়ার আগেই তার পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

পরদিন বুধবার, অনেক কাজ কিশোরের। সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ফিজিকস ক্লাস করার সিদ্ধান্ত নিল সে। প্রতিটি ক্লাসেই একজন করে বাস্কেটবল প্লেয়ার থাকবে, যাদের ওপর নজর রাখতে পারবে।

ভীষণ কঠিন কাজ। এতটা কঠিন হবে ভাবতে পারেনি। সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল সে। পঞ্চম ক্লাসটা করতে গিয়ে মনে হলো, জাহান্নামে যাক সব। বিছানায় শুয়ে পড়তে পারলে এখন বাঁচি। স্কুলের ছাত্র হয়ে কলেজে ক্লাস করাটাই একটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তার ওপর একটানা

এতগুলো ক্লাস। দুটোর বেশিতে ঢোকা উচিত হয়নি।

তবে যাই হোক, কষ্টের ফল পাওয়া গেল। বেশ কিছু তথ্য জানতে পারল। জানল, সব বাস্কেটবল খেলোয়াড়েরই টাকা নেই।

ঢুকবে কি ঢুকবে না করতে করতে প্রবল কৌতূহল ষষ্ঠ ক্লাসটায়ও টেনে নিয়ে গেল তাকে। কারণ এটাতে অংশ নেবে দু-জন খেলোয়াড়—আর্ট টিলারি আর রুথ লেসলি। সকালে কিছু কিছু খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলাপ করার পর এই দু-জনের ওপর সন্দেহ বেড়েছে তার।

এমন ভাবে ক্লাসে ঢুকল কিশোর, যাতে চোখে না পড়ে। গিয়ে বসল পেছনের একটা সীটে।

তার পাশের লোকটার পেশীবহুল দেহ, সুন্দর চেহারা, বালিরঙা চুল। পরনে পুরানো জিনস, গায়ে কালো টি-শার্ট এঁটে বসেছে বিশাল বুকে। চোখে কালো টরটয়েজশেল চশমা। কিশোরের দিকে তাকাল। 'নতুন নাকি? আগে তো কখনও দেখিনি?'

'নতুন। অন্য স্কুল থেকে এসেছি,' হেসে জবাব দিল কিশোর।

'আমি রুথ লেসলি। তুমি?'

'কিশোর পাশা। বাস্কেটবল খেলেন?'

'তুমি করে বললেই চলবে। বাস্কেটবলও খেলি, টেনিসও খেলি।'

রুথকে বেশ আন্তরিকই মনে হলো কিশোরের। দেখা যাক আলোচনা চালিয়ে, ভাবল সে। বলল, 'শুনলাম, এখানকার বাস্কেটবল খেলোয়াড়রা ভাল টাকা পায়?'

'সবাই না। আমার তো ক্যাম্পাসের কাছের ছোট একটা ঘরের ভাড়া দিতেই অবস্থা কাহিল। তুমি হয়তো আর্ট টিলারির কথা শুনেছ।' দুই সীট সামনে লম্বা, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান আরেক ছাত্রকে দেখাল রুথ।

টাকা নেই শুনে রুথের ব্যাপারে আগ্রহ হারাল কিশোর। অন্য প্রসঙ্গে গেল, 'বসন্তের ছুটিতে কোথায় যাবে? টিজুয়ানা স্প্রিঙে? ছুটিতে শোরমন্টের ছাত্ররা নাকি বেশির ভাগই ওখানে যায়।'

'আমার কি আর সেই কপাল আছে? ছুটিতে একসঙ্গে দুটো চাকরি করি, পড়ালেখার খরচ জোগানোর জন্যে। কাজ করতে করতে জান খারাপ।'

জবাবটা অবাক করল কিশোরকে। এতটাই খারাপ অবস্থা! অথচ ওরই টীমের কয়েকজন তো টাকার ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। তার এত খারাপ কেন? ঘুষের খবরটা পায়নি? নাকি নেয় না?

মগজের চরকিটা যেন বনবন করে ঘুরতে লাগল কিশোরের। একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে এল—টীমের অল্প বয়েসীরা টাকা পাচ্ছে, বয়স্করা পাচ্ছে না। ক্লাসের মধ্যে টিলারির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নেই, ক্লাস শেষে বলবে ঠিক করল।

স্যার ঢুকলেন ক্লাসে। হাতের অ্যাটাশে কেসটা আস্তে করে রাখলেন ডেস্কে। সুদর্শন একজন মানুষ। চকচকে কালো চুল। স্বাস্থ্যও খুব ভাল।

একসময় খেলাধুলা করতেন, নিয়মিত ব্যায়াম করেন এখনও, বোঝা যায়।

'গুড আফটারনুন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যান,' জোরাল গলায় বললেন তিনি। 'আমার নাম ডিজনি হেকামোর।'

এই ক্লাসে নতুন এসেছেন ক্লাস নিতে, বুঝতে পারল কিশোর। কিন্তু এত জোরে চেঁচিয়ে কথা বলেন কেন? আর এত সৌজন্য করে, গুছিয়ে কথা বলারই বা কি মানে?

হঠাৎ বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। ইচ্ছে করেই বলছেন। কারণ ক্লাসটা কালারফুল স্পীকিং-এর; কথা শেখানোরই ক্লাস। ব্রডকাস্টিং কোর্স। এখান থেকে পাস করে গিয়ে ছাত্ররা হয়তো স্পোর্টসকাস্টারের কাজ নেবে। খেলার মাঠে শুরু হবে তাদের ক্যারিয়ার।

নিখুঁত, স্পষ্ট, জোরাল উচ্চারণে লেকচার দিতে লাগলেন হেকামোর।

সাবজেক্টটা মোটেও পছন্দ হলো না কিশোরের। বিরক্তি লাগছে। ক্লাস যেন আর শেষই হতে চায় না।

অবশেষে শেষ হলো ক্লাস। মাথার মধ্যে কেমন একধরনের ভোঁতা অনুভূতি। মাথা ঝাড়া দিয়ে মগজটা পরিষ্কার করতে করতে উঠে দাঁড়াল কিশোর। আর্ট টিলারি বেরিয়ে গেছে। তাকে ধরার জন্যে ছুটল।

পেছন থেকে ডাকল, 'টিলারি?'

ফিরে তাকাল লম্বা যুবক। সোনালি চুল এতটাই খাটো করে ছাঁটা, চাঁদিতে রোদ চকচক করতে লাগল।

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল টিলারি।

'শুনলাম, আপনি একটা নিরামিষভোজী ক্লাবের সদস্য? আমিও হতে চাই...'

'দূর, কে বলে! নিরামিষ খেতে যায় কে? আমি আমিষ। এবং বাস্কেটবল।' হাঁটা দিল আবার টিলারি।

তার পাশে চলতে প্রায় দৌড়াতে হলো কিশোরকে। 'গাড়িতে আগ্রহ আছে? করভেট?'

'কেন, তোমারও করভেট গাড়ি আছে নাকি?'

'আছে একটা, বায়াত্তর মডেলের।'

'দারুণ জিনিস, তাই না?'

'হ্যাঁ চলে যখন, মনে হয় না রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, যেন ওড়ে।'

'আমারও আছে একটা। দাম পঞ্চাশ হাজার ডলার।'

হাঁ হয়ে যেতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে ফেলল কিশোর।

'পুরানো মডেলের করভেট দেখার খুব ইচ্ছে আমার। তোমারটা কি পার্কিং লটে?'

'না, বাড়িতে। আলাস্কায়।'

'ও, তুমি তাহলে বিদেশী। সেটা অবশ্য দেখেই বুঝেছিলাম। এসো, আমারটা দেখাব।'

পার্কিং এরিয়ার দিকে হাঁটতে হাঁটতে টিলারির মুখ থেকে তথ্য বের করার

চেষ্টা চালাল কিশোর। কিন্তু লাভ হলো না। প্রচুর কথা বলছে টিলারি, কিন্তু কাজের কথা বলছে না একটাও। শেষে ঝুঁকি নিতে বাধ্য হলো কিশোর, সরাসরি প্রশ্ন করে বসল, 'টিলারি, একটা কথা, কোচ লভেল ম্যাডিরা লোকটা কেমন? মানে, কখনও কি কিছু দিয়েছে আপনাকে?'

'দিয়েছে। বিনে পয়সায় কিছু উপদেশ। বলেছে, দরকার হলেই যেন তার কাছে গিয়ে লেকচার খয়রাত করে আনি।'

পার্কিং লটে ঢুকল ওরা। দাম শুনেই বুঝতে পেরেছিল কিশোর গাড়িটা কেমন হবে। তার পরেও হাঁ হয়ে যেতে হলো তাকে।

চকচকে দরজাটা খোলার জন্যে হাত বাড়াল টিলারি। ঝিক করে উঠল কব্জির দামী রোলেক্স ঘড়ি। সেটার দিকে চোখ পড়তে যেন আঁতকে উঠল কিশোর, 'সর্বনাশ, এত বেজে গেছে! তিনটে সময় ওদের সঙ্গে দেখা করার কথা আমার!'

'অসুবিধে কি? চলো, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব কোথায় যেতে হবে?'

লাল গাড়িটার আরামদায়ক ড্রাইভিং সীটে বসে বলল টিলারি, 'ও হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস আমাকে দিয়েছিল একদিন কোচ ম্যাডিরা। আমার গাড়িটা গ্যারেজে দিয়েছিলাম, তখন আমাকে একটা লিফট দিয়েছিল।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল সে।

চুপ করে আছে কিশোর।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওঠো। বলো কোথায় যেতে হবে?'

হঠাৎ যেন মনস্থির করে নিয়েছে কিশোর, এমনি ভঙ্গিতে বলল, 'থাক, আজ আর যাব না। অন্যদিন গেলেও চলবে। আপনি যান। থ্যাংক ইউ

ছয়

তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শোরমন্টের জিমনেশিয়ামে ঢুকল কিশোর। রবিনকে দেখতে পেল চিয়ারলীডারদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। দেখে রাগই লাগল। সে আশা করেছিল কোচ ম্যাডিরার অফিসে ঢুকে তদন্ত করছে রবিন, জরুরী তথ্য উদঘাটন করছে। সে-জন্যেই তাকে আসতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তা না করে মেয়েদের সঙ্গে আড্ডাবাজি।

এগিয়ে গেল সে। তাকে চিনতে পেরে হই-হই করে উঠল চিয়ারলীডাররা। কোনমতে হাত একটু নেড়ে, মাথা নুইয়ে সাড়া দিয়ে হাত নেড়ে রবিনকে ডাকল সে। বলল, 'কোচের অফিসে ঢোকার সময় পাওনি নিশ্চয়। চলো, এখুনি ঢুকব। এটাই সময়।'

'কে বলল পাইনি,' হেসে জবাব দিল রবিন। 'তোমার কথামত এসেই আগে ওখানে ঢুকেছি। তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছি। খুব ব্যস্ত অফিস।

একের পর এক ফোন আসছে, লোক ঢুকছে-বেরোচ্ছে। তাই বেশি কিছু জানতে পারিনি। কেবল একটা কথা। প্রতি হপ্তায় একটা করে স্কাউটিং রিপোর্ট প্রকাশ করেন ম্যাডিরা, তাতে নতুন কাদের রিক্রুট করছেন সে-কথা লেখা থাকে। তাঁর ব্যক্তিগত অফিসের কম্পিউটারে থাকে এই ফাইল। এবারকার রিপোর্টটা দেখলাম। এক নম্বরে কার নাম জানো?'

'মুসার?'

'হ্যাঁ। তাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচ।'

'তাহলে গত শুক্রবারের পর আর যোগাযোগ করেননি কেন?'

'কি জানি!'

'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, রবিন। কোন্ কোন্ প্লেয়ারকে টাকা দেয়া হচ্ছে, নামের পাশে এমন কোন নোট লেখা দেখেছ?'

মাথা নাড়ল রবিন।

'একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে আরম্ভ করেছি, বুঝলে,' আনমনে বলল কিশোর, 'অল্পবয়েসী প্লেয়ারদের টাকা দেয়া হয়, বয়স্কদের দেয় না। হতে পারে ম্যাডিরা এখানে নতুন বলেই এই ব্যবস্থা। দু-বছর হলো তিনি এসেছেন। তার মানে বেশি রিক্রুট করার সুযোগ পাননি। নিজে যাদের করেছেন তাদেরই কেবল টাকা দেন।'

'কিন্তু ম্যাডিরাই কাজটা করছেন শিওর হলে কি করে?'

'হইনি। মনে হচ্ছে আরকি। শিওর হতে হলে তথ্য জোগাড় করতে হবে। তাঁকে বাধা দিতে হলে প্রমাণ লাগবে, যেটার জন্যে অপেক্ষা করছেন প্রেসিডেন্ট ডেভন কলিন। চলো, আরেকবার ঢুঁ মেরে আসি ম্যাডিরার অফিস থেকে।'

রওনা হতে যাবে ওরা, এই সময় লকার রুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা আজব মূর্তি। মানুষই, তবে সবুজ আর সাদা পোশাক পরে তোতাপাখি সেজেছে। এসেই ভাঁড়ামি শুরু করে দিল।

'কে লোকটা?' কিশোরের প্রশ্ন।

হাত ওল্টাল রবিন, 'কি করে বলব?'

চিয়ারলীডারদের টেনে নিয়ে গিয়ে একখানে জড় করল সে। একজনের ওপর আরেকজনকে দাঁড় করিয়ে একটা পিরামিড তৈরি করল। নিজে উঠল চূড়ায়। কিন্তু সার্কাসের লোকদের মত অত দক্ষ নয় সে, বেশি ওস্তাদি দেখাতে গিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। চিৎকার করে উঠল ব্যথায়।

মাঝপথে হাসি থেমে গেল কিশোরের। দিল দৌড়।

তোতাপাখির মাথা খুলতেই দেখা গেল, একটা ছেলে; গোড়ালি মচকে গেছে। মলির কাছে জানা গেল ছেলেটার নাম রনি। অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে ফোন করতে গেল একটা মেয়ে।

মলি বলল, 'দিল তো সর্বনাশ করে। কালকের মধ্যে আরেকজন তোতা এখন কোথায় পাই?'

সমাধান করে দিল রবিন। এগিয়ে এসে দাঁড়াল মেয়েদের ভিড়ের

মাঝখানে। 'ভয় নেই, আমি জোগাড় দিতে পারব। এই যে আমার বন্ধুটি,' কিশোরকে দেখাল সে, 'খুব ভাল অভিনেতা। চমৎকার তোতা সাজতে পারবে।'

কড়া দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!'

কিশোরের রাগের পরোয়া করল না রবিন। চিয়ারলীডারদের বলল, 'ভয় নেই, ওকে এখনি রাজি করিয়ে ফেলছি আমি।' হাত ধরে কিশোরকে টেনে দূরে সরিয়ে আনল সে।

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?' খেপে উঠল কিশোর। 'তোতা সাজার আমি কি জানি?'

'ভাঁড়ামি তো জানো। করেওছ এই কাজ। এখন পারবে না কেন?'

'কিন্তু আমি কেন করতে যাব এই কাজ?'

'তদন্তের স্বার্থে। দারুণ একটা ছদ্মবেশ পাবে। চিয়ারলীডারদের সঙ্গে সঙ্গে প্লেয়ারদের কাছাকাছি থাকতে পারবে। আর কি চাও?'

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। তাই তো, এ কথাটা তো ভাবেনি! রাজি হয়ে গেল সে।

রবিনের সঙ্গে ওদের বাড়িতে এসে ঢুকল কিশোর। খিদে পেয়েছে। নিজেই ফ্রিজ খুলে খাবার বের করতে শুরু করল।

মাইক্রোওয়েভে দিয়ে খাবার গরম করতে করতেই ঘরে ঢুকল মুসা

'এত তাড়াতাড়ি এলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কেন, আমার ক্যাডিলাকটাকে কি গাড়ি মনে করো না নাকি? ভি-এইট ইঞ্জিন।'

খেতে বসে গেল তিন গোয়েন্দা মুসা জানতে চাইল, 'তারপর, খবর-টবর কি?'

রবিন বলল, 'কাল রাতে পাখি হয়ে যাচ্ছে কিশোর।'

হাঁ হয়ে গেল মুসা। চিবানো বন্ধ। মুখ ভর্তি খাবার। 'কি হয়ে যাচ্ছে!'

খুলে বলল রবিন।

মুখ আবার বন্ধ হলো মুসার। 'তাই বলো।' চিবানো শুরু হলো।

আলোচনা চলল।

রবিন বলল, 'কিশোর, আমার মনে হয় তোমার তোতাপাখি সাজতে পারাটা আমাদের জন্যে একটা ভাগ্যের ব্যাপার। এই ছদ্মবেশে যখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে তুমি, কেউ বাধাও দেবে না, সন্দেহও করবে না।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু খেলার সময় কি করব? জ্যান্ত তোতাপাখি কি কি করে দেখেছি, কিন্তু নকলগুলোর কাজ দেখিনি। কোন পরামর্শ দিতে পারো?'

'নকলের দরকারটা কি? আসলগুলো যা করে তাই কোরো। সেটা বরং ভাল হবে।'

'তোতা তো খালি ডানা নাচায় আর কিঁচকিঁচ করে। মাঝে মাঝে লাফ মারে, ডিগবাজি খায়।'

'তুমিও খাবে,' বিমল হাসিতে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার 'ক্ষতি কি? কেউ তো আর কিলাতে আসবে না।'

সাত

'বৃহস্পতিবার রাতের স্পোর্টস নিউজ শুনুন,' গাড়ির রেডিওতে বলে উঠল একটা পরিষ্কার, জোরাল কণ্ঠ। 'এখন বাজে সাতটা বিশ। আরেকটু পরেই আপনাদেরকে শোরমন্টের জিমনেশিয়ামে নিয়ে যাব। আমি ডিজনি হেকামোর বলছি...'

'ডিজনি হেকামোর?' কান খাড়া করল কিশোর, 'আমাদের কলেজের লেকচারার। একটা ক্লাস করেছি।'

গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন হেকামোর। কথা আটকাচ্ছে না। উচ্চারণ অস্পষ্ট কিংবা বিকৃত হচ্ছে না। 'আজকের খেলা কোস্টা ভারদির সঙ্গে শোরমন্টের। আগে নিউজ শুনুন। তারপর কোস্টা ভারদির কোচ হামফ্রে ভেগাবল আর শোরমন্টের কোচ লভেল ম্যাডিরার সঙ্গে কথা বলব...'

কান খাড়া করে শুনছে তিন গোয়েন্দা।

কোচ লভেল ম্যাডিরা সম্পর্কে আলোচনা চলল।

হেকামোর বললেন, 'কয়েক বছর আগে কোচ ম্যাডিরার যে বদনাম শোনা গিয়েছিল, সেটা আবার শুরু হয়েছে। বোস্টনে বিরাট স্ক্যান্ডাল হয়ে গিয়েছিল তাঁর নামে, যদিও কেউ প্রমাণ করতে পারেনি কিছু। সে যাই হোক, কোচ হিসেবে যে তিনি অসাধারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোস্টা ভারদির কোচ হামফ্রে ভেগাবলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল না। খেলার কোর্টে দু-জনের মধ্যে গোলমাল বেধে গেলে অবাক হব না।'

মুসার গাড়িটা চালাচ্ছে রবিন।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'কিশোর, কি মনে হয় তোমার? শত্রুতাটা কি নিয়ে? ভেগাবল কি ম্যাডিরার ব্যাপারে আসলেই কিছু জানেন?'

'ঠিক বলতে পারছি না। তবে বোস্টনের স্ক্যান্ডাল নিয়ে আজ খানিকটা খোঁজখবর করেছি। খবরের কাগজে লিখেছে, ওখানে নাকি প্লেয়ারদেরকে গোপনে টাকা দেয়া হত। লোকের সন্দেহ ম্যাডিরা দিতেন, কিন্তু সেটা না-ও হতে পারে। দেখা যাক, আজ নতুন কিছু জানতে পারি কিনা?'

'সাবধান থাকবে। ভাঁড়ামি করতে গিয়ে কোস্টা ভারদিকে বেশি বকাবাদ্যি করে ফেলো না। ভীষণ বদমেজাজী ওরা। প্রায়ই মারপিট বাধায়। শোরমন্টের ওপর ওদের বেজায় রাগ।'

রবিনও একমত হলো মুসার সঙ্গে।

শোরমন্টের পেছনে কংক্রীটের তিনতলা পার্কিং গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাল রবিন। র‍্যাম্প বেয়ে উঠে চলে এল একেবারে ওপরতলায়।

গাড়ি থেকে আগে নামল কিশোর।

'খেলার পর দেখা হবে,' বলে গাড়ির সীটে রাখা তোতাপাখি সাজার সরঞ্জাম নিয়ে এলিভেটরের দিকে রওনা হলো কিশোর।

কয়েক মিনিট পর ছোট একটা সাজঘরে ঢুকল। তোতাপাখির পোশাক পরতে শুরু করল। জিমনেশিয়ামে ব্যান্ড বাজছে। চিয়ারলীডারদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

গলা মিলিয়ে চিৎকার করে উঠল একদল দর্শক, 'শোরমন্ট!'

পরমুহূর্তে আরেকদলের চিৎকার, 'কোস্টা ভারদি!'

টি-শার্টের গলায় লাগানো একটা খুদে মাইক্রোফোনে তারের কানেকশন দিল কিশোর। ব্যাটারি কেসে তাজা ব্যাটারি ভরল। আস্তে করে বলল, 'মাইক্রোফোন টেস্টিং ওয়ান টু থ্রী।'

বেজে উঠল তোতার ডানার নিচে লুকানো খুদে স্পীকার।

চলবে। সুন্দর কাজ করছে।

সমস্ত পোশাক পরার পর সবশেষে তোতার ঠোঁট লাগানো মাথাটা মাথায় গলাল সে। গলার সঙ্গে আটকাল। ভাবল, খোদাই জানে কি হবে! সামলাতে না পারলে হাসি আর ব্যঙ্গের খোরাক হতে হবে। যা হবার হবে! দূর করে দিল চিন্তাটা। কাজটা নিয়ে ফেলেছে। পিছানো যাবে না। এখন আর ভেবে লাভ নেই।

লকার রুম থেকে বেরিয়ে জিমনেশিয়ামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত চিৎকার কানে এল তার। তার উদ্দেশ্যেই চিৎকার করছে। চোখের ফুটো দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে।

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল কপালে। আবার ভয় হলো, পারবে তো? কোর্টের সাইডলাইনের কাছে এসে দাঁড়াল। দুটো টীমই কোর্টে ঢুকতে আরম্ভ করেছে।

লম্বা দম নিল কিশোর। যা থাকে কপালে, ভেবে, একছুটে ঢুকে গেল কোর্টের মাঝখানে।

হই-হই করে উঠল দর্শকরা।

তোতাপাখির মত কিঁচকিঁচ করে উঠল কিশোর। শোরমন্টের পক্ষে তোতা সেজেছে, সুতরাং কোস্টা ভারদির প্লেয়ারদের চারপাশে নাচতে নাচতে সরু গলায় সুর করে বলতে লাগল, 'হারবে! হারবে! হারবে!'

ঘুসি মেরে বসল সবচেয়ে কাছের প্লেয়ারটা।

লাফ দিয়ে সরে গেল কিশোর। বলল, 'সময় আছে, সরে যাও। খেলাটেলা বাদ দাও!'

তার কথায় হাসছে আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে শোরমন্টের সমর্থকরা। কোস্টা ভারদির কয়েকজন গাল দিয়ে উঠল।

আরও দু-জন ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে এগোতে শুরু করল কিশোরের দিকে।

তোতার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে। এই সময় কোর্টে ঢুকলেন কোচ হামফ্রে ভেগাবল। জড় হতে ডাকলেন প্লেয়ারদের।

কিছুক্ষণ নাচানাচি করে সাহস বেড়ে গেল কিশোরের। কোস্টা ভারদিকে উদ্দেশ্য করে যা খুশি বলতে শুরু করল। দর্শকরা তাল দিচ্ছে তাকে। চিয়ারলীডারদের চেয়ে তার দিকে নজর বেশি এখন ওদের।

খেলা শুরু হলো

সাইডলাইনে থাকার কথা কিশোরের, তা-ই আছে কিন্তু চিৎকার বন্ধ করছে না। চেঁচিয়ে উঠল, 'নাম্বার থার্টিন, কেন এসেছ বাবা মরতে? বেসিনের কলে মাথা দিয়ে বসে থাকোগে।'

সমস্বরে হেসে উঠল দর্শক।

'এই যে নাম্বার টোয়েন্টি-টু,' আবার বলল কিশোর, 'তুমিই বা খেলতে নেমেছ কেন? বাড়ি যাও। দুদু খাওগে।'

শোরমন্টের চিয়ারলীডারদের ক্যাপ্টেন মলি এসে কিশোরের হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল, 'বেশি বাড়াবাড়ি করছ কিন্তু! কোস্টা ভারদিরা লোক ভাল না। পিটুনি খাবে।'

'কচু করবে,' কিশোর বলল। দর্শকরা তার মাথাটা যেন বিগড়ে দিয়েছে। প্রতিপক্ষকে গালমন্দ করে লোক হাসানোর নেশায় পেয়ে বসেছে। মলির কথা না শুনে আবার সাইডলাইনে এসে মুখে যা আসে তাই বলতে লাগল কোস্টা ভারদিকে উদ্দেশ্য করে।

খেলা শেষ হলো। চার পয়েন্ট বেশি পেয়ে জিতল শোরমন্ট। কিশোরের মনে হতে লাগল, জিতটা যেন তারই হয়েছে, তার জন্যেই জিতেছে শোরমন্ট। চিয়ারলীডার আর কিছু দর্শক দৌড়ে এল তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে।

তোতা সেজে এ ভাবে সফল হবে কল্পনাও করতে পারেনি কিশোর। খুশিমনে এসে ঢুকল আবার লকার রুমে, পোশাক বদলানোর জন্যে।

বদলে নিয়ে রওনা হলো গ্যারেজে, মুসা আর রবিন ওখানেই আসবে। এলিভেটর থেকে বেরিয়েই পড়ল দু-জনের মুখোমুখি। বরফের মত জমে গেল যেন সে। মুসা আর রবিন নয়। অন্য দু-জন।

কোস্টা ভারদির দুই খেলোয়াড়, ১৩ আর ২২, যাদেরকে বেশি ইয়ার্কি মেরেছে সে

মলি সাবধান করেছিল, পিটুনি দেবে। পালানোর পথ খুঁজল কিশোর। নেই। দু-দিক থেকে তার দু-হাত চেপে ধরে এলিভেটরের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে আনল দুই খেলোয়াড়।

চিৎকার করতে গেল কিশোর।

ঘামে ভেজা নোংরা একটা মোজা তার মুখে ঢুকিয়ে দিল একজন।

ভয়াবহ দুর্গন্ধ, বিশ্রী স্বাদ; গলার কাছে বমি ঠেলে উঠল কিশোরের। জিভ দিয়ে ঠেলে মোজাটা বের করার চেষ্টা করল। পারল না। আরও ভেতরে ঠেসে দেয়া হলো ওটা।

'তারপর মিস্টার তোতাপাখি, কেমন লাগছে এখন?' খিকখিক করে হাসল একজন।
হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু অনেক বেশি শক্তিশালী ওরা। তা ছাড়া দু-জন।
ঠেলতে ঠেলতে গ্যারেজের ছাতের নিচু দেয়ালের কাছে তাকে নিয়ে এল ওরা। ২২ নম্বর বলল, 'দেখি, এবার কি বলো?'
দুই পা ধরে তাকে দেয়ালের ওপর দিয়ে উল্টে ধরল ওরা। নিচের দিকে মাথা ঝুলে পড়ল। তিনতলা নিচে কংক্রীটের মেঝে। পড়লে মাথা ছাতু হয়ে যাবে
মারাই যাচ্ছি আমি! ভাবল কিশোর। যে কোন মুহূর্তে এই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিতে হবে, চলে যেতে হবে পরপারে!
'কি, তোতার মুখ বন্ধ কেন? দুদু খাওয়ার কথা আর বলবে না?' হেসে জানতে চাইল ২২।
১৩ নম্বর বলল, 'দিই ছেড়ে। ভর্তা হয়ে যাওয়া মাথাটা বেসিনের কলে ধরে রাখুকগে।'
একটা চিৎকার শোনা গেল।
চমকে গেল কিশোর। এইবার ছেড়ে দেবে ওরা। মারা যাবে সে।
কিন্তু তার বদলে দ্রুত তাকে দেয়ালের ওপর দিয়ে তুলে আনা হলো। মেঝেতে ছেড়ে দিল দুই খেলোয়াড়। ধপ করে পড়ল সে কঠিন ছাতে। ব্যথা পেল কোমরে।
মুসাকে দেখতে পেল চোখের কোণ দিয়ে।
কারাতের চিৎকার করে ২২ নম্বরকে হাতের একধার দিয়ে কোপ মারল মুসা। পড়ে গেল খেলোয়াড়।
ঠিক এই সময় আরেক দিক থেকে ছুটে এল রবিন। মেরে বসল ১৩ নম্বরকে।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। সে-ই বা বসে থাকে কেন? মোজাটা মুখ থেকে খুলে ফেলেছে আগেই। মার খেয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকা ১৩ নম্বরের মুখে গুঁজতে এগোল।
তিনজন বনাম দু-জন। তা ছাড়া কারাত কিংবা জুডো জানে না কোস্টা ভারদির দুই প্লেয়ার, বোঝা গেল। মার খেয়ে আধমরা হওয়ার আগেই হাল ছেড়ে দিল। কোনমতে তিন গোয়েন্দার কবল থেকে মুক্ত হয়ে দৌড় দিল দু-জন দু-দিকে।
কিশোরের কাঁধে হাত রাখল রবিন, 'ঠিক আছ তুমি?'
ঘামে ভেজা কপাল মুছতে মুছতে নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
'চলো, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই,' মুসা বলল।
গাড়ির দরজা খুলেই থমকে দাঁড়াল সে। সীটের ওপর পড়ে আছে আরেকটা খাম।
'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না!' চিৎকার করে বলল কিশোর, 'আঙুলের ছাপ!'

হাত সরিয়ে আনল মুসা। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে একজোড়া দস্তানা বের করে পরল। তুলে নিল খামটা।

'আরও টাকা?' মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে এল রবিন।

'এবং আরেকটা নোট,' কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল মুসা।

জোরে জোরে পড়ল কিশোর। নোটে লেখা:

শোরমন্টের জন্যে খেলতে থাকো। জেতার দিকে খেয়াল রাখবে। ভাল পুরস্কার পেতে থাকবে তাহলে। উপভোগ করতে পারবে জীবনটা।

আট

'এ কেসটা আমার খুব পছন্দ, কিশোর।'

পরদিন সকালে বলল মুসা। ওদের বাড়িতে রান্নাঘরের টেবিলে পা তুলে দিয়ে বসে আছে। হাতে ইয়াবড় এক কলা। অর্ধেকটা ইতিমধ্যেই মুখে পুরে দিয়েছে।

কিশোর একটা বার্গার চিবাচ্ছে। বলল, 'কিন্তু আমি এর মধ্যে কোন মজা পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না বলছি। কলেজের ক্লাসগুলো করতে আর ভাল্লাগছে না। বিরক্তিকর সব সাবজেক্ট, আমার পছন্দ মত হচ্ছে না। তেমন কোন ফল পাচ্ছি না বলে আরও বিরক্তি লাগে।

'কেসটার কোন উন্নতি হচ্ছে না। কাল রাতে নোটগুলো আর চিঠিটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে খুঁটিয়ে দেখেছি। কষ্টই সার, কিচ্ছু পাইনি।

'একটাই কাজ বাকি। আজ গিয়ে ম্যাডিরার অফিসের টাইপরাইটারটা পরীক্ষা করা। টাইপফেসগুলো দেখে বোঝার চেষ্টা করব, যে চিঠিগুলো তোমাকে পাঠানো হয়েছে, ওটা দিয়েই টাইপ করেছে কিনা।

'একটা ব্যাপারে এখন শিওর, যে লোকটা তোমাকে টাকা পাঠিয়েছে সে ধরে নিয়েছে তুমি তার প্রস্তাবে রাজি। তোমার গাড়িটা সে চেনে।'

টেবিল থেকে পা নামিয়ে ঝুঁকে বসল মুসা। মুখ মুছল। তাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কেসটা তোমার এত ভাল লাগছে কেন?'

'গত সোমবারে তিন হাজার ডলার জমা দিয়ে এলাম ব্যাংকে। আজকে নিয়ে গেলাম আরও এক হাজার। ক্লার্ক মেয়েটার মুখটা যদি দেখতে। আরেকটু হলেই উল্টে দিয়েছিল। নিশ্চয় অবাক হয়ে ভাবছিল, আমি এত টাকা কোথায় পেলাম?'

বার্গারের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে দিল কিশোর। 'অত খুশি হওয়ার কিছু নেই। টাকাটা ফেরত দিতে হবে, মনে রেখো...'

এই সময় ফোন বাজল।

'আমি ধরছি!' অন্য ঘরে বসে থাকা মায়ের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে রান্নাঘরের কর্ডলেস ফোনটা তুলে নিল মুসা। 'হালো?'

ওপাশের কথা শুনে কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে ইঙ্গিত করল মুসা। কণ্ঠস্বর নামিয়ে ফোনে বলল, 'হ্যাঁ, আমিই বলছি।...হ্যাঁ, চিঠি, টাকা, সব পেয়েছি।'

চোখ বড় বড় করে মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। হাঁ হয়ে গেছে। ওপাশের কথা শুনতে পাচ্ছে না বলে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

'হ্যাঁ, দেখা করতে আপত্তি নেই,' মুসা বলল। 'কোথায় করতে হবে? কখন?'

ওপাশের কথা শুনল সে। মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, চিনি। এক ঘণ্টার মধ্যে?'

দম বন্ধ করে ফেলেছে কিশোর। জোরে জোরে মাথা নাড়ল। দুই আঙুল তুলে বুঝিয়ে দিল দুই ঘণ্টা বলার জন্যে।

'এক ঘণ্টায় তো পারব না, কাজ আছে,' জবাব দিল মুসা। 'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আসি?...ঠিক আছে, থাকব।'

লাইন কেটে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কে? ম্যাডিরা?'

'জানি না,' ভয় আর রাগ একসঙ্গে ফুটল মুসার চোখের তারায়। 'একবার মনে হয় ম্যাডিরা, আবার মনে হয় তিনি নন। তবে খুব আন্তরিক। কিশোর, কলেজ স্পোর্টসের সমস্ত নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করছে এই লোকটা। এমন ভাব করল, যেন কত দিনের বন্ধু আমরা।'

'ভাল। এর মানে সে ধরে নিয়েছে তার কথা মত কাজ করতে রাজি হয়েছ তুমি। খুলে বলো সব।'

'জিজ্ঞেস করল, কাল রাতে খামটা পেয়েছি কিনা। বলল, কথা মত কাজ করলে আরও পাব। এত বেশি, কল্পনাই করতে পারব না। রসিকতা মনে হচ্ছে।'

'তারপর?'

'বলল, সামনাসামনি দেখা করে কথা বলার সময় হয়েছে আমাদের। কোথায় দেখা করতে হবে বলল। কোস্ট হাইওয়ে থেকে মিনিট দশেকের পথ উত্তরে। তুমি দুই ঘণ্টা সময় চাইলে কেন?'

'কারণ তোতাপাখির পোশাকে যে কর্ডলেস মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করেছি ওটাকে কাজে লাগাতে চাই। একটা পোর্টেবল ট্র্যান্সমিটারে যুক্ত করে দিতে পারলে...'

'তারমানে আমাকে ট্র্যান্সমিটার বানাবে যাতে কথাবার্তা সব শুনতে পাও। বানাও, তোমার ইচ্ছে।'

'চলো, ইয়ার্ডে যাই। ওঅর্কশপে আছে সবকিছু।'

দুই ঘণ্টা পর প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়েতে মোড় নিল মুসা। তার বিশাল ক্যাডিলাকটার ট্রাংকে লুকিয়ে আছে কিশোর। হাতে একটা রেডিও রিসিভার। ট্র্যান্সমিটারের ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে টিউন করা। মুসা কোন কথা বললেই রেডিওর স্পীকারে বেজে উঠছে সেটা।

'কিশোর, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' মুসা বলল। 'বাপরে বাপ, আমার বুকের মধ্যে এতসব যন্ত্রপাতি আটকে দিয়েছ, দশ মণ ওজন লাগছে এখন। টেপগুলো চড়চড় করছে। দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। একটা পোরশে নাইন-ওয়ান-ওয়ান টারগা। নীল রঙের। কয়েকজন লোক দেখছে গাড়িটাকে। দেখার মতই জিনিস। একজন লোক গাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে আরেক দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় ওই লোকই আমাদের লোক। মাঝারি উচ্চতা। বয়েস তিরিশ-বত্রিশ হবে। পরনে নীল বিজনেস শার্ট, টাই আছে। হাতা গোটানো। আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছে। গাড়ি থামালাম। এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমিও নামছি।'

গাড়ি থেকে নামল সে। সানগ্লাসটা খুঁলে ছুঁড়ে ফেলল সীটের ওপর।

'এই যে, মুসা,' নিজের সানগ্লাস খুলল লোকটা, হাত বাড়িয়ে দিল।

ধরে ঝাঁকিয়ে দিল মুসা। দেখল লোকটার চোখ নীল।

'গাড়িতে বসে কথা বলতে চাও? নাকি বাইরে?'

'বাইরেই তো ভাল,' জবাব দিল মুসা।

'বেশ।' আবার সানগ্লাস চোখে লাগাল লোকটা। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল পথের পাশে রেলিঙের ধারে, যেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর দেখা যায়। 'দুটো কথা বলে নিই আগে। এক, ধরে নিচ্ছি বাস্কেটবল প্লেয়ার হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছে আছে তোমার

'কোচ লভেল ম্যাডিরার পক্ষ থেকে কথা বলতে এসেছেন?'

হাসল লোকটা। 'দুটো কথার একটা বলেছি। দ্বিতীয়টা হলো, কোন প্রশ্ন করবে না। এই কথাটাই বরং প্রথমে বলা উচিত ছিল। যাকগে। তোমার যতটা জানা প্রয়োজন ততটাই বলব।'

এত শান্ত থাকছে কি করে লোকটা? ভাবছে মুসা। নিশ্চয় এ ভাবে গোপনে বহুজনের সঙ্গে বহুবার কথা বলেছে। অভ্যাস হয়ে গেছে।

'তোমার সঙ্গে ফোনে হয়তো আরও কথা বলতে হবে, দেখা করতে হবে, সেই জন্যে আমার একটা নাম জানা দরকার তোমার। ধরা যাক, নামটা মাইকেল অ্যান্থনি।' শব্দ করে হাসল লোকটা। 'বুঝতেই পারছ, আমার আসল নাম নয় এটা। ধার করা। মাইকেল অ্যান্থনি কে ছিল জানো আশা করি পুরানো টিভি শো-র একটা চরিত্র। এক মস্ত ধনীর কাজ করত। মানুষকে লক্ষ লক্ষ ডলারের চেক দিত সেই কোটিপতি। অ্যান্থনি ছিল তার দূত। যাদেরকে টাকা দিত, তাদের কাউকে বলত না সে, টাকাটা কে দিচ্ছে।'

'হুঁ!'

'আমিও একজনের হয়ে কাজ করছি, মুসা। এবং কখনও বলব না কার হয়ে। তুমিও জিজ্ঞেস করবে না। ঠিক আছে?'

'হুঁ!'

'গুড।' এক প্যাকেট চিউয়িং গাম বের করল অ্যান্থনি। 'সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা করছি। সে-জন্যে সারাক্ষণ এগুলো চিবাই। নেবে একটা?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না।' তারপর বলল, 'দিন।' ভাবল, মোড়কে লোকটার আঙুলের ছাপ পড়বে।

লাভ হলো না। প্যাকেটটা সিগারেটের প্যাকেটের মত করে বাড়িয়ে ধরল অ্যান্থনি। একটা গাম মুসাকে বের করে নিতে হলো।

'শোরমন্টের হয়ে বাস্কেটবল খেলার জন্যে অনেক টাকা দিতে রাজি ওই লোক,' অ্যান্থনি বলল। 'তোমার মত খেলোয়াড় দরকার শোরমন্টের। আমাদের দুটো পেমেন্ট গ্রহণ করেছ তুমি। সুতরাং ধরে নিচ্ছি আমাদের প্রস্তাব মানতে তুমি আগ্রহী। সত্যি বলছি, যা দিয়েছি, চার হাজার ডলার, এটা কিছুই না।'

ঢোক গিলল মুসা। আরেকটু হলে গামটা গিলে ফেলেছিল।

'এরপর কি দেয়া হবে কল্পনাই করতে পারছ না তুমি। এইটাই আমার বসের রীতি। চমকে দেয়া। যত ভাল খেলবে তুমি, তত ভাল পেমেন্ট পাবে।'

'এর জন্যে শুধু বাস্কেটবলই খেলতে হবে আমাকে? আর কিছু না?'

'ভাল খেলতে হবে তোমাকে, একজন স্টার প্লেয়ারের মত। ক্রমাগত উন্নতি করতে হবে। এ ব্যাপারে তোমাকে তেমন সাহায্য করতে পারব না আমরা। মাঝেসাঝে কোর্স বাতলে দিতে পারব কেবল। আমাদের সঙ্গে যা আলোচনা হবে, কাউকে বলতে পারবে না। মা-বাবা, ভাই, বন্ধু, কাউকে না। টীমের কাউকেও না। আমি কে, টাকা কে দিচ্ছে জানার চেষ্টা করতে পারবে না কখনও। বুঝলে কিছু?'

'বুঝতে পারছি না কি বলব!' কিশোরের নির্দেশ পালন করছে মুসা। কিশোর বলে দিয়েছে, আলোচনাটা যতটা সম্ভব দীর্ঘ করতে। কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠছে অ্যান্থনি। বেশিক্ষণ আর সময় দেবে বলে মনে হয় না।

'মুসা, ভাবার অনেক সময় পেয়েছ তুমি। ভেবে দেখো, কলেজে যারাই খেলে সবাই চায় এন-বি-এতে খেলতে। বাস্কেটবল প্লেয়ারের কাছে এটা একটা স্বপ্ন। কারণ একমাত্র ওখানে যেতে পারলেই খ্যাতি আর টাকা আসে হুড়মুড় করে। হাজার হাজার প্লেয়ারের মধ্যে প্রতি বছর কয়জন ঢোকার সুযোগ পায় জানো?'

'শ-খানেক?'

'পঞ্চাশ। অনেক বেশি স্মার্ট হতে হবে তোমাকে। অনেক ভাল খেলোয়াড়। তোমাকে খুব ভাল খেলোয়াড়ই মনে হয় আমার। একটা বাস্কেটবল টীম রিক্রুট করছি আমরা। যাদের এন-বি-এতে ঢোকার সুযোগ করে দেয়া হবে। এবার বলো, তুমি কি আছ এর মধ্যে, নাকি নেই?'

'থাকাই তো উচিত। ভাবার জন্যে আরও কয়েকটা দিন সময় দেবেন?'

মিনিটখানেক নীরবে চিউয়িং গাম চিবাল অ্যান্থনি। তারপর বলল, 'সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন মনে হচ্ছে, তাই না?'

মুসার হাত ধরে পোরশে গাড়িটার কাছে টেনে নিয়ে এল সে। 'গাড়িটা

দেখো। কি গাড়ি?'
'পোরশে। টারগা।'
'হ্যাঁ। আনকোরা নতুন নয়, বুঝতে পারছ।'
'পারছি। মডেলটাও পুরানো। ছিয়াশি।'
'হ্যাঁ। গাড়ি সম্পর্কে জ্ঞান আছে। এই নাও চাবি।'
অ্যান্থনির হাতের দিকে তাকাল মুসা। রোদ লেগে ঝিক করে উঠল তালুতে রাখা চাবি।
'মানে?'
'গাড়িটা তোমাকে দেয়া হলো। আপাতত ধার হিসেবে। তবে প্রস্তাবে রাজি হলে, কথা রাখতে পারলে, এটা তোমার হয়ে যাবে। ভাবার জন্যে তোমাকে একদিন সময় দিলাম। কাল ফোন করব। যাও, গাড়িটা নিয়ে ঘোরাঘুরি করো।'
'ও চলে যাচ্ছে, কিশোর,' নিচু স্বরে বলল মুসা। 'নতুন একটা থান্ডারবার্ড গাড়িতে উঠছে। লাইসেন্স নম্বর দেখতে পাচ্ছি না। পোরশেতে উঠতে যাচ্ছি। না না, তোমাকে আগে ট্রাংক থেকে বের করা দরকার।'
গাড়ি চালিয়ে অ্যান্থনি চলে যাওয়ার পর ছুটে এসে ক্যাডিলাকের ট্রাংকের কাছে দাঁড়াল মুসা। ডালা খুলে দিল।
বেরিয়ে এল কিশোর। হাত-পা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'উফ্, জ্যাম হয়ে গেছে সব।'
'গাড়িটা দেখছ? বিশ্বাস হয়?'
পোরশের দিকে তাকিয়ে আনমনে বলল কিশোর, 'অনেক বড় ঘুষ!'
'চলো, হাওয়া খেয়ে আসি। পোরশেতে চড়ার মজা তুমি জানো না।'
'মজাটজা পরে। আগে লোকটার পিছু নিতে হবে। ও চলে যাচ্ছে।'
'পিছু নেব?' কিশোরের কথা বুঝতে পারছে না যেন মুসা।
'হ্যাঁ, মাইকেল অ্যান্থনির কথা বলছি। ও কোথায় যায় দেখতে হবে।'
'ঠিক! তাই তো! জলদি ওঠো গাড়িতে!'
পোরশের ড্রাইভিং সীট খুলে উঠে বসল মুসা। দৌড়ে অন্যপাশে এসে প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা খুলল কিশোর। মুসাকে তাড়াহুড়ো করে নামতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো? আবার নামছ কেন?'
'সানগ্লাসটা নিয়ে আসি।'
ছুটে গিয়ে ক্যাডিলাকের সীট থেকে সানগ্লাসটা নিয়ে এল মুসা। পোরশের ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। মুহূর্তে গর্জে উঠল ২৪৭-হর্সপাওয়ার ইঞ্জিন।
'ক্যাডিলাকটার কি হবে?' পেছনে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'আপাতত পচুক। অত সস্তা গাড়ি দিয়ে কি করব?'

নয়

'কি হলো? চালাও না! চলে যাচ্ছে তো!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

'দাঁড়াও, আগে দেখে নিই,' ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা, 'কোনটা কোনখানে আছে।'

ড্যাশবোর্ডে অসংখ্য বোতাম। দেখতে দেখতে বলল সে, 'কিশোর, জানো, পোরশে কিনে প্রথমেই কেন বেশির ভাগ লোক অ্যাক্সিডেন্ট করে? এর অনেক কিছুই উল্টোপাল্টা। সাধারণ গাড়ির মত নয়।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এখন বুঝতে পারছি এত ভাল গাড়ি হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোকেরা কেন এই জিনিস চালাতে চায় না।'

আচমকা লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি। এত জোরে পেছনে ধাক্কা খেল কিশোর, চামড়ায় মোড়া নরম গদি না হলে শিরদাঁড়াই ভেঙে যেত মনে হলো তার। বনবন করে ঘুরছে চাকা। আলগা পাথর, খোয়া আর বালিতে কামড় বসাতে দেরি হলো না। রকেটের মত ছুটল প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে।

'খাইছে!' দ্রুতহাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে, গিয়ার বদলে গতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল মুসা। 'ক্যাডিলাকটা চালিয়ে অভ্যাস, ওটার মতই অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরেছিলাম।'

মসৃণ, তীব্র গতিতে ছুটছে পোরশে। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। এই দেখছে সামনে একটা গাড়ি, পরক্ষণেই সেটা পেছনে।

'মাইকেল অ্যান্থনির পিছু নিতে বলেছি তোমাকে,' মুসাকে সাবধান করল সে। 'তাকে ডিঙিয়ে যেতে নয়।'

'উঁ?' অন্য জগতে চলে গেছে যেন মুসা।

'রঙ কি ওর গাড়িটার, বলো তো?'

'কালো। থান্ডারবার্ড। ব্র্যান্ড নিউ।' জবাব দিল মুসা। আরও গতি কমাল পোরশের।

এইবার সামনে ঝোঁকার সাহস পেল কিশোর। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট হাতড়াল, কোন ম্যাপ বা কাগজপত্র পেল না। 'রেজিস্ট্রেশন নেই। কার গাড়ি ছিল এটা কে জানে। লাইসেন্স প্লেটের নম্বর চেক করলে হয়তো জানা যাবে। মাইকেল অ্যান্থনি কে, কার হয়ে কাজ করছে তা-ও হয়তো জানতে পারব। যদিও যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। পরিচয় ঢাকার সব রকম ব্যবস্থা নেবে ওরা।'

'ওই যে, সামনে।'

'বেশি কাছে যেয়ো না,' কালো গাড়িটা চোখে পড়তে মুসাকে সতর্ক করল কিশোর। 'আমরা যে পিছু নিয়েছি যেন বুঝতে না পারে।'

'পারবে না। সারাদিন ধরে চালাক ও, কোন অসুবিধে নেই। পিছে লেগে

থাকব। চালাতে যে কি মজা লাগছে!'

আরাম করে সীটে হেলান দিয়ে মুহূর্তের জন্যে ভাবনার জগতে চলে গেল কিশোর। কল্পনা করল, রকি বীচের বন্ধুরা এখন ওদেরকে এই গাড়িতে দেখলে কি ভাববে, কোন চোখে তাকাবে।

'মোড় নিচ্ছে, দেখো,' কল্পনা থেকে কিশোরকে বাস্তবে নিয়ে এল মুসা। 'ওশনসাইড কান্ট্রি ক্লাবে ঢুকছে।'

'ইনটারেস্টিং। এই এলাকার সবচেয়ে দামী ক্লাব ওটা।'

'কি করব? ঢুকব?'

'ঢোকো।'

দীর্ঘ ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে, গাছে ঢাকা বিশাল এক সাদা বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখল মুসা। বাড়ির পেছনে একরের পর একর জায়গা জুড়ে রয়েছে বড় বড় গাছ, টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল আর একটা ১৮-হোল গলফ কোর্স।

জানালার কাঁচ নামিয়ে হাতের ইশারায় একজন পার্কিং অ্যাটেনডেন্টকে ডাকল মুসা।

কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এইমাত্র যে কালো থান্ডারবার্ড গাড়িটা ঢুকল, তাতে কে আছে বলতে পারবেন?'

'সরি,' জবাব দিল লোকটা, 'আজই চাকরি নিয়েছি। কাউকে চিনি না।'

'হুঁ,' মুহূর্তে ভঙ্গি বদলে ফেলল কিশোর, ভান করল, যেন এই ক্লাবে বহুবছর ধরে যাতায়াত আছে। 'আমার বাবার এক বন্ধুর মত লাগল তাকে দেখি, দেখা করে আসি।'

'যান।' একটা টিকেট মুসার হাতে ধরিয়ে দিল অ্যাটেনডেন্ট। গাড়িটা দেখতে দেখতে বলল, 'দারুণ গাড়ি!'

'থ্যাংকস,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'ইঞ্জিনটাও দেখতে চান?'

'ফালতু কথা বাদ দাও তো,' ধমক দিল কিশোর। 'এসো।'

অনেক বড় একটা লবিতে ঢুকল ওরা। চেয়ার, কাউচ, সুগন্ধী ফুলের ছড়াছড়ি। মোলায়েম মিউজিক বাজছে।

পুরু কার্পেট মাড়িয়ে ডাইনিং রুমের দিকে এগোল দু-জনে। সাজিয়ে-গুছিয়ে ঘরটাকে যতটা সম্ভব সুন্দর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল কিশোর। 'ওকে দেখা যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' পিছিয়ে এল মুসা। মাথা নেড়ে ইশারা করল।

জানালার কাছে একটা টেবিলে বসেছে মাইকেল অ্যান্থনি। টেবিলে মুখোমুখি বসেছে একজন সুন্দরী তরুণী। উজ্জ্বল সবুজ রঙের পোশাক। লালচে চুল।

'ওরই চাকরি করে হয়তো অ্যান্থনি,' অনুমান করল মুসা।

যেন তার কথার জবাবেই টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেয়েটার একটা হাত ধরল অ্যান্থনি, অর্থাৎ তার বস্ যে নয় বুঝিয়ে দিল।

'নাহ্, সে-রকম লাগছে না,' মাথা নেড়ে বলল কিশোর। 'তবু, বলা যায়

না, আমাদের কেসের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতেও পারে।'

কিশোরের গায়ে খোঁচা মেরে মুসা বলল, 'কে জানি আসছে! ম্যানেজার না তো?'

ফিরে তাকাল কিশোর, 'কি জানি। কিন্তু আর থাকা যাচ্ছে না। কৈফিয়ত দিতে হবে। খেতে বসতে পারলে ভাল হত চিংড়ির গন্ধটা দারুণ লাগছে।'

'টাকা কোথায়? এককাড়ি টাকা লাগবে এখানে বসলে।

বাইরে বেরিয়ে পোরশের কাছে ফিরে এল দু-জনে অ্যান্থনির বেরোনোর অপেক্ষা করতে লাগল। দরজার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। মুসা চালু করে দিল রেডিওটা। গ্রাফিক ইকুয়ালাইজার অ্যাডজাস্ট করল

'ছয়টা স্পীকার,' বলল সে।

কান দিল না কিশোর। বলল, 'রেডি হও। আমাদের লোক আসছে

তরুণীর হাত ধরে ক্লাবহাউস থেকে বেরিয়ে এল অ্যান্থনি। কিন্তু আলাদা আলাদা গাড়িতে উঠল।

'কার পিছু নেব?' জানতে চাইল মুসা।

'অ্যান্থনির,' জবাব দিল কিশোর।

দক্ষিণ পাশ দিয়ে রকি বীচ পেরিয়ে এল ওরা, সান্তা মনিকা এবং এল-পোরটো বীচ পেরোল। তারপর মেইন রোড থেকে নেমে ছোট ছোট কয়েকটা পথ পার হয়ে এসে দাঁড়াল পাথরে তৈরি দেয়ালে লাগানো একটা লোহার খিলানের সামনে। পিতলের প্লেটে লেখা রয়েছে:

কোস্টা ভারদি কলেজ

দ্রুত নানা রকম ভাবনা খেলে যাচ্ছে কিশোরের মগজে। তার মনে হচ্ছে, বহুদিন সাগরে দিশাহীন ঘুরে বেড়ানোর পর কুলের হদিস পেয়েছে।

'কোস্টা ভারদি! শোরমন্টের এক নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী!' আপনমনে বিড়বিড় করল সে।

সামনে তাকিয়ে আছে মুসা। কালো থান্ডারবার্ডকে অনুসরণ করছে

'চমৎকার একটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি,' বলে চলেছে কিশোর। 'ধরা যাক, কোস্টা ভারদির হয়ে কাজ করছে মাইকেল অ্যান্থনি। হয়তো হামফ্রে ভেগাবলের দূত সে। ম্যাডিরার কাস্কের গুজবকে কাজে লাগিয়ে শোরমন্টের প্লেয়ারদের সুনাম নষ্ট করতে চাইছে স্ক্যান্ডাল করে।'

'ম্যাডিরারও তাই ধারণা,' মুসা বলল। 'কাল রাতে টিভিতে ইন্টারভিউ দিয়েছেন।'

'তাই? আমি দেখিনি। আর কি বলেছেন?'

'ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাঁকে আর শোরমন্টের টীমকে ধ্বংস করে দেয়ার তালে আছেন ভেগাবল।'

'হুঁম!' একটা দীর্ঘ মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল কিশোর। 'হতে পারে, একটা স্কুলেই সীমাবদ্ধ নয় এই ঘুষের ব্যাপারটা। আরও অনেক স্কুলকে শেষ করতে চাইছে। সবার সঙ্গেই দূতিয়ালী করছে অ্যান্থনি।'

বুঝতে পেরে নিচের চোয়াল প্রায় ঝুলে পড়ল মুসার।

'এখনও নিশ্চিত নই আমি, মুসা। সম্ভাবনার কথা বলছি কেবল।'

'কিন্তু বিরাট সম্ভাবনা। সাংঘাতিক পরিকল্পনা।'

'গাড়ি থামাও। নামতে হবে।'

হেঁটে চলেছে অ্যান্থনি। তাকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।

হঠাৎ একটা গাছের জটলার মধ্যে থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'অ্যাই ব্যাটা কোঁকড়া চুল!'

ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে চারজন। দু-জনকে চিনতে পারল।

মুসাও চিনেছে। সেই দুই খেলোয়াড়, ১৩ আর ২২, যারা কিশোরকে পিটাতে চেয়েছিল আগের রাতে।

হাতের বইখাতা তাড়াতাড়ি গাছের গোড়ায় নামিয়ে রেখে পা বাড়াল চারজনে।

২২ নম্বর বলল, 'আজ কোঁকড়াটার দাঁতগুলো সব রেখে দেব।'

'মুসা,' নিচু গলায় বলল কিশোর, 'চারজনের সঙ্গে পারব না। দৌড় দাও।' বলেই ঘুরে দৌড় মারল সে।

মুসাও তার পিছু নিল। পেছনে ছুটে আসছে পায়ের শব্দ।

গাছের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে দিক ভুলে গেল কিশোর। পোরশেটা কোথায় আছে, বুঝতে পারছে না। তবে গতি কমাল না। ছুটছে জানপ্রাণ দিয়ে।

পেছনে যারা আসছে তারা বাস্কেটবল খেলোয়াড়। খুব ছুটতে পারে। ওদের সঙ্গে পারল না কিশোর। পেছনে তাকিয়ে দেখল তিনজন আসছে। মুসা নেই। চতুর্থ ছেলেটাও নেই।

কিশোরকে ধরে ফেলল ওরা। কোন বিচার-আচার নেই। ধরেই দমাদম কয়েকটা কিল-ঘুসি। তারপর কলার ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে এল একটা ডাস্টবিনের কাছে। তারের জালিকাটা ডাস্টবিন তার মধ্যে ঠেসে ভরল কিশোরকে ঢাকনা লাগিয়ে দিয়ে বলল একজন, 'নাও, থাকো এখানে। তোতার ডাক ডাকো। পায়খানা-পেচ্ছাপ করে ভরে ফেলো না যেন, নিজেই গন্ধে মরবে শেষে।'

কিশোরের টিটকারির শোধ নেয়া হয়েছে। হাসাহাসি করতে করতে চলে গেল কোস্টা ভারদির তিন ছাত্র।

রাগে, দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে কিশোরের। খুব অপমান লাগছে। কি ভাবে প্রতিশোধ নেয়া যায় ভাবছে।

পাশে এসে থামল পোরশে। গাড়ি থেকে নেমে এসে ঢাকনা খুলে দিল মুসা। কিশোরকে বেরোতে সাহায্য করল।

মুসার ঠোঁটের একটা কাটা থেকে রক্ত ঝরছে।

'তুমিও মার খেয়েছ নাকি?' জানতে চাইল কিশোর। 'একজনের সঙ্গেই পারলে না?'

'পেরেছি। বেদম পিটিয়েছি। তুমি?'

ফুঁসে উঠল কিশোর. 'সেটা আবার জিজ্ঞেস করে! তুমিই তো উৎসাহ দিয়েছিলে সেদিন. বলেছ. কেউ কিলাতে আসবে না। যাকগে। মাইকেল অ্যান্থনি কোথায়?'

'কি করে জানব? আমিও তো তোমার সঙ্গে দৌড় ওকে হারিয়ে ফেলেছি। এখানে আর এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

দশ

'মাইকেল অ্যান্থনি বলেছে আজ ফোন করবে। সুতরাং আমাদের এখানে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই.' কিশোর বলল। মুসাদের রান্নাঘরে বসে একটা টেপরেকর্ডারের সঙ্গে একটা কর্ডলেস ফোনের কানেকশন লাগাচ্ছে।

টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে দুই হাতের তালুতে থুঁতনি রেখে কিশোরের কাজ দেখছে রবিন।

'কিন্তু কিশোর. শনিবারের সকালে ঘরে বসে থাকব?' ড্রাইভওয়েতে রাখা নীল পোরশে গাড়িটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'গাড়িটা ওখানে রাখা নিরাপদ নয়।'

মুসার এই হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তনে অবাক হলো কিশোর. 'কি বললে?'

'কাল সারাটা রাত কতজনে যে ফোনে অনুরোধ করল. গাড়িটা একবার চালাতে দিতে. অর্ধেককেই চিনি না। পেলাম কোথায় জিজ্ঞেস করল বাবা-মা। বললাম একটা কেসে কাজ করছি। কি বলল জানো?'

'কি?' জানতে চাইল রবিন।

'গাড়িটা চালাতে দিতে। সবাই চালাতে চায় গাড়িটা।'

'আমিও চাই।'

চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা. 'তুমিও! এই জন্যেই বুঝি আজ নজের অফিসে না গিয়ে এখানে বসে আছ?'

'নজের কথায় মনে পড়ল. তিনি গাড়িটার কথা শুনেছেন—তিনিও চালাতে চান।'

হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিল মুসা. এই সময় বাজল ফোন।

'বোধহয় ওই লোকই!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর. চালু করে দিল টেপরেকর্ডার। 'যত বেশি সম্ভব কথা বলাবে তাকে দিয়ে। সে-ই এখন আমাদের একমাত্র সূত্র।'

স্পীকারের সুইচ অন করল মুসা। রিসিভার কানে ঠেকাল। কিন্তু নিরাশ হলো তিনজনেই। লেক টাহোই থেকে ফোন করেছে জিনা। কেসের খবর জানতে চায়।

চেয়ারে বসে পড়ল আবার কিশোর।

সংক্ষেপে জানাল মুসা।

পোরশে গাড়িটার কথায় আসতেই জিনা বলল, 'লাইন খারাপ না তো? ভুল শুনলাম? পোরশে!'

'হ্যাঁ, পোরশে এইটি সিক্স মডেল, নাইন-ওয়ান-ওয়ান টারগা। নীল রঙ।'

'বলো কি!'

'ঠিকই বলছি বাস্কেটবল খেলার জন্যে ঘুষ

এক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল জিনা তারপর অনুরোধ করল, 'মুসা, আমার জন্যে যদি সামান্যতম দরদও থাকে আমি না ফেরা পর্যন্ত কেসটা শেষ কোরো না। কিশোরকেও বোলো। ওই গাড়ি আমি একবার চালিয়ে দেখতে চাই।'

রিসিভার রেখে দিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা গুঙিয়ে উঠল, 'দেখলে তো অবস্থা! এটাকে এখন বিদেয় করতে পারলে বাঁচি!'

দশটা বেজে পনেরো মিনিটে আবার বাজল ফোন ছোঁ মেরে তুলে নিল মুসা এবারও হতাশ হতে হলো লজের অফিস থেকে করেছে তাঁর সেক্রেটারি। গাড়িটার কথা শুনেছে চালাতে আগ্রহী

তৃতীয়বার রিঙ হলো এগারোটায়। মুসা আর তুলল না। জবাব দিল কিশোর। অন্য পাশের কথা অবাক করল তাকে শোরমন্ট কলেজের প্রেসিডেন্ট ডেভন কলিন।

'কিশোর, আজ বিকেল চারটেয় আমার অফিসে আসতে পারবে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'পারব,' বলে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর।

মুসা মাথা ঝাঁকাল, রবিন মাথা নাড়ল সে-কথা প্রেসিডেন্টকে জানাল। ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিলেন তিনি।

মাইকেল অ্যান্থনি কখন ফোন করবে সেটা এক উত্তেজনা, এখন আরেকটা উত্তেজনা যোগ হলো— কেন দেখা করতে বলেছেন প্রেসিডেন্ট? জরুরী তলব কেন? আগামী পাঁচটা ঘণ্টা এখন এই উত্তেজনা নিয়ে কাটাতে হবে ওদের।

বসেই আছে ওরা, বসেই আছে, কিন্তু ফোন আর বাজে না। বেলা দুটোর দিকে মহাবিরক্ত হয়ে মুসা বলল, 'আমি আর বসে থাকতে পারছি না। বেরোব। চলো তোমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি

'আমারও সন্দেহ হচ্ছে এখন, ফোন করবে না,' কিশোর বলল 'কালকে যে পিছু নিয়েছিলাম বোধহয় দেখে ফেলেছে '

'হয়তো।' স্বস্তি ফুটল মুসার মুখে। আর কোন টেনশন নেই, বেরোতে পারবে এবার। 'আমি আর এক মিনিটও বসছি না।' পকেট থেকে পোরশের চাবি বের করে শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নিল আবার

'লজের ওখানে নামিয়ে দিয়ো আমাকে,' রবিন বলল। 'আজ সারারাত কাজ করতে হবে। কালও ছুটি পাব না। সোমবারেও না '

বেরিয়ে এল তিনজনে। গাড়িতে চড়ল। রবিনকে লজের অফিসে নামিয়ে

দিয়ে কিশোরকে নিয়ে ঘুরতে বেরোল মুসা। চারটে বাজতে এখনও অনেক দেরি। সময় কাটাতে হবে।

অবশেষে সময় হলো। শনিবারের এই বিকেল বেলা শান্ত, নীরব হয়ে আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং। অফিসে ডেস্কের ওপাশে প্রেসিডেন্টকে বসে থাকতে দেখল মুসা আর কিশোর। সামনে বসা আরেকজন ভদ্রলোক।

'এসো,' ডাকলেন প্রেসিডেন্ট। পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি মিস্টার ব্র্যানসন বার।'

নামটা মনে পড়ল কিশোরের। নতুন জিমনেশিয়ামের জন্যে টাকা খাটাতে চান।

উঠে দাঁড়ালেন বার। বেঁটেই বলা চলে। কালো, ঘন চুল। সরু গোঁফ। নীল স্যুট পরনে। আর দশজন সাধারণ সফল ব্যবসায়ীর মতই লাগছে, কেবল চোখজোড়া বাদে। কালো চোখের তারা ছুরির মত ধারাল। দুই গোয়েন্দার অন্তরে কেটে প্রবেশ করল যেন দৃষ্টি। হাত মেলালেন ওদের সঙ্গে।

কোন ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথায় এলেন, 'প্রেসিডেন্ট কলিন বললেন বাস্কেটবল খেলার জন্যে নাকি তোমাদের ঘুষ দেয়া হয়েছে।' কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন মুসার দিকে। 'এখানে ছাত্র সেজে আছ, কে ঘুষ দিচ্ছে ধরার জন্যে।'

কেশে গলা পরিষ্কার করলেন প্রেসিডেন্ট। গোয়েন্দাদের বললেন, 'আজ সকালে টেনিস খেলছিলাম আমি আর বার। ওই সময় তিনি বললেন কোচ ম্যাডিরার বাজেট বাড়ানোর জন্যে বাড়তি কিছু টাকা দিতে চান। তাঁকে বললাম, এখন দেয়াটা উচিত হবে না। কেন হবে না...'

ভারি গলায় বাধা দিলেন বার, 'আমি কিছু দিতে চাইলে কেউ যখন নিতে চায় না, স্বভাবতই সন্দেহ হয় আমার। জানতে ইচ্ছে করে কারণটা।'

অস্বস্তি বোধ করছেন প্রেসিডেন্ট। আগের কথার খেই ধরলেন, 'বাধ্য হয়েই বারকে সব কথা জানাতে হলো। না বলে আর পারলাম না। সন্দেহ বাড়ছিল তাঁর। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তিনি। জিমনেশিয়াম বানানো থেকে সরে না দাঁড়িয়ে বরং তদন্তে সাহায্য করতে চাইলেন। তবে আমার মতই তিনিও স্ক্যান্ডালে জড়াতে চান না কোনমতে।'

'এবার বলো,' কিশোর আর মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন বার।

তদন্ত কতখানি এগিয়েছে জানতে চাইছেন তিনি, বুঝল কিশোর। 'কোন কোন প্লেয়ার ঘুষ পাচ্ছে মোটামুটি জানতে পেরেছি। কে দিচ্ছে জানি না এখনও, তবে মাইকেল অ্যান্থনি নামে একজন লোক মুসার সঙ্গে দেখা করেছে। মুসাকে একটা গাড়ি দিয়েছে...'

'একটা পোরশে,' মুসা বলল।

'লোকটা বলল, কোন একজনের হয়ে কাজ করছে সে,' বলল কিশোর। 'কার হয়ে সে-কথা গোপন রেখেছে। আমরাও জানতে পারিনি।'

'কাউকে সন্দেহ করোনি?' প্রশ্ন করলেন বার।

'কোচ লভেল ম্যাডিরা,' প্রেসিডেন্ট বললেন।

'আরও একজনকে করছি এখন,' কিশোর বলল। 'কোচ হামফ্রে ভেগাবল। ম্যাডিরাকে শেষ করে দেয়ার ফন্দি করে থাকতে পারেন।'

'মাইকেল অ্যান্থনির পিছু নিয়ে কোস্টা ভারদি কলেজে চলে গিয়েছিলাম আমরা,' মুসা বলল।

'কে এ সব করছে তাড়াতাড়ি জানার চেষ্টা করো,' নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'প্রমাণ জোগাড় করো। দেরি করলে, ব্যাপারটা কোনমতে জানাজানি হলে সর্বনাশ হবে। তার আগেই শয়তান বিদেয় করে ঘর পরিষ্কার করতে হবে। খবরের কাগজওলারা জেনে গেলে ঘরই রাখবে না, পুড়িয়ে দেবে।'

প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন বার। 'মনে হচ্ছে ঠিক লোককেই কাজে লাগিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট। ঠিক পথেই এগোচ্ছে ওরা।'

আবার চোখের ছুরি দিয়ে দুই গোয়েন্দার অন্তর কাটলেন তিনি, 'আশা করি শোরমন্টের ব্যাপারে কোন ভুল ধারণা নেই তোমাদের। খুব ভাল একটা কলেজ। এক সময় আমিও লেখাপড়া করেছি এখানে। আজকে আমার উন্নতির মূলেও এই কলেজের শিক্ষা। ইচ্ছে করলে তোমরাও এই কলেজে ভর্তি হতে পারো, তবে টাকার জন্যে অবশ্যই নয়। ঘুষের টাকার লোভে তোমাদের আসতে বলব না কোনমতেই।'

অফিস থেকে বেরিয়ে মুসা বলল, 'ভদ্রলোকের যা মেজাজ, ভূমিকম্পকেও আদেশ দিতে ছাড়বেন না।'

অন্যমনস্ক হয়ে আছে কিশোর। 'ভঙ্গিটাও যেন কেমন। কালকের মধ্যেই চাইছেন কেসের কিনারা করে ফেলি।'

'কাল তো রোববার। সুযোগ কোথায়?'

'নির্ভর করে লুথার ফায়ারস্টোনের কাছ থেকে কতটা কথা আদায় করতে পারব তার ওপর। ঘন্টাখানেক পরই তাকে কেমিস্ট্রি পড়াতে যাব। যাও। পরে দেখা করব তোমার সঙ্গে।'

স্টুডেন্ট সেন্টারে এসে লুথারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর। মনে ভাবনার ঝড় বইছে:

কি কি জিজ্ঞেস করবে লুথারকে? কে তাকে শোরমন্ট টীমে রিক্রুট করেছে? ঘুষ নিতে রাজি হলে কেন? কিশোরের ধারণা, কেউ যদি সরাসরি তাকে এখন এই কেসের সমাধানে সাহায্য করতে পারে, সে লুথার।

কোচ ম্যাডিরার অফিস তল্লাশি করার কথাও ভাবল কিশোর। সন্দেহের তালিকা থেকে এখনও তাঁকে বাদ দিতে পারেনি।

হামফ্রে ভেগাবলকেও বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু তার ব্যাপারে তদন্ত করতে হলে কোস্টা ভারদি কলেজে যেতে হবে। সাংঘাতিক ঝুঁকির কাজ হয়ে যাবে সেটা। দেখলেই মার মার করে ছুটে আসবে আবার বাস্কেটবল প্লেয়াররা। মুসাকে পাঠাবে? তাকেও চেনে ওরা। রবিনকে পাঠানো যায়। কিন্তু রবিন তো ব্যস্ত লজের ওখানে।

কি করা যায় ভাবছে কিশোর, এই সময় মেয়েলী কণ্ঠে ডাক শুনল, 'হাই,

কিশোর?'

ফিরে তাকাল সে। প্রমাদ গুণল। সর্বনাশ! জেরিন। চিয়ারলীডারদের একজন। অনর্গল কথা বলে। কথার জবাব না দিলেও সমস্যা। রেগে ওঠে।

কিশোরের পাশে এসে বসে পড়ল জেরিন। নিশ্চয় বান্ধবীদের কাউকে পায়নি। এখন তাকে জ্বালাবে।

'তারপর, কিশোর, কেমন চলছে? সেদিন খেলার সময় খুব দেখিয়েছ কিন্তু তুমি। রনির পা তো এখনও ভাল হয়নি। এ-হপ্তায় আবার তোতা সাজতে হবে তোমাকে। সাজবে তো?'

'হুঁ,' দায়সারা জবাব দিল কিশোর। জেরিনকে কাটাতে চাইছে।

'কিশোর, আমার ফিলসফি পেপার নিয়ে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। তোমার ব্রেনটা খুব ভাল। পড়াশোনাও প্রচুর। একটু সাহায্য করো না। করবে?'

দূর, যায় না কেন! বিরক্ত ভাবটা মুখে ফুটিয়ে তুলল কিশোর। জবাব দিল না।

তারপরও বুঝল না মেয়েটা। ঘ্যানর ঘ্যানর করেই চলল।

কিশোরকে উদ্ধার করল লুথার। কাছে এসে বলল, 'সরি, কিশোর, দেরি হয়ে গেল। বসিয়ে রাখলাম। হাই, জেরিন।'

'হাই,' জবাব দিল জেরিন।

'কিশোর,' লুথার বলল, 'আজ আর পড়তে পারব না। মেরে ফেলেছেন কোচ। এমন প্র্যাকটিস করিয়েছেন। এখন বিছানা ছাড়া গতি নেই।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। ঘুষের ব্যাপারে আলাপ করার সুযোগটা গেল।

লুথার ভাবল পড়াতে না পেরে কিশোরের মন খারাপ হয়ে গেছে। তাকে খুশি করার জন্যে বলল, 'এক কাজ করো না। আর্ট টিলারিব বাড়িতে চলে এসো মঙ্গলবার রাতে। পার্টি দেয়া হবে। অনেককে দাওয়াত করেছে। চাইলে একআধজন বন্ধুকেও আনতে পারো। তার হয়ে দাওয়াতটা আমিই তোমাকে দিয়ে দিলাম।'

প্রস্তাবটা লুফে নিল জেরিন, 'কিশোর, আমাকে নিয়ে যেয়ো! ফিলসফির পেপার নিয়ে ওখানেই আলাপ করা যাবে।'

'হুঁ,' জোর করে হাসি ফোটাল কিশোর।

আর্ট টিলারির অ্যাপার্টমেন্টে পার্টি! এই কেসের তথ্য পাওয়ার জন্যে চমৎকার জায়গা। কিন্তু সেটা অনেক দেরি। মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা কঠিন। ঘাড়ের ওপর চেপে আছেন এখন টাকার কুমির ব্র্যানসন বার। মনে মনে ঠিক করল কিশোর, রোববার সকালে ম্যাডিরাব অফিস চেক করতে যাবে। ওই সময়টায় জিমনেশিয়াম খালি থাকে। গোয়েন্দাগিরি করতে সুবিধে হবে।'

কিন্তু ভুল করেছে সে। ঢুকতেই বলের শব্দ কানে এল তার। জিমনেশিয়ামে উঁকি দিয়ে পুরো দলটাকে প্র্যাকটিস করতে দেখল। ম্যাডিরা রয়েছেন সঙ্গে। খাটিয়ে মারছেন খেলোয়াড়দের।

যাই হোক, তিনি যখন এদিকে ব্যস্ত, অফিসটা খালি। আর সেটাই চায় কিশোর। পা টিপে টিপে সেদিকে রওনা হলো।

বুক কাঁপতে লাগল তার। হঠাৎ করে যদি ম্যাডিরা ঢুকে পড়েন? কি জবাব দেবে? ধরা পড়তে হবে। বারোটা বাজবে কেসের। তার ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে যাবে।

কিন্তু অত ভাবলে গোয়েন্দাগিরি চলে না। জোর করে মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে হলওয়ে ধরে ম্যাডিরার অফিসের দিকে চলল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নিল এপাশ ওপাশ। নব ধরে মোচড় দিয়ে পাল্লা খুলল। ঢুকে পড়ল নিঃশব্দে।

হাতের তালু ঘামছে। ভেজা হাতে কাগজ পরাল টাইপরাইটারে। টাইপ করল। লেখাগুলো দেখল ভালমত। মুসাকে পাঠানো চিঠির লেখার সঙ্গে কি মিলছে? না। তারমানে এই টাইপরাইটার দিয়ে লেখা হয়নি।

উঠে এসে কোচের ব্যক্তিগত অফিসে ঢুকল সে। কম্পিউটারের সামনে বসল। কয়েকটা শব্দ টাইপ করল। প্রিন্টারকে নির্দেশ দিল প্রিন্ট করার জন্যে। ঝিরঝির করে মৃদু শব্দ হচ্ছে, তাতেই ঘাবড়ে গেল সে। এই শব্দ শুনে কি হচ্ছে দেখার জন্যে কেউ চলে আসবে ভেবে।

এল না কেউ। হরফগুলো মিলিয়ে দেখল কিশোর। চিঠির হরফের সঙ্গে মিলল না। সুতরাং এই কম্পিউটার দিয়েও লেখা হয়নি।

এরপর ম্যাডিরার ডেস্কের কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করল সে। মেমো, স্কাউটিং রিপোর্ট, গেম-প্লে বুক আর ইক্যুইপমেন্ট ইনভয়েসগুলো দেখল। পার্সোন্যাল চেকবুক রেজিস্টারটাও বাদ দিল না।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর হাল ছেড়ে দিল সে। এখানে কিছুই নেই যা দিয়ে ফাঁসানো যায় ম্যাডিরাকে।

এবার কি করবে? তবে কি ম্যাডিরা দোষী নন? নাকি অনেক বেশি চালাক। ধরা পড়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক?

বাসে করে বাড়ি ফেরার পথে আরেকটা সম্ভাবনার কথা ভাবল কিশোর। এমনও হতে পারে, রহস্যময় মাইকেল অ্যান্থনি কারও হয়ে কাজ করছে না। যা করার সে নিজেই করছে। একা। আসল অপরাধী সে নিজেই

এগারো

সোমবার সকালে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল তদন্ত। ছুটির দিন। কোস্টা ভারদির ক্লাস বন্ধ। হামফ্রে ভেগাবলকে পাওয়া যাবে না কলেজে। সুতরাং তাঁর বাড়িতে ফোন করল কিশোর। কিন্তু ওখানেও তাঁকে পাওয়া গেল না।

অগত্যা হেডকোয়ার্টারে বসে বসেই ভিডিও গেম খেলে আর গল্প করে অলস সময় কাটাতে লাগল কিশোর আর মুসা। বিকেলের দিকে পোরশে

নিয়ে ঘুরতে বেরোল দু-জনে।

গড়িয়ে গড়িয়ে কাটল সেদিনটা। পরদিন মঙ্গলবার। সকাল থেকেই কিশোরের মনে হতে লাগল, আজ কিছু না কিছু ঘটবে।

বিকেলটা ওঅর্কশপে বসে পার্টির জন্যে তৈরি হতে লাগল সে।

মন দিয়ে কাজ করছিল। পেছনে দরজা খোলার শব্দ হতেই তাড়াতাড়ি ভিসিআর বন্ধ করে দিল।

ছুটে ঘরে ঢুকল মুসা, 'কিশোর, খবর আছে!' চোখ পড়ল ভিসিআর আর ভিডিও ক্যামেরার ওপর, 'কি করছিলে?'

'কিছু না,' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর।

পারল না। তার অপরাধী চেহারা ঢাকা দিতে পারল না মুসার চোখ থেকে। 'কি করছিলে?'

'কিছু না,' আবার বলল কিশোর।

'তাহলে টিভি খোলা কেন? তোমার হাতে রিমোট কেন? ভিডিও ক্যামেরা কেন? আমিও গোয়েন্দা, তিন গোয়েন্দার একজন, ভুলে যেয়ো না।'

আরেক দিকে তাকিয়ে কেশে গলা পরিষ্কার করল কিশোর, 'একটা জিনিস দেখছিলাম।'

'কি? আমিও দেখব।'

মুসাকে ঠেকানোর চেষ্টা করল কিশোর, পারল না। ভিসিআরে ক্যাসেট ঢোকানো আছে। চালু করে দিল মুসা।

নীল জিনস আর হলুদ টি-শার্ট পরা সুদর্শন কিশোর টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে দাঁড়াল। যেন বিজ্ঞাপনের জন্যে ভঙ্গি দিচ্ছে। ক্যামেরার চোখের সামনে নড়ছে সে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে, এপাশ দেখাচ্ছে, ওপাশ দেখাচ্ছে...

'এটা কি কিশোর!' মুসা অবাক। 'বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কাজ নিয়েছ? মডেলিং?'

নীরবে মাথা নাড়ল কিশোর। লজ্জা পাচ্ছে পর্দার দিকে তাকিয়ে।

'ওহ্হো, বুঝেছি! পার্টিতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলে! তা এত জাঁকজমকের কি দরকার?'

'আছে। আর্ট টিলারির পার্টিতে সাধারণ পোশাকে যাওয়া ঠিক হবে না মনে হচ্ছিল। তাই ভাবছিলাম কোন পোশাকে কি ভাবে চললে চোখে পড়া যাবে। চোখে পড়তে পারলে বেশি লোকের সঙ্গে আলাপ করতে পারব, তথ্য বের করা সহজ হবে।'

'এটা বললেই হত। এত লজ্জা পাওয়ার কি হলো? মানুষ কি আর ভাল পোশাক পরে না নাকি?'

ভিসিআরটা বন্ধ করে দিল আবার কিশোর। 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে, জরুরী খবর আছে?'

'থানায় খোঁজ নিয়েছিলাম,' আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল মুসা। 'পোরশের রেজিস্ট্রেশন কার নামে বের করে ফেলেছি।'

'কার নামে?' আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর।

'ম্যানারি জোনস। ঠিকানা: তেত্রিশ লাইলি স্ট্রীট, ম্যানহাটান বীচ, ক্যালিফোর্নিয়া।' পেছনের পকেট থেকে একটা কম্পিউটার প্রিন্টআউট বের করে দিল মুসা।

সেটা দেখল কিশোর। 'চলো, জোনসের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

পোরশেতে চাপল দু-জনে। ঘন্টাখানেক পর এসে পৌঁছল ৩৩ নম্বর লাইলি স্ট্রীটে। কংক্রীটে তৈরি, প্রচুর কাঁচ বসানো একটা চারতলা অফিস বাড়ি।

'কয়েক ব্লক দূরে পার্ক করো,' মুসাকে বলল কিশোর। 'গাড়িটা দেখেই জোনস পালাক এটা চাই না। তোমার জন্যে লবিতে অপেক্ষা করব আমি।'

এক মিনিট পর সামনের দরজা ঠেলে লবিতে ঢুকে মুসা দেখতে পেল দেয়ালে ঝোলানো ডিরেক্টরি পড়ছে কিশোর। সব ভাড়াটেদের নাম লেখা আছে।

ম্যানারি জোনসের ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল কিশোর।

ঘরের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দু-জনে। কালো কাঠে সোনালি রঙের নেমপ্লেট। জানা গেল, ম্যানারি জোনস একজন আইনজীবী।

'পোরশে গাড়ির মালিক,' দরজায় টোকা দিতে দিতে বলল মুসা, 'তারমানে ভাল টাকা কামায়।'

একবার টোকা দিয়ে অপেক্ষা করল।

সাড়া নেই।

আরও জোরে টোকা দিল।

এবারও জবাব নেই।

তৃতীয়বার জোরে জোরে থাবা দেয়ার পরও যখন সাড়া মিলল না, মুসা বলল, 'নেই।'

কিশোর বলল, 'সেটা প্রথমবার সাড়া না পেয়েই বুঝেছি।' এলিভেটরের দিকে রওনা হয়ে গেছে সে।

পোরশেতে চড়ে আবার লাইলি স্ট্রীটে ঢুকল। একটা পে ফোন দেখে গাড়ি থামাতে বলল কিশোর। এখান থেকে জোনসের বাড়িটাও চোখে পড়ে।

গাড়িতে বসে নজর রাখল ওরা।

জোনসকে চেনে না। তাই যতবারই কোন লোক ৩৩ নম্বর বাড়িতে ঢুকে ওপরতলায় যায়, ততবারই পে ফোন থেকে জোনসের অফিসে ফোন করে কিশোর, দেখে জবাব মেলে কিনা। কিন্তু একবারও জবাব পাওয়া গেল না

'সাতটা বাজে কিশোর,' বিরক্ত হয়ে একসময় বলল মুসা। 'আর কতক্ষণ? ও আসবে না।'

'কেন আসবে না?' নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। 'একটা কারণ হতে পারে, আদালতে কিংবা কোন মক্কেলের বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, অন্য কোন কারণ আছে। কী, সেটা জানতে পারলে ভাল হত। তবে

আজ আর জানা যাবে বলে মনে হয় না।'

'তার চেয়ে চলো পার্টিতে চলে যাই। টিলারির অ্যাপার্টমেন্টে।'

'না। আগে বাড়ি যাব। এই পোশাকে পার্টিতে যাব না।'

ওরা যখন টিলারির অ্যাপার্টমেন্টে পৌছল, পুরোদমে চালু হয়ে গেছে পার্টি আধুনিক বাড়িটার দেয়াল কাঁপিয়ে বাজছে মিউজিক। লিভিং রুম, রান্নাঘরে গিজগিজ করছে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। কেউ নাচছে, কেউ কথা বলছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন বাস্কেটবল প্লেয়ার আর চিয়ারলীডারকেও দেখতে পেল কিশোর।

'দারুণ জায়গা তো,' ঘরগুলো দেখতে দেখতে বলল মুসা। 'কলেজে পড়ার সময় এমন একটা বাড়ি যদি আমিও করতে পারতাম, ভাল হত।'

'আরও আগেই পারবে, শোরমন্টে থেকে ঘুষ খেতে থাকলে,' খোঁচা দিয়ে বলল কিশোর। 'ওসব বাদ দিয়ে এখন কান খোলা রাখো। কোন কোন প্লেয়ার ঘুষ খায় জানার এমন সুযোগ আর পাবে না। আমার সঙ্গে কি করে পরিচয় হলো কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, গত বছর রকি বীচে স্কুলে পড়ার সময় দেখা হয়েছিল। আজকে পোরশে চালাতে গিয়ে দেখা হয়ে গেছে আবার। আমিই তোমাকে জোর করে ধরে এনেছি গাড়িটাতে চড়ার লোভে। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'আরে কিশোর!' হাত নেড়ে বলল আর্ট টিলারি। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। 'এলে তাহলে! খুশি হলাম।'

পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর, 'আর্ট, ও মুসা আমান, আমার বন্ধু।'

'হাই, মুসা,' হাত বাড়াল টিলারি। ঘুরে মেহমানদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চুপ করে আছ কেন তোমরা? খাও, খাও। যার যা ইচ্ছে তুলে নাও।'

মুসা আর কিশোরকে আপ্যায়ন করে হাসিমুখে আরেক দিকে চলে গেল টিলারি।

ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। মাঝে মাঝে খাবার নেয়ার জন্যে থামছে মুসা, কিন্তু খাওয়ার প্রতি কোন আগ্রহ নেই কিশোরের। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তথ্যের সন্ধানে।

'হাই, কিশোর!' মেয়েকণ্ঠে ডাক শোনা গেল।

ঘুরে তাকাল কিশোর। সেই মেয়েটা, টারা।

এগিয়ে এল সে। কথা জমানোর জন্যে বলল, 'তারপর? কলেজে ক্লাস কেমন লাগছে?'

'লাগছে এক রকম।'

অযথাই হাসল টারা। 'খেলার দিন দেখিয়েছ বটে। এমন তোতা সেজেছ, অনেক দিন মনে থাকবে।'

মনে মনে বলল কিশোর, হ্যাঁ, কোস্টা ভারদি কলেজে কিলগুলোর কথাও আমার মনে থাকবে। মুখে কেবল বলল, 'হুঁ।'

হঠাৎ কাঁধে ভারি থাবা পড়ল। জোরে জোরে ঝাঁকাল কেউ। কিশোর দেখল টারাকেও ঝাঁকাচ্ছে আরেকটা থাবা।

'কেমন লাগছে?' বলল একটা খসখসে কণ্ঠ। কথার টান থেকে বোঝা যায় টেকসাসে বাড়ি। কালো কোঁকড়া লম্বা চুল দেখতে পেল কিশোর। ভুসভুস করে বিয়ারের গন্ধ ছাড়ছে।

টারা বলল, 'বেশি গিলে ফেলেছ, ইকার।'

'পার্টির খাবার আর মদের টাকা সব আমি দিয়েছি। বেশি গিলতে পারব না এমন কথা তো বলেনি কেউ? তোমার সঙ্গে এই ছেলেটি কে?'

কথার ঢঙ ভাল লাগল না কিশোরের।

'ও কিশোর পাশা। কিশোর, ইকার ব্রাইটন।'

'হাউডি' বলল ইকার। একটা রসিকতা করল যার মাথামুণ্ড কিছু বুঝল না কিশোর।

জোর করে হাসল সে। যে পাঁচজন বাস্কেটবল প্লেয়ারের নাম সিলেক্ট করেছিল, তাদের সর্বশেষ লোকটার সঙ্গে পরিচিত হলো। গত হপ্তায় একটা ক্লাসও করেনি ইকার, সুতরাং তার সঙ্গে আগে দেখা করার আর সুযোগ মেলেনি।

দামী পোশাক পরেছে ইকার। বলছে, পার্টির সব খাবার আর মদের দাম সে দিয়েছে। তারমানে টাকা কামায় প্রচুর। নিশ্চয় মাইকেল অ্যান্থনির কাছে থেকে আসে সেই টাকা।

'খাবার আর মদের টাকা আপনি দিয়েছেন? কিন্তু পার্টিটা তো জানতাম আর্ট টিলারির,' কিশোর বলল।

'তাতে কি? বন্ধুর জন্যে বন্ধু টাকা খরচ করে না? তার পার্টি কি আমার পার্টি নয়? টাকা হলো হাতের ময়লা। খরচ করার জন্যেই তৈরি।' টলছে ইকার। তাড়াতাড়ি আবার কিশোরের কাঁধ খামচে ধরে সামলে নিল। 'তারপর? কি সাবজেক্ট পড়ছ কলেজে? কিসে ইনটারেস্ট?'

কিসে ইনটারেস্ট সরাসরি বলতে ইচ্ছে করল কিশোরের, 'ঘুষের টাকাটা কে দিচ্ছে?' কিন্তু করল না। বলল, 'কমুনিকেশন হিস্টরি। টেলিভিশনের ইতিহাস আমার ভাল লাগে, পুরানো শো-গুলোর ব্যাপারে জানতে ইচ্ছে করে। আমার সবচেয়ে প্রিয়গুলোর একটা হলো দা মিলিয়নিয়ার।'

'শুনিনি।'

'ওতে একটা চরিত্র আছে, নাম মাইকেল অ্যান্থনি,' স্থির দৃষ্টিতে ইকারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর, ভাব পরিবর্তন হয় কিনা দেখার জন্যে। হতাশ হতে হলো না তাকে।

'মাইকেল অ্যান্থনি? বাস্তবে?' হেসে উঠল ইকার। 'নিশ্চয় প্রচুর টাকা নাড়াচাড়া করে লোকটা?' আবার হাসল সে। টলে পড়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই। সামলাল কোনমতে।

'কি বললেন বুঝলাম না,' বলল কিশোর। দুরুদুরু করছে বুক। বুঝতে

পারছে আসল তথ্যের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। আর একটা প্রশ্ন, তারপরেই হয়তো ফাঁস করে দেবে মাতালটা।

ঠিক এই সময় সেখানে এসে হাজির আর্ট টিলারি।

'শোনো শোনো, আর্ট, কিশোর কি বলে!' যেন এক মহা রসিকতা শুনেছে, এমন ভঙ্গিতে বলল ইকার, 'পুরানো এক টিভি শো-তে নাকি মাইকেল অ্যান্থনি বলে একটা চরিত্র আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম প্রচুর টাকা নাড়াচাড়া করে নাকি? এই সহজ কথাটাও বুঝতে পারল না কিশোর। হাহ্ হাহ্ হা!'

টিলারি হাসল না। গম্ভীর হয়ে গেল। 'এসো। অনেক বেশি গিলে ফেলেছ। খোলা হাওয়া দরকার তোমার।' টানতে টানতে ইকারকে কিশোরের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

'কি বলল আমিও বুঝলাম না,' টারা বলল।

'নিশ্চয় তার কোন ব্যক্তিগত রসিকতা,' এড়িয়ে গেল কিশোর। চোখের সামনে দিয়ে তথ্যটা এভাবে সরে যেতে দেখে নিরাশ হয়েছে খুব।

'মুসা আমানের ফোন!' চিৎকার করে বলল কে যেন। 'এই, তুমি? মুসা?'

ভিড়ের ভেতর থেকে মুসাকে বেরিয়ে যেতে দেখল কিশোর।

'কিশোর, নাচবে আমার সঙ্গে?' প্রস্তাব দিল টারা।

'উঁ!' কিশোরের চোখ টারার ওপর, কিন্তু তার মন তখন অন্য জগতে। যেন কথাই বুঝতে পারল না।

'নাচবে?' আবার জিজ্ঞেস করল টারা।

'কি করব? ও, নাচ। দাঁড়াও মুসা আসুক।'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে টারা। 'কি ব্যাপার? তুমিও গিলেছ নাকি?'

ফোন রেখে এগিয়ে এল মুসা। কিশোরকে হাতের ইশারায় ডাকল। কিশোর কাছে যেতে বলল, 'সাবধান করল কে যেন। অন্যের ব্যাপারে নাক না গলাতে মানা করে দিল।'

'গলাটা চিনেছ?'

'না। আরও বলল, এখনি জানালার কাছে গিয়ে দেখতে কি ঘটছে।'

আর একটাও কথা না বলে ব্যালকনির জানালার দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর। তার পেছনে ছুটল মুসা।

ওরা পৌঁছতে না পৌঁছতেই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। রাস্তার দিকে ফাটল যেন আগুনের গোলা।

চিৎকার করে উঠল মুসা, 'হায় হায়, আমার পোরশে!'

বারো

লাল বলটাকে কালো ধোঁয়ায় রূপ নিতে দেখল মুসা। ভেতর থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে নীল পোরশের টুকরো। রাস্তার লোক এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে সরে যাচ্ছে আগুন থেকে বাঁচার জন্যে।

কেউ আহত হলো না। কিন্তু কিশোরের মনে হতে লাগল অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। ওরা ভেতরে থাকতে বোমাটা ফাটলে কি হত কল্পনা করে শিউরে উঠল।

'পুলিশকে খবর দেয়া দরকার,' বলল সে। গলা কাঁপছে। 'মুসা, পুলিশ!'

নড়ল না মুসা। শব্দ শুনে কি হয়েছে দেখার জন্যে ঘরের ভেতর থেকে ব্যালকনিতে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে ছেলেমেয়েরা।

শেষে কিশোরই ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকল পুলিশকে ফোন করার জন্যে। আর্ট টিলারির অ্যাপার্টমেন্ট রকি বীচে। এখানকার থানার নম্বর কিশোরের মুখস্থ। কতবার যে ফোন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। থানায় খবর দিয়ে তাড়াহুড়ো করে আবার মুসার কাছে ফিরে এল।

তাকিয়েই আছে মুসা। আঙুল চেপে বসেছে ব্যালকনির রেলিঙে। দমকল এসে গেছে। হুড়াহুড়ি করে নেমে এল ফায়ারফাইটাররা, পাইপ খুলতে শুরু করল। কয়েকজন রাসায়নিক ফেনা ছিটাতে লাগল আগুনে।

অনেক সময় লাগল নিভাতে। গাড়ির ভেতর থাকলে কি ঘটত ভেবে আবার মোচড় দিয়ে উঠল কিশোরের পেট।

দরজার ঘণ্টা বাজল। ঘরে ঢুকল রকি বীচ পুলিশ।

শঙ্কিত হয়ে উঠল টিলারি। ভাবল পার্টিতে বেশি হই-চই করে ফেলেছে, তাই পুলিশ এসেছে। বেশি শব্দ করে প্রতিবেশীর শান্তি নষ্ট করলে পুলিশ আসে বাধা দিতে। বলল, 'আমরা তো চেঁচামেচি করিনি!'

সারা ঘরে চোখ বোলাল পুলিশ অফিসার। 'এখান থেকে ফোন করেছে কেউ।'

'আমি,' এগিয়ে এল কিশোর।

গুঞ্জন উঠল ঘরে।

'এসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে,' দরজা দেখাল অফিসার। আড়ালে বলতে চায়।

মুসার পিঠে হাত রেখে তাকেও সঙ্গে আসার ইশারা করল কিশোর।

বাইরে এসে অফিসারকে বলল, 'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা আমান। ওই যে গাড়িটা নষ্ট হয়েছে, ওটা ওর।'

'রেজিস্ট্রেশন আছে?'

'নেই।' সাহায্যের জন্যে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

কিন্তু কিশোর কিছু বলার আগেই হাতকড়া বের করে বলল অফিসার, 'দেখি, হাত দেখি।'

'কেন? দাঁড়ান, কিশোরের কথা আগে শুনুন!'

কিশোরের হাতেই আগে হাতকড়া পরাল অফিসার।

'কি-কি করছেন!...আমরা...আপনি জানেন কার হাতে হ্যান্ডকাফ লাগাচ্ছেন?'

'জানি। তুমি তিন গোয়েন্দার প্রধান,' শান্ত স্বরে জবাব দিল অফিসার।

মাথা সোজা করে দাঁড়াল কিশোর। 'আপনি নিশ্চয় জানেন না চীফ ইয়ান ফ্লেচার আমাদের বন্ধু। অনেক কেসে পুলিশকে সাহায্য করেছি আমরা। তা ছাড়া একজন সৎ নাগরিককে বিনা অপরাধে অ্যারেস্ট করার কোন অধিকার নেই আপনার।'

'সব অপরাধীই গ্রেপ্তার হওয়ার সময় এ রকম কথা বলে।' খপ করে মুসার হাত চেপে ধরল অফিসার।

'কিন্তু আমরা কি অপরাধ করলাম?' তর্ক করতে লাগল কিশোর। 'গাড়িটা আমরা নষ্ট করিনি। কোন অপরাধে আমাদের অ্যারেস্ট করছেন?'

'গাড়ি চুরির অপরাধে।'

'প্রমাণ কোথায়?'

'কাউকে সন্দেহ করলেও তাকে অ্যারেস্ট করার ক্ষমতা পুলিশের আছে। থানায় চলো, সব জানতে পারবে।'

থানায় ঢোকার পর ওদের হাত থেকে হাতকড়া খুলে নেয়া হলো। ইয়ান ফ্লেচারের অফিসের বাইরে কাঠের শক্ত বেঞ্চিতে বসতে দেয়া হলো।

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল মুসা। মেঝের দিকে চোখ। তার কাছে এটা দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। 'আমরা মারাও পড়তে পারতাম!'

'জানি,' জবাব দিল কিশোর। গাড়ি ধ্বংস হওয়ার দৃশ্যটা মনে করে আরেকবার মোচড় দিল পেট। 'তবে আমাদের মারার ইচ্ছে ছিল না লোকটার। থাকলে সহজেই শেষ করে দিতে পারত।'

'তাহলে ওড়াল কেন?'

'ভয় দেখানোর জন্যে। তারমানে জরুরী কিছু জেনে ফেলেছি আমরা। কিংবা কোন কিছুর কাছাকাছি চলে এসেছি।'

এই সময় পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের ঘরের দরজা খুলে গেল। ইশারায় দুই গোয়েন্দাকে উঠে দাঁড়ানোর আদেশ দিল যে অফিসার ওদের ধরে এনেছে।

'হ্যালো, চীফ,' ভেতরে ঢুকে বলল কিশোর। 'আমাদের ধরে আনা হয়েছে কেন?'

একগাদা ফাইলের ওপাশে প্রায় ঢাকা পড়ে আছেন চীফ। বললেন, 'থানায় এসেছ। প্রশ্নগুলো তো আমাদের করার কথা।' মুসার দিকে তাকিয়ে

হাসলেন। 'গাড়িটা খুব ভাল ছিল, তাই না?'
এমন ভঙ্গিতে বললেন, মনে হবে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চান। কিন্তু চীফকে চেনে কিশোর। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদের ধরন জানা আছে। প্রথমে আসামীকে নরম নরম কথা বলে সহজ করে নেবেন। তারপর আসবে আক্রমণ। কিন্তু এই পদ্ধতি ওদের ওপর প্রয়োগ করছেন কেন?
'হ্যাঁ, খুব ভাল ছিল,' জবাব দিল মুসা 'কে ধ্বংস করেছে, সেটা জানার চেষ্টা করছেন নিশ্চয়?'
সামান্য কঠোর হলো চীফের কণ্ঠ, 'আবার প্রশ্ন! কতদিন ধরে গাড়িটা তোমার কাছে ছিল?'
চুপ হয়ে গেল মুসা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে আঙুল কামড়াতে লাগল।
'গত শুক্রবার থেকে,' জবাব দিল কিশোর।
'তোমাদের কাছে কি করে এল?'
'একটা লোক আমাকে দিয়েছিল,' জানাল মুসা।
আড়াআড়ি করে এক হাতের ওপর আরেক হাত রাখলেন চীফ। 'জবাবটা আমার পছন্দ হলো না।' কনুইয়ে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকলেন। 'অন্য কথা বলো।'
'আর কিছু জানা নেই আমার। সত্যি কথাই বলছি।'
'বেশ। তোমাদেরকে আমি চিনি বলেই কথাটা বিশ্বাস করলাম। আজ বিকেলে একজন এসে গাড়িটা চুরি হয়েছে বলে রিপোর্ট করেছে।'
'চুরি?'
'কে?' কিশোরের প্রশ্ন।
'গাড়ির মালিক। ম্যানারি জোনস,' জবাব দিলেন চীফ।
'ম্যানারি জোনস,' চীফের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'সেই লোকটা...'
দিচ্ছে ফাঁস করে! তাড়াতাড়ি বাধা দিল কিশোর, 'মুসা, আমার মনে হয় চীফকে বলা উচিত, আমরা একটা কেসে কাজ করছি। গাড়িটা ওই কেসেরই অংশ। এবং এই মুহূর্তে মক্কেলের নাম ফাঁস করা উচিত হবে না আমাদের।'
'অ্যাঁ...হ্যাঁ, হ্যাঁ...' মুসা বলল।
'কিসের কেস?' জানতে চাইলেন চীফ।
মাথা নাড়ল কিশোর। 'সেটাও এই মুহূর্তে আপনাকে বলতে পারছি না। আমাদের মক্কেলকে কথা দিয়েছি, মুখ বন্ধ রাখব।'
হাত তুললেন চীফ, 'আমাকে যদি কিছুই না বলো, বুঝব কি করে?'
'সরি, চীফ।'
'তাহলে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব আমি।'
আবার বলল কিশোর, 'সরি, চীফ। মক্কেলকে আমি কথা দিয়েছি, তার নাম ফাঁস করব না।'
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে থাকলেন চীফ। তারপর বেল টিপে অফিসারকে ডেকে বললেন, 'ম্যানারি জোনসকে নিয়ে

এসো।'

আবার দরজা খুলে গেল। যে লোকটা ঘরে ঢুকল তাকে দেখেই চমকে গেল দুই গোয়েন্দা। মাইকেল অ্যান্থনি। পরনে বিজনেস স্যুট। শার্টের গলার কাছে খোলা। টাইয়ের নট ঢিল করা। গলায় পরা লাল একটা কর্ডে ঝোলানো সানগ্লাস। খুব শান্ত ভঙ্গি।

মুসা আর কিশোরের দিকে তাকানোর সময় দৃষ্টিটা শান্ত থাকল না, আগুন ঝরল তা থেকে। তারপর চোখ সরিয়ে নিল, যেন ওদেরকে দেখেইনি কখনও।

'মিস্টার জোনস,' চীফ বললেন, 'এই ছেলেরাই গাড়িটাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার খবর দিয়েছে। ওদের পক্ষে সাফাই দিতে পারি আমি। অনেক দিন থেকে চিনি। আপনার গাড়িটা গত শুক্রবার থেকে নাকি চালাচ্ছে। একটা লোক দিয়েছে ওদেরকে।'

'তা দিতে পারে,' শীতল স্বরে বলল জোনস। 'কবে যে হারিয়েছে গাড়িটা, ঠিক বলতে পারব না। ব্যবসার কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। চুরিটা ওই সময়ই কখনও হয়েছে। কিন্তু নিয়ে গিয়ে এদেরকে দিয়ে দিল কেন বুঝলাম না।'

'এদেরকে এর আগে দেখেছেন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জোনস।

'কিশোর, কে তোমার মক্কেল, বলবে না তাহলে?' আচমকা প্রশ্ন করলেন চীফ।

তীব্র গতিতে চালু হয়ে গেছে কিশোরের মগজ। বুঝতে পারছে জোনসেরও একই ব্যাপার ঘটছে।

এই লোকটা বড় কেউ নয়, সাধারণ মাছ, ভাবল কিশোর। রাঘব বোয়াল অন্য লোক—কোন কারণে আড়ালে থাকতে চাইছে। কিন্তু কে? চীফের সামনে মক্কেলের নাম ফাঁস করে দিলে খবরটা সেই লোকের কাছে চলে যেতে পারে। স্রেফ হাওয়া হয়ে যাবে তখন, নয়তো এত গভীরে ডুব দেবে, আর খুঁজে বের করা যাবে না।

ফ্লেচারের প্রশ্নের জবাবে কিশোর বলল, 'সরি, চীফ, এখন বলতে পারছি না।'

'মক্কেল? ছেলেগুলো গোয়েন্দা নাকি?' সহজ ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করল জোনস। কিন্তু তার আগ্রহ ফাঁকি দিতে পারল না কিশোরের কান।

'খুব ভাল গোয়েন্দা,' জবাব দিলেন চীফ।

'কেন,' জোনসের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল মুসা, 'অবাক লাগছে শুনে?' লোকটাকে খোঁচা মারার লোভটা সামলাতে পারল না সে।

'না না, অবাক লাগবে কেন। পৃথিবীতে কত কিছুই তো ঘটে। মানুষ গোয়েন্দাগিরিও করে, গাড়িতেও বোমা ফাটে।'

'তাহলে ওদের বিরুদ্ধে কেস খাড়া করতে চান?' জিজ্ঞেস করলেন চীফ।

'না। আপনি যখন ওদেরকে ভাল বলছেন, আমিও বিশ্বাস করলাম গাড়িটা

ওরা চুরি করেনি। তা ছাড়া ওটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং বীমা কোম্পানির কাছ থেকে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিগে।'

'ঠিক আছে। যোগাযোগ রাখবেন।'

বেরিয়ে গেল জোনস।

চেয়ারে হেলান দিলেন চীফ। 'পুরো কাহিনীটা খুলে বলার জন্যে বাধ্য করতে পারি আমি তোমাদের।'

'করলেও অর্ধেকটা শুনতে পারবেন,' জবাব দিল কিশোর। 'কারণ পুরোটা আমরাই জানি না। কেসটা শেষ হয়নি এখনও।'

'কিশোর, সাবধান, খুব সতর্ক থাকবে। যে লোক পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলারের একটা গাড়ি এ ভাবে উড়িয়ে দিতে পারে, তার লেজে পা পড়লে সহজে ছাড়বে না।'

তেরো

মাইকেল অ্যান্থনিই ম্যানারি জোনস, এটা বিশ্বাসই করতে পারছে না মুসা। তবে লোকটা যে বিপজ্জনক, কিশোরের সঙ্গে এ-ব্যাপারে একমত হতে বাধ্য হয়েছে।

দেখা হওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। রকি বীচ হাই স্কুল বাসের পেছনের সীটে বসেছে সে। কেসটা নিয়ে ভাবছে। ছিন্ন সুতোগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছে। অথচ খেলতে চলেছে বাস্কেটবল। লম্বা করে পা মেলে দিয়েছে সামনে। মাথাটা জানালার কাঁচে ঠেকানো। পিছে বসলে বেশি ঝাঁকি লাগে। ইচ্ছে করেই বসেছে। মাথায় বার বার বাড়ি লাগছে।

রকি বীচ বাস্কেটবল টীমের অন্য সব খেলোয়াড়রা বসেছে বাসের সামনের দিকে। হাসছে, অনর্গল কথা বলছে। খেলতে যাওয়ার আগে স্নায়ুগুলোকে ঢিল করে নিতে চাইছে। মুসাকে বিরক্ত করতে আসছে না কেউ। সে বলে দিয়েছে চুপচাপ থাকতে চায়।

পোরশেটা ধ্বংস হওয়ার খবর সবাই শুনেছে। ভাবছে, সে-কারণেই তার মন খারাপ। তাই লক্ষ প্রশ্ন মনের মধ্যে খোঁচাখুঁচি করলেও চেপে রেখেছে ওরা।

জোরে জোরে দম নিচ্ছে মুসা, যাতে তারও স্নায়ু ঢিল হয়, ঠিকমত খেলতে পারে। সবাই ভাবছে গাড়ির জন্যে তার মন খারাপ, আসলে মোটেও তা নয়। বরং কেসটা নিয়েই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে মনে। চীফের সাবধান বাণী মনে পড়ছে: সাবধান! খুব সাবধান!

উলফোর্ড হাই স্কুলের পার্কিং লটে বাস ঢুকল। খেলোয়াড়েরা সব নেমে এসে ঢুকল ভিজিটরস লকার রুমে। সারি দিয়ে দাঁড়াল।

মুসাকে ডেকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেলেন কোচ অ্যামেন্ডসন। 'তুমি ঠিক আছ তো, মুসা? আজ খেলতে পারবে?'

'পারব।'

'ভেবে বলো। তোমার টীমের চারজন খেলোয়াড় সব বলেছে আমাকে। তোমার মনের অবস্থা নাকি খুবই খারাপ।'

'আমি ভেবেই বলছি। খেললেই বরং ভাল লাগবে আমার।'

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসলেন কোচ। 'তোমার কাছ থেকে এই জবাবই আশা করেছিলাম আমি। যাও, জার্সি পরে নাও।'

আর দশটা লকার রুমের মতই এই রুমটাও। কাঠের বেঞ্চে বসে পুরানো একটা ধাতব লকারের দরজা খুলল মুসা।

ধড়াস করে উঠল বুক। যেন বুকের খাঁচায় বল লাফাচ্ছে। লকারের মরচে পড়া তলদেশে পড়ে আছে একটা খাম।

আবারও খাম!

দ্রাম করে দরজাটা লাগিয়ে দিতে গিয়েও দিল না মুসা। বরং খামটা তুলে এনে খুলল।

ভেতরে একটা নোট। তাতে লেখা:

শোরমন্টের কথা ভুলে যাও। ওটা তোমার জন্যে নয়। বাড়াবাড়ি করতে যাবে না। তাহলে খারাপ হবে। আজকেও খেলা বন্ধ রাখো। নইলে বাস্কেটবল খেলা শেষ হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে।

নাড়ির গতি বেড়ে গেল তার। ফুসফুসটা মনে হচ্ছে বাতাস টেনে কুলাতে পারছে না। লাথি দিয়ে লাগিয়ে দিল লকারের দরজা। ঘুরে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'এটা কে রেখেছে আমার লকারে?'

ফিরে তাকাল প্রতিটি চোখ।

আবার চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কে?'

বিড ওয়াকার বলল, 'কি হয়েছে? আমি রেখেছি।'

গটমট করে তার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা, 'কেন?'

'একটা লোক দিল। বলল, রবিন দিয়েছে। রেখে দিতে বলল, দিয়েছি। ঘটনাটা কি? কোন সমস্যা?'

মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল মুসার। লকারে খাম না রেখে বোমাও রাখতে পারত। আবার তাকাল নোটটার দিকে। আগের টাইপরাইটারেই লেখা? মাইকেল অ্যান্থনির কাছ থেকে এসেছে? রবিন কে নিশ্চয় জেনে গেছে সে।

লকার রুমে উঁকি দিলেন কোচ অ্যামেন্ডসন। 'কি ব্যাপার? এত দেরি কেন তোমাদের? জলদি এসো।'

নোটটা লকারে ছুঁড়ে দিয়ে জার্সি পরতে শুরু করল মুসা।

কয়েক মিনিট পর কোর্টে বেরোল রকি বীচ টীম। দর্শকদের মাঝে দারুণ উত্তেজনা। উলফোর্ড টীমের ব্যান্ড পার্টি বাজনা বাজাচ্ছে যেন সমস্ত শক্তি

দিয়ে। সমর্থকরা রকি বীচ টীমকে টিটকারি দিচ্ছে। মাইক্রোফোন গরম করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে যেন গেম অ্যানাউন্সার। রকি বীচের ব্যান্ড বাদকরাও বাজনা বাজাচ্ছে, তবে উলফোর্ডদের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

এই ধরনের উত্তেজনা ভাল লাগে মুসার। খেলায় উৎসাহ পায়। কিন্তু আজ সে-রকম কিছু হলো না। কেসটাই ঘুরছে মাথার মধ্যে। কেউ একজন তাকে আঘাত করার জন্যে অপেক্ষা করছে। কে সে? কি আঘাত হানবে?

দর্শকদের দিকে তাকাল সে। অপরিচিত মুখের সমুদ্র যেন। প্রতি সেকেন্ডে জিমনেশিয়ামের শোরগোল আরও বাড়ছে। কিন্তু মুসার কানে সে-সব ঢুকছে না। সে একটা কথাই শুনতে পাচ্ছে যেন বার বার: *বাস্কেটবল খেলা শেষ হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে!*

মন শক্ত করে নিল মুসা। মনে মনে বলল, আমি খেলব! দেখি কে আমার কি করতে পারে!

শুরু হলো খেলা।

উলফোর্ডের খেলোয়াড়েরা অনেক লম্বা, সবচেয়ে খাটো যুবকও মুসার চেয়ে লম্বা। বল নিয়ে দ্রুত এগোল রকি বীচের বাস্কেটের দিকে। কিন্তু ছোঁড়া ভাল হলো না। মিস করল।

বল পেয়ে গেল রকি বীচ। কোর্টের মাঝামাঝি জায়গায় আছে বিড, তার কাছে বহুদূর থেকে বল ছুঁড়ে দিল কোরাজন। মুসার কাছে পাশ করে দিতে যাচ্ছিল বিড, কিন্তু মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াল ডোভার নামে উলফোর্ডের এক খেলোয়াড়। বলের চেয়ে যেন মুসার দিকেই নজর বেশি তার। বুকে ধাক্কা দিয়ে মুসাকে সরিয়ে দিল একপাশে।

এদিক সরে, ওদিক সরে পাশ কাটিয়ে সামনে আসার চেষ্টা করল মুসা। এক সুযোগে সরেও এল। তাকে খোলা জায়গায় দেখে বল ছুঁড়ে দিল বিড।

কিন্তু হঠাৎ করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল মুসা। বলটা উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

ভীষণ রেগে গেল সে। ল্যাঙ মেরে তাকে ফেলে দিয়েছে ডোভার।

'অ্যাই, এটা কি ধরনের খেলা হলো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'যে ধরনের দেখলে,' জবাব দিল ডোভার।

খেলা চলল। আরও নানা অঘটন ঘটতে লাগল। মুসা বুঝে ফেলল, ইচ্ছে করে তাকে জখম করার চেষ্টা করছে ডোভার। সুযোগ পেলেই রেফারির অলক্ষে ফাউল করতে চাইছে। এড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো মুসা

কনুই চালাল ডোভার। লাগল মুসার চোখের পাশে। বসে পড়তে হলো তাকে। কোর্টের বাইরে এসে বরফ ঘষতে হলো ব্যথা কমানোর জন্যে।

বিশ্রামের সময় হলো। কোর্টের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ঠেলে ফেলে দিল তাকে দর্শকদের সীটের ওপর। চেয়ারের কোণায় লেগে কপাল কেটে গেল তার। রক্ত বেরোতে লাগল।

আবার খেলা শুরু হলো। এবারও তার পেছনে লাগল ডোভার। তাকে সামলানোই এক ঝামেলা, তার ওপর বল ধরা, হিমশিম খেয়ে গেল মুসা

পয়েন্টের দিক থেকে এগিয়ে আছে মুসার টীম, তবে বিপক্ষও খুব পিছিয়ে নেই। খেলা জমেছে।

কানের কাছে ডোভার বলে উঠল, 'বেশি চালাকি করতে যেয়ো না। মারা পড়বে।'

কিন্তু হুমকিতে ভয় পেল না মুসা। একটা ব্যাপার বুঝে গেছে, যত বাড়াবাড়িই করুক, দর্শকদের চোখের সামনে কোর্টে তাকে মারাত্মক কোন আঘাত করার সাহস পাবে না ডোভার। ওর হাত থেকে থাবা দিয়ে বল কেড়ে নিয়ে বিডকে পাশ দিল। যেই রেফারি বিডের দিকে নজর দিল, মুসার গায়ের সঙ্গে প্রায় সেঁটে গিয়ে ধাঁ করে তার কিডনিতে কনুই চালাল ডোভার।

তীক্ষ্ণ ব্যথা বিদ্যুৎ স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল যেন মুসার শরীরে। হাঁ করে দম নিতে লাগল। তার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসল ডোভার।

খেলা চলছে। আর পাঁচ মিনিট আছে শেষ হতে। দুই পক্ষেই এখন সমান সমান পয়েন্ট।

হঠাৎ বল এসে লাগল মুসার মাথার পেছনে। ঘুরে উঠল মাথাটা। সামলে নিয়ে ফিরে তাকাতে চোখ পড়ল ডোভারের ওপর। ছুঁড়ে দেয়ার ছুতোয় ইচ্ছে করে মেরেছে। কার হয়ে কাজ করছে শয়তানটা—ভাবল মুসা। মাইকেল অ্যান্থনির?

মিনিটখানেক পর সময় শেষের সঙ্কেত ঘোষণা করা হলো কোচ ডাকলেন, 'বসে পড়ো, মুসা।'

'না,' গোঁয়ারের মত বলে উঠল মুসা, 'সারাক্ষণ আমার পেছনে লেগে ছিল ডোভার। আমাকে জখম করতে চেয়েছে। আমি ওকে ছাড়ব না।'

'দেখো, খেলার মধ্যে ওরকম একটু আধটু হয়েই থাকে,' ধমক দিয়ে বললেন কোচ। 'ব্যক্তিগত আক্রোশ দেখানোর কোন কারণ নেই।'

আর অমান্য করল না মুসা। মাথা ঝাঁকিয়ে নীরবে বসে পড়ল।

খেলা ড্র। আরও পাঁচ মিনিট সময় বাড়িয়ে দেয়া হলো। আবার শুরু হলো খেলা।

প্রথমেই রকি বীচের হাত থেকে বল কেড়ে নিল উলফোর্ড। ছুটে গেল বাস্কেটের দিকে। মরিয়া হয়ে উঠেছে পয়েন্টের জন্যে

খেলার কয়েক সেকেন্ড বাকি থাকতে বাস্কেটে সই করে বল ছুঁড়ল একজন খেলোয়াড়। মিস করল।

বলটা কেড়ে নিল বিড পাশ করে দিল মুসাকে। বল নিয়ে ছুটল মুসা।

পাগল হয়ে উঠেছে যেন দর্শক। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে তাকে

ডোভার কাছাকাছি আছে কিনা তাকাল না মুসা। তার একমাত্র লক্ষ্য প্রতিপক্ষের বাস্কেট। পৌঁছে গেল সেখানে। লাফ দিয়ে উঠল শূন্যে। ছুঁড়ে দিল বল।

তারপর নিজেই বিস্মিত হয়ে দেখল রিঙ গলে পড়ছে বলটা।

খেলা শেষের সঙ্কেত শোনানো হলো।

মুসাকে ঘিরে ধরল তার টীমের প্লেয়াররা। পিঠ চাপড়ানো, চুমু খাওয়া চলল কয়েক সেকেন্ড। ইতিমধ্যে পৌঁছে গেল কয়েকজন অতি উৎসাহী রকি বীচ সমর্থক। মুসাকে কাঁধে করে নিয়ে এল লকার রুমের কাছে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে উলফোর্ডরা। ডোভারকে খুঁজছে মুসার চোখ। দেখতে পেল না। বেশি তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে আনা হয়েছে।

সারা রাত ধরেই চলবে বিজয় উৎসব। কিন্তু তাতে কোন আকর্ষণ নেই মুসার। তাড়াতাড়ি খাওয়ার সেরে এখন ডোভারকে খুঁজে বের করতে চায়।

জিমনেশিয়ামের বাইরে পার্কিং লটের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে রইল মুসা।

ডোভারকে আসতে দেখল।

কাছে এলে অন্ধকার থেকে বেরোল মুসা। বলল, 'দাঁড়াও!'

চমকে গেল ডোভার।

'আমার পেছনে কে লাগিয়েছে তোমাকে?' ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

চুপ করে রইল ডোভার।

'জলদি বলো!' আবার ধমক দিল মুসা। 'আমার হাতে সময় কম। বলো, নইলে ফাউল করা কাকে বলে শিখিয়ে দেব!'

'সরো সরো!' ঠেলা দিয়ে মুসাকে সরিয়ে এগোনোর চেষ্টা করল ডোভার।

দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুসা।

তার পেটে ঘুসি মারল ডোভার।

প্রচণ্ড ব্যথা পেল মুসা। হাঁ হয়ে গেল, তবে মুহূর্তে সামলে নিল। এটা খেলার মাঠ নয় যে ফাউলের ভয়ে চুপ করে থাকবে। আর সুযোগ দিল না ডোভারকে। এক পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে কারাতের লাথি চালাল। একটা গাড়ির হুডে গিয়ে পড়ল ডোভার। গোড়ালি ধরে তাকে টেনে এনে ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মুসা।

কারাত একটা চমৎকার জিনিস। মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে রইল ডোভার। খেলার সময় যে মাতব্বরির ভঙ্গিটা করেছিল, বাষ্প হয়ে উড়ে গেল যেন সেটা।

'হ্যাঁ, এইবার বলো,' ডোভারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কে আমাকে মারতে বলেছে?'

'জানি না,' দুর্বল ভঙ্গিতে জবাব দিল ডোভার। 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'এখনই পারবে,' বলে ডোভারের শার্টের কলার ধরে টেনে তুলে বসিয়ে দিল। হাত তুলল ঘাড়ে রদ্দা মারার জন্যে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল ডোভার, 'সত্যি বলছি, কসম খোদার, লোকটা তার আসল নাম বলেনি আমাকে! দু-শো ডলার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল খেলার সময় তোমাকে বাধা দেয়ার জন্যে। একটা চিঠিও দিয়েছে তোমাকে দেয়ার জন্যে। তোমার টীমের একজনের হাতে দিয়েছি। পড়িনি আমি। আর

কিছু জানি না।'

'আসল নাম বলেনি মানে?'

'ছদ্মনাম বলেছে। নিজেই স্বীকার করেছে সেটা।'

'কি নাম?'

'মাইকেল অ্যান্থনি।'

চোদ্দ

সেদিন গভীর রাতে রকি বীচের একটা অসাধারণ দোকান-কাম-ক্লাব-কাম-রেস্তোরাঁ হ্যাঙ্ক'স ২৪-আওয়ার ওয়ান-স্টপে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। ফ্লোরেসেন্ট আলোর জাদু তৈরি করা হয়েছে এখানে।

হ্যাঙ্কের একটা স্পেশাল স্যান্ডউইচ আর এক বোতল সোডা নিয়ে বসেছে মুসা। মাঝরাতের পর কাস্টোমার এলে কেবল স্যান্ডউইচের দাম নেয়া হয়, সোডা বিনামূল্যে। তবে স্যান্ডউইচটা দিনের মত ভাল হয় না, কারণ বেঁচে যাওয়া খাবার থেকে তৈরি করা হয় এটা। তারপরও অন্যান্য অনেক জায়গার চেয়ে স্বাদ ভাল। আজকে তৈরি হয়েছে মিটলোফ আর টিউনা সালাদ দিয়ে।

খেতে খেতে কিশোর আর রবিনকে খেলার কোর্টে কি ঘটেছে খুলে বলল মুসা। তারপর ঢকঢক করে গিলে নিল ৩২ আউন্স সোডা।

'শরীরটা একদম শিরিস কাগজ হয়ে গেছে,' বলল সে। 'খসখসে শুকনো।'

'এর নাম ডিহাইড্রেশন, শরীরের পানিশূন্যতা,' বলল কিশোর। 'খেলার সময় অনেক ঘাম ঝরিয়েছ। তোমার এখন কেমন লাগছে বুঝতে পারছি।'

'ভাল কথা,' মুচকি হাসল মুসা, 'আজকেও তো শোরমন্টে তোতা সাজলে, কেমন লাগল? মারতে এসেছিল কেউ? নতুন কিছু জেনেছ?'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'একটা মিনিটের জন্যে কেসের কথাটা ভুললে কেমন হয়?' রবিন বলল 'মুসার বিজয়ের সেলিব্রেশনটাই চলুক।'

'জায়গাটা সত্যি অস্বাভাবিক,' মুসা বলল। চারপাশে তাকাল সে। 'দোকানের সবাই অমন কালো পোশাক পরেছে কেন?'

'আজ বুধবার,' বুঝিয়ে বলল রবিন। 'হ্যাঙ্কের বিশেষ ব্যবস্থা। এদিনে মূল্যহ্রাসের ব্যবস্থা। যা-ই খাবে, অন্যান্য দিনের চেয়ে দশ পার্সেন্ট কমে।'

'তুমি এত কথা জানলে কি করে? প্রায়ই আসো নাকি?'

'বেশি রাতে গানের রেকর্ডিং শেষ হওয়ার পর বহুদিন খেতে এসেছি তখনই জেনেছি খাবার ছাড়াও আরও বিভিন্ন সুবিধে আছে এখানে। সকালের

খবরের কাগজের প্রথম সংস্করণটাও আসে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে। রাতে দুটোয়ই চলে আসে। এ-ব্যাপারে কড়া নজর রাখে হ্যাঙ্ক নিজে।'

'কাগজে আমার সম্পর্কে খবর ছাপা হবে তুমি শিওর?'

'অত আশা কোরো না,' বড় করে হাই তুলল কিশোর। 'দুরাশাও হতে পারে।'

'ওর কথা শুনো না,' হাত নেড়ে বলল রবিন। 'আমি বলছি তোমাকে—যা বলেছ, যে ভাবে বল ছুঁড়ে জিতেছ, তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, খবরটা আসবেই কাগজে। না আসার কোন কারণ নেই।'

'আমি ভাবছি মুসার লকারের নোটটার কথা,' বলল কিশোর।

আবার কেস! মুসা আর রবিন দু-জনেই গুঙিয়ে উঠল।

কেয়ার করল না কিশোর। বলল, 'নোটের ব্যাপারটা জরুরী, তাই না? ম্যানারি জোনস আমাদের ভয় দেখিয়ে থামাতে চাইছে, তারমানে সমাধানের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা।'

আরেকটা বিশাল সোডার অর্ডার দিয়ে একটু আগে কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করল মুসা, 'অত আশা কোরো না। দুরাশাও হতে পারে।'

কথাটায় কান না দিয়ে কিশোর বলল, 'প্রেসিডেন্ট কলিন চাইছেন জোনস কার হয়ে কাজ করছে সেটা বের করতে। সেই কাজটাই করতে হবে এখন আমাদের।'

'করো,' বলে দিল রবিন।

টেবিলে কপাল রেখে পুরো আধ মিনিট পর মাথা তুলল কিশোর। 'তোতাপাখির সাজ সেজে অনেক নাচা নেচেছি। খুব ক্লান্ত লাগছে। চোখে ঘুম। না ঘুমিয়ে আর পারব না। খবরের কাগজের দরকার নেই। চলো বাড়ি যাই।'

ঘড়ি দেখে বলল রবিন, 'আর বেশিক্ষণ লাগবে না···ওই তো, এসে গেছে।'

তাড়াহুড়ো করে ক্যাশ রেজিস্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রবিন, একটা খবরের কাগজ কেনার জন্যে।

কিশোরের প্লেটে অর্ধেকটা স্যান্ডউইচ রয়ে গেছে। সেটা দেখিয়ে মুসা জানতে চাইল, 'খাবে? না খেয়ে ফেলব?'

প্লেটটা মুসার দিকে ঠেলে দিল কিশোর। 'মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা যদি কম না খেতাম, উপোস করে থাকতে হত তোমাকে।'

এ কথায় কিছুই মনে করল না মুসা। নির্বিকার ভঙ্গিতে আধখাওয়া স্যান্ডউইচটা তুলে নিয়ে কামড় বসাল।

প্রায় ছুটতে ছুটতে এল রবিন। চিৎকার করে বলল, 'দেখো, হেডলাইন করে ফেলেছে! কাজই করেছ একখান, মুসা!' কাগজটা টেবিলে ফেলে দিল সে।

'খাইছে!' ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা। 'আবার ছবিও ছেপেছে!'

অনেক বড় করে লেখা হয়েছে খবরটা। হিরো বানিয়ে দেয়া হয়েছে মুসা

আমানকে।

মুসার পড়া শেষ হতে কাগজটা টেনে নিল কিশোর। নিচের দিকে তাকাল।

'খবরটা ওপরে,' মুসা বলল।

'তোমারটা দেখছি না আমি,' বলল কিশোর। 'এই দেখো, শোরমন্টের খবরও ছেপেছে।' ছবিতে দেখা গেল শোরমন্টের খেলোয়াড়রা একটা কাঠের বেঞ্চিতে সারি দিয়ে বসেছে।

'এটা নতুন কিছু নয়।'

'খেলোয়াড়দের পেছনে দেখো,' উত্তেজিত হয়ে বলল কিশোর। 'সীটে বসা।'

মুসা দেখছে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এল রবিন। 'কই, আর কি আছে? কিছু তো দেখছি না।'

মুসাকে বলল কিশোর, 'তুমিও দেখছ না?'

দুই কনুইয়ে ভর রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলল মুসা, 'আরে এ তো সেই মেয়েটা! সেদিন ক্লাবে জোনসের সঙ্গে যাকে দেখেছিলাম! এখন বসেছে ব্র্যানসন বারের সঙ্গে!'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তারমানে ম্যালরি জোনস আর ব্র্যানসন বার দু-জনের সঙ্গেই পরিচয় আছে মেয়েটার। একটা সমীকরণ করা যাক: জোনস চেনে মেয়েটাকে, বারও চেনে; সুতরাং জোনস আর বার দু-জন দু-জনকে চিনতে অসুবিধে কি? তারমানে একটা নতুন সূত্র পেলাম আমরা, এবং সন্দেহ করার মত নতুন আরেকজন লোক।'

চোখ কুঁচকাল মুসা, 'বার?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? ভেবে দেখো না ভাল করে, হয়তো এ কারণেই জোনসের সঙ্গে কোচ ম্যাডিরার কোন যোগাযোগ খুঁজে পাইনি আমরা, হয়তো যোগাযোগ নেইই। তবে জোনসের সঙ্গে বারের যে যোগাযোগ আছে, এটা নিশ্চিত।'

খুক করে কাশল রবিন। 'তোমাদের কথার মাথামুণ্ড কিছু ঢুকছে না আমার মাথায়। দেখি তো কাগজটা।' মুসার হাত থেকে নিয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল, সীটে বসা মানুষটার দিকে, 'কি নাম বললে?'

'ব্র্যানসন বার,' বলল কিশোর। 'শোরমন্ট কলেজে আরেকটা জিমনেশিয়াম খোলার টাকা দিতে চান। ম্যাডিরার ফাণ্ডেও দান করতে চান।'

'তারমানে টাকার কুমির। এই লোকই ম্যাডিরার বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড়ের জন্যে চাপ দিয়েছেন তোমাদের?'

'চাপ মানে? পারলে চেপেই বসেন আমাদের ঘাড়ে,' মুসা বলল।

'আমি তাঁকে দেখেছি,' হাসি ফুটল রবিনের মুখে।

'দেখেছ? কখন? কোথায়?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'গত হপ্তায়, যখন শোরমন্টের জিমনেশিয়ামে তোমার সঙ্গে দেখা করতে

গিয়েছিলাম। ম্যাডিরার অফিসে ঢুকেছিলাম খোঁজখবর করার জন্যে, তখন তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছি। অল্পবয়েসী একটা মেয়ে, গানের পাগল। সুতরাং খাতির করে নিতে দেরি হয়নি। বারকে ঢুকতে দেখলাম। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওই ভদ্রলোক প্রায়ই ঢোকেন ম্যাডিরার অফিসে। কত লোককেই তো ঢুকতে-বেরোতে দেখলাম, সুতরাং গুরুত্ব দিইনি।'

'ঠিক কি ঘটেছিল বলো তো?' পিঠ সোজা করে ফেলেছে কিশোর। ঘুম দূর হয়ে গেছে।

'ঢুকে সোজা ম্যাডিরার ব্যক্তিগত অফিসে চলে গেলেন। দরজা লাগিয়ে দিলেন। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, প্রতি হপ্তায়ই আসেন, সাধারণত বিষ্যুৎবারে: যখন ম্যাডিরা থাকেন না। ম্যাডিরার কম্পিউটার ব্যবহার করেন। খেলার লেটেস্ট লিস্টের প্রিন্টআউট বের করে নেন। শোরমন্টে জিমনেশিয়ামের জন্যে অনেক টাকা ঢালবেন ভদ্রলোক, মেয়েটা জানে, তাই বাধা দেয় না। কিছু সন্দেহও করে না। ভাবে, খেলার পাগল।'

'বার গিয়ে ম্যাডিরার কম্পিউটার ব্যবহার করেন?' খবরটা অবাক করেছে মুসাকে।

'যখন কোচ ওখানে থাকেন না,' বলল রবিন। 'কি বুঝলে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'বুঝেছি। ইচ্ছে করলেই লিস্টের সঙ্গে ম্যাডিরার স্কাউটিং রিপোর্টও বের করে নিতে পারেন বার। দেখে নিতে পারেন কাকে কাকে রিক্রুট করতে চান ম্যাডিরা, কোন খেলোয়াড়ের ওপর জোর দেন...'

'তারপর গিয়ে,' মুসাও বুঝে ফেলেছে, 'মাইকেল অ্যান্থনিকে বলেন ওই খেলোয়াড়কে ঘুষ দিয়ে আসতে!'

'এইটাই একমাত্র ব্যাখ্যা,' বলল কিশোর। 'মুসার ব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি খবর পাওয়াটা সম্ভব হয়েছে এ ভাবেই। জানার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে অ্যান্থনিকে টাকা পাঠাতে বলেছেন বার। আর আমরা সন্দেহ করে বসে ছিলাম ম্যাডিরাকে।'

'অথচ তিনি নির্দোষ।'

এ কথার জবাব না দিয়ে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'রবিন, হ্যাঙ্ক কি মিল্ক শেক বিক্রি করে?'

'কেন? বেশি টায়ারড্ লাগছে?' মুসার প্রশ্ন।

'লাগছে। সেটা কাটাতে হলে দুধ দরকার। তা ছাড়া এ মুহূর্তে আর ঘুমাতে যেতে পারছি না ব্র্যানসন বারকে ফাঁদে ফেলার জন্যে প্ল্যান তৈরি করতে হবে।'

কিশোরের প্ল্যানটা সাধারণ। কোচ ম্যাডিরার লেটেস্ট স্কাউটিং রিপোর্টে টোপ ঢোকানো হবে। সেই বড়শিতেই বারকে গেঁথে তুলতে পারবে বলে

কিশোরের ধারণা। পরদিনই বৃহস্পতিবার। সুতরাং অপেক্ষাও করতে হবে না বেশি সময়।

পরদিন সকালে উঠেই শোরমন্ট কলেজে চলে এল তিন গোয়েন্দা। সোজা এসে ঢুকল ম্যাডিরার অফিসে।

ঘর পরিষ্কারের ঝাড়ু, বালতি এ সব রাখার একটা আলমারিতে লুকিয়ে রইল মুসা আর কিশোর। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল, সেক্রেটারি মেয়েটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রবিন। হাত নেড়ে হেসে বলল, 'হাই, চিনতে পারো?'

'পারব না কেন?' মেয়েটাও হাসল। 'তুমি রবিন।'

'হ্যাঁ।'

'নতুন কোন ক্যাসেট বেরিয়েছে নাকি?'

'বেরিয়েছে।'

'চলো, চা খেতে খেতে কথা বলব।'

রবিনকে নিয়ে পাশের ক্যান্টিনে চলে গেল মেয়েটা। ঘর খালি। এই সুযোগে আলমারি থেকে বেরিয়ে এসে ম্যাডিরার ব্যক্তিগত অফিসে ঢুকল কিশোর আর মুসা।

মুহূর্তে কম্পিউটার চালু করে ফেলল কিশোর। কী-বোর্ডে উড়তে লাগল যেন আঙুলগুলো। টাইপ শুরু করল। ধীরে ধীরে চওড়া একটা হাসি ফুটল তার মুখে।

'হাসি কিসের?' দরজার দিকে চোখ রেখেছে মুসা, আড়চোখে কিশোরের মুখ দেখে জিজ্ঞেস করল।

'পরে বলব। আগে শেষ করে নিই।'

টাইপিং শেষ করল কিশোর। বলল, 'প্রথম কাজ শেষ। চলো, যাই।'

আবার এসে আলমারিতে লুকাল দু-জনে। বারের আসার অপেক্ষায় রইল। কিশোর আশা করল, ভোর বেলাতেই ঘর পরিষ্কার করে গেছে ঝাড়ুদার, সন্ধ্যার আগে আর আসবে না। আলমারিও খুলবে না। তার ধারণা ভুল হলেই সর্বনাশ। ধরা পড়তে হবে। আর ধরা পড়লে কোন কৈফিয়ত নেই।

বসে বসে ঘামতে লাগল দু-জনে।

দুই ঘন্টা পর এলেন বার।

কয়েক মিনিট পর রবিন এসে জানিয়ে গেল, ম্যাডিরার অফিসে ঢুকে প্রিন্টআউট বের করে নিয়ে চলে গেছেন।

আলমারি থেকে বেরোল কিশোর আর মুসা।

কিশোর বলল, 'কম্পিউটার ব্যবহার করেছেন বার। সারা সকাল ধরে অফিসে নেই ম্যাডিরা। আমাদের দুই নম্বর কাজ শেষ। এবার তিন নম্বর। মুসা, তোমাকে যেতে হবে। আমি যেতে পারছি না। যে কোন মুহূর্তে ম্যাডিরা চলে আসতে পারেন। আমাকে দেখলেই সন্দেহ করবেন।

তোমাকে করবেন না। যা খুশি একটা বানিয়ে বলে দিতে পারবে, কারণ তুমি তাঁর টীমের খেলোয়াড়। সেক্রেটারিও আমার কাছে কৈফিয়ত চাইতে পারে। যা বললাম ঠিকঠাক মত করবে।'

হাতে একটা ক্লিপবোর্ড আর একটা কলম নিয়ে এগোল মুসা। ডেস্কের ওপাশ থেকে তার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'কোন সাহায্য করতে পারি?'

'কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স থেকে এসেছি,' জবাব দিল মুসা। 'চেক করতে হবে। রুটিন চেক। ক'টা আছে এখানে?'

'কোচ ম্যাডিরার অফিসে একটা। এসো, দেখিয়ে দিই।'

'থ্যাংকিউ।'

কম্পিউটারের সামনে বসল মুসা। পলকে কপালে দেখা দিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। একটা আস্ত গাড়িকে খুলে টুকরো টুকরো করে ফেলতে কষ্ট হয় না তার, কিন্তু কম্পিউটার অন্য জিনিস, বুনো জানোয়ার বলে মনে হয় তার কাছে। কী-বোর্ডে টাইপ করতে গিয়ে হাত কাঁপতে লাগল। তবে ঠিকমতই সারতে পারল কাজটা।

বেরিয়ে এসে সেক্রেটারিকে আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে চলে এল হলঘরে। বসে আছে কিশোর। তাকে দেখে উঠে এল। 'হয়েছে?'

'হয়েছে,' এখনও ঘামছে মুসা। 'খানিক আগে যা লিখে রেখে এসেছিলে, সব মুছে দিয়েছি।'

'গুড। তিন নম্বরও শেষ। এখন কেবল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে অলিভার পিটের সঙ্গে কখন যোগাযোগ করে মাইকেল অ্যান্থনি।'

পনেরো

'কল্পিত অলিভার পিটের কথা এবার বলো তো শুনি,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল রবিন। রকি বীচে ফিরে চলেছে ওরা।

অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল কিশোর, 'স্কাউটিং রিপোর্টে যা যা লিখেছিলাম? শুরুতেই ধরা যাক, অলিভার একজন ছাত্র।'

'বাস্কেটবল কোচের কাছে এটাই সব সময় প্রধান,' বলল রবিন।

'আমার কাছেও প্রধান। তাই আমি সৃষ্টি করেছি ও রকম করেই। সে ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা।'

'খুব ভাল বাস্কেটবল খেলতে পারবে,' ফোড়ন কাটল মুসা।

'বল ছুঁড়ে বাস্কেটে ঢুকিয়ে দেয়ার রেকর্ড আছে তার,' কিশোর বলল। 'খুব জোরে ছুটতে পারে, হালকা শরীর, সাংঘাতিক ক্ষিপ্র। কোচ ম্যাডিরার ধারণা খুব ভাল প্লেয়ার হতে পারবে অলিভার, বাস্কেটবলের জাদুকর ম্যাজিক জনসনের মত।'

'খাইছে! এ তো সোনার টুকরা ছেলে। আমি কোচ হলে লুফে নিতাম।'

'এ কারণেই বানিয়েছি। বারের মুখে যাতে লালা ঝরে, শোরমন্টের টীমে ঢোকানোর জন্যে। আরও একটা কথা যোগ করে দিয়েছি—অলিভার আজ কোন কলেজে ভর্তি হবে ঠিক করবে। রবিন, তোমাদের বাড়ির ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়েছি। এখন গিয়ে ওখানে চুপ করে বসে থাকব ফোনের আশায়।'

দুপুর বেলা এল ফোন।

রিসিভার তুলল রবিন। ওপাশের কথা শুনেই মুসা আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে ইশারায় জানাল আসল লোকই করেছে।

'হ্যাঁ, অলিভার পিট বলছি,' দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রবিন।

উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ। যে ভাবে প্ল্যান করেছিল সে-ভাবেই ঘটতে যাচ্ছে সব কিছু।

মাইকেল অ্যান্থনির কথায় আগ্রহ দেখাল প্রথমে রবিন, তারপর ফাঁদ পাততে শুরু করল, 'অবশ্যই কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে। কিন্তু বাইরে কোথাও কথা বলাটা ঠিক ভাল মনে করছি না আমাদের বাড়িতে চলে আসুন না অসুবিধে হবে না। বাবাও বাড়িতে আছে। দিন কয়েক আগে কাজ চলে গেছে তার। টাকা দরকার আমাদের তা ছাড়া এমন কলেজ যদি পাওয়া যায় যেখানে পড়তে পয়সা লাগবে না, বরং আসবে, সেখানে যেতে কে না ইনটারেস্টেড হয়।'

আবার ওপাশের কথা শুনল সে। দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রিসিভারে বলল, 'ঠিক আছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চলে আসুন বেরোব না।'

ঠিক এক ঘণ্টা পর দরজার ঘণ্টা বাজল। খুলে দিল রবিন। বলল, 'আসুন আপনি নিশ্চয় মাইকেল অ্যান্থনি। আমি অলিভার।'

ঘরে এসে বসল ম্যানারি জোনস। খানিকটা অবাক হয়েই তাকাল রবিনের দিকে। 'স্কাউটিং রিপোর্টে আছে তোমার উচ্চতা ছয় ফুট ছয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক কম।'

'বল ছোঁড়ার সময় যখন লাফ দিই অনেক লম্বা হয়ে যায় আমার শরীর। বিশ্বাসই করতে পারবেন না। বোধহয় সেটাই লিখেছে।'

কথাটা মানতে পারল না জোনস। দ্বিধায় পড়ে গেল। নড়েচড়ে বসল চেয়ারে। 'সত্যি তুমি অলিভার পিট তো?'

'কি মনে হয় আপনার? অনেকের ধারণা ম্যাজিক জনসনের জায়গা দখল করব আমি। টাকার কথা বলুন, মিস্টার অ্যান্থনি। কত দেবেন? আরও তিনটে স্কুল ইতিমধ্যেই ঘুষের প্রস্তাব নিয়ে এসে ঘুরে গেছে।'

মুখের ভাব শান্ত রেখেছে জোনস। চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে। হঠাৎ বলল, 'ঠিক আছে, আমি যাই।' রবিনের কথা বিশ্বাস করেনি। সন্দেহ জেগেছে তার।

জোনস ওঠার আগেই তাড়াতাড়ি বলল রবিন, 'আরে বসুন, বসুন। আপনার কথা বলেছি বাবাকে। এলে ডেকে দিতে বলেছে। দেখা করে যান।' দরজার দিকে তাকিয়ে ডাক দিল, 'মিস্টার অ্যান্থনি এসেছেন। এসো।'

সঙ্গে সঙ্গে দু-পাশের দরজা দিয়ে লিভিং রুমে ঢুকল মুসা আর কিশোর। জোনসের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যেতে খুব মজা পেল ওরা।

কিশোর বলল, 'গুড আফটারনুন, মিস্টার জোনস। চীফ ইয়ান ফ্লেচারের অফিসে আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, আমরা তিন গোয়েন্দা। দু-জনকে দেখেছিলেন সেদিন। আরেকজনের সঙ্গে পরিচয় করুন। ও হলো আমাদের তৃতীয় সদস্য, রবিন মিলফোর্ড।' হাসি চাপা দিতে পারল না সে। 'বোকার মত আমাদের ফাঁদে পা দিয়ে যে চলে এসেছেন ঘুষের প্রস্তাব দিতে, তার জন্যে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না, মিস্টার জোনস। একটা টেপরেকর্ডার চালু করা আছে। আপনার কথা সব রেকর্ড হয়ে গেছে। এ সবের পেছনে কে আছে প্রমাণ করে দিলেন এসে।'

'না, করিনি। কারণ আমি নেই এ সবের পেছনে।'

'তাহলে অন্য লোক আছে। আপনি তার সহযোগী,' রবিন বলল। 'নইলে এলেন কেন?'

'দেখুন, মিস্টার জোনস,' কিশোর বলল, 'একটা উপায়েই কেবল অলিভার পিটের নাম এবং তার ফোন নম্বর জানার কথা আপনার, কারও মুখে শুনে। সেই লোক মিস্টার ব্র্যানসন বার। আর কারও জানার কথা নয়, কারণ অলিভার পিট নামে কোন বাস্কেটবল খেলোয়াড় রকি বীচে নেই।'

জোনসের চেয়ারের দুই ফুট দূরে আরেকটা চেয়ারে বসল কিশোর। দীর্ঘ সময় ধরে চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দু-জনে।

'আমি কোন রকম অপরাধ স্বীকার করব না, বুঝলে,' অবশেষে বলল জোনস। 'ব্র্যানসন বারকে সহযোগিতা যদি করেই থাকি, অসুবিধেটা কি? বেআইনী কিছু করিনি। আর ব্র্যানসন বারও করেননি।'

'হয়তো। কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা আপনার আইন ব্যবসার সর্বনাশ করে দিতে পারে। ওরা আপনাকে খারাপ চরিত্রের লোক বানিয়ে ছাড়বে। এক কাজ করলে এ সবের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন আপনি। প্রেসিডেন্ট কলিনকে সাহায্য করলে তিনি আপনাকে এর বাইরে রাখতে পারেন।'

পাথরের মত হয়ে আছে জোনসের মুখ। শীতল কণ্ঠে বলল, 'বেশ, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি আছি আমি। দেখি কি বলেন?'

রবিনের গাড়িতে করে শোরমন্ট কলেজে চলেছে ওরা। হাসিমুখে বসে আছে কিশোর। আসার আগে প্রেসিডেন্ট কলিনকে ফোন করে সব কথা জানিয়েছে। ব্র্যানসন বার আর কোচ ম্যাডিরাকেও ডেকে আনতে অনুরোধ

করেছে। আগে আগে চলেছে রবিনের গাড়ি। তাকে অনুসরণ করছে জোনস।

কলিনের অফিসে ঢুকে দেখল ওরা, বার আর ম্যাডিরা দু-জনেই বসে আছেন।

উঠে এসে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলালেন কলিন। কিন্তু তাঁর দিকে তাকানোর অবসর নেই কিশোরের। সে তাকিয়ে আছে ব্র্যানসন বারের মুখের দিকে। জোনসকে দেখে কেমন চমকালেন তিনি দেখছে। বিস্ময়, রাগ, ভয়, চমক, বিমূঢ়তা, সব একসঙ্গে দেখা দিল তাঁর মুখে। তারপর কঠিন দৃষ্টি সরালেন তিনি গোয়েন্দার দিকে।

'কিশোর,' প্রেসিডেন্ট বললেন, 'যা জেনেছ জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমরা। মাত্র দুই হপ্তায় কেসের সমাধান করে ফেলেছ, দক্ষ গোয়েন্দাই বলতে হচ্ছে তোমাদের। এখন বলো কি কি জেনেছ।'

'গোয়েন্দা? মনে হয় কিছু মিস করেছি?' জানালার কাছে বসা চেয়ার থেকে বললেন ম্যাডিরা। 'এখানে তো কোন গোয়েন্দা দেখছি না। দেখছি আমাদের তোতাপাখি আর হাই স্কুলের একজন খেলোয়াড়কে।'

ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'আসলে আমরা তিনজনেই,' রবিন আর মুসাকে দেখাল সে, 'হাই স্কুলের ছাত্র। শোরমন্টে কলেজ ছাত্রের ছদ্মবেশে ছিলাম আমি।'

'এখনই সব কথা জানতে পারবেন,' কোচকে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিশোর, খুলে বলো সব।'

কিশোরের তাড়া নেই। বারকে দেখছে। কঠিন লোক সন্দেহ নেই। তাঁকে ভাঙা সহজ হবে না। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে।

'কেসটার সমাধান করতে বেশ কষ্ট হয়েছে,' তার যা স্বভাব—নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল সে। 'তবে কিছু কিছু ব্যাপার সহজ হয়েছে। যেমন মিস্টার জোনসের চলে আসা, বাস্কেটবল খেলার জন্যে মুসাকে টাকা আর পোরশে গাড়ি ঘুষ দেয়া।'

'কী?' আঁতকে উঠলেন কোচ ম্যাডিরা।

'বাধা দেবেন না, ম্যাডিরা,' কঠোর কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'যখন জিজ্ঞেস করা হবে, তখন জবাব দেবেন।'

তাঁর ভঙ্গিতেই বোঝা গেল, ম্যাডিরাকেই অপরাধী ভেবে বসে আছেন।

মৃদু হাসি দেখা দিল বারের ঠোঁটের কোণে।

'আপনি ভুল করছেন, প্রেসিডেন্ট,' কিশোর বলল, 'কোচ ম্যাডিরা একেবারেই নিরপরাধ।'

'তাহলে অপরাধী কে?' ধৈর্য হারালেন প্রেসিডেন্ট।

'বলছি। তবে তার আগে মিস্টার বারকে একটা প্রশ্ন আছে। মিস্টার বার, অলিভার পিট কে জানেন?'

সতর্ক হয়ে গেলেন বার। 'অলিভার পিট?'

'হ্যাঁ। আপনি তাকে চেনেন, তাই না?'

ভাবনায় পড়ে গেলেন বার। ফাঁদটা কোথায় বোঝার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ধরতে পারলেন না। বলে ফেললেন, 'হাই স্কুলের বাস্কেটবল খেলোয়াড়। কোচ ম্যাডিরার স্কাউটিং রিপোর্টে নামটা দেখেছি। খুব নাকি ভাল খেলোয়াড়।'

বোকা হয়ে গেলেন যেন ম্যাডিরা, 'অলিভার পিট! নামও তো শুনিনি!'

দ্বিধায় পড়ে গেলেন বার। 'কিন্তু আপনার স্কাউটিং রিপোর্টে তো তার নাম দেখলাম। লিখেছেন ম্যাজিক জনসনের জায়গা দখল করতে যাচ্ছে সে।'

'না,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর, 'উনি লেখেননি এ কথা, আমি লিখেছি। অলিভার পিট নামে কোন প্লেয়ার নেই। বানিয়ে বানিয়ে লিখে দিয়ে এসেছি, জানি, আপনি পড়বেন। জানার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে মিস্টার জোনসকে পাঠাবেন মাইকেল অ্যান্থনি বানিয়ে। আপনি রিপোর্টটা দেখে বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই গিয়ে ওটা মুছে দিয়ে এসেছি। তাতে শিওর হয়ে গেছি, আপনিই একমাত্র লোক, আমি লেখার পর যিনি পড়েছেন।'

হঠাৎ করে যেন বয়েস বেড়ে গেল বারের। ক্লান্ত দেখাল।

'কথাটা কি সত্যি, মিস্টার জোনস?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'বলতে পারি এক শর্তে। খবরের কাগজের কাছে আমার নাম বলবেন না। গোপন রাখবেন।'

ভেবে দেখলেন প্রেসিডেন্ট। 'বেশ, রাখা হবে। এবার বলুন, কিশোরের কথা কি ঠিক?'

বারের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল জোনস। 'হ্যাঁ, মিস্টার ব্র্যানসন বার আমার মক্কেল। এই ঘুষ দেয়াটা তাঁরই কাজ।'

'বেশ, আমার কাজ! তাতে কি?' বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন বার। 'কেউ যদি ভাল খেলে, তাকে কিছু টাকা পুরস্কার দেয়াটা এমন কি খারাপ কাজ?'

প্রেসিডেন্টের ভুরু কুঁচকে গেল। 'বার, আপনি কলেজের নীতির বাইরে কথা বলছেন।'

'ওই চেয়ারে বসে নীতির কথা বলা খুব সহজ। আপনি তো এসেছেন মাত্র তিন বছর হলো। এই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশনও করেননি আপনি। এর ইতিহাস জানেন না। ভাল দিনগুলো দেখেননি একে একে কি করে ভাল প্লেয়ারগুলো সব বড় বড় স্কুলে চলে যাচ্ছিল জানেন না। এই স্কুলের প্রতি আমার মায়া আছে। টাকাটা আমার, আমি খরচ করেছি স্কুলটাকে ভালবেসে। তাতে কার কি ক্ষতি?'

'কত দিন ধরে করছেন এ সব?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'ম্যাডিরাকে আনার পর। বোস্টনে ওর বদনাম ছিল, এই গুজবটা শুনেই ঘুষ দেয়ার বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল। ভাবলাম, দোষ যদি কারও হয় তো ওর

হবে, ওর ওপর দিয়েই যাবে সব। এই কাজটা অবশ্য আমি খুবই অন্যায় করেছি, স্বীকার করছি।'

'এই জন্যেই ম্যাডিরার বাজেট বাড়ানোর জন্যে আমাকে টাকা দিতে চেয়েছেন,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'কোচকে আরও ফাঁসিয়ে দেয়ার জন্যে?'

'সাবধান থাকতে চেয়েছি। এই ছেলেগুলো লাগল জোনসের পেছনে একে ওকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। বিপদের গন্ধ পেলাম।' কঠিন দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকালেন বার। 'গোয়েন্দা রিক্রুট করার বুদ্ধিটা কার ছিল?'

কি জবাব দেবে ভেবে পেল না মুসা

'বার, আপনি স্পোর্টের জন্যে একজন বিপজ্জনক লোক,' ম্যাডিরা বললেন। 'মারাত্মক ক্ষতি করে দিতে পারেন টাকা লোকের চরিত্র নষ্ট করে দেয় আর একজন ভাল প্লেয়ারের চরিত্র নষ্ট হওয়ার ক্ষতি অপূরণীয়।'

'বড় বড় কথা বলে লাভ নেই, ম্যাডিরা। ভাল প্লেয়ার কিনেই আনতে হয় টাকা না দিলে টীমে থাকবে কেন? শোরনন্টের টীম এই প্রথমবারের মত ভাল খেলছে, নাম ছড়িয়ে পড়ছে। সেটা আপনার কোচের গুণে নয়, টাকা দিয়ে আমি ভাল প্লেয়ার কিনে এনেছি বলে অস্বীকার করতে পারেন?'

কোচ ম্যাডিরা কিংবা প্রেসিডেন্ট কলিন্ কেউই বারের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। এক অর্থে ঠিকই বলেছেন বার।

অবশেষে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'যা হওয়ার তো হয়ে গেছে। তবে আর এ সব চলতে দেব না।'

'বোকামি করবেন তাহলে। কোন ভাল খেলোয়াড় আর থাকবে না। চলে যাবে কলেজ ছেড়ে।'

'গেলে যাক। চেষ্টা করলে আর আন্তরিক ইচ্ছে থাকলে ভাল প্লেয়ার তৈরিও করে নেয়া যায়। খেলার কিছু নিয়ম-নীতি আছে, আমার চেয়ে কম জানেন না সে-সব আপনি ঘুষ দেয়াটা যে অন্যায়, এটাও জানা আছে আপনার। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনাকে আর কিছু বলতে চাই না। তবে জিমনেশিয়ামের জন্যে আর টাকা নেয়া হবে না আপনার কাছ থেকে। আপনাকে আর দরকার নেই এই কলেজের।'

একটি কথাও আর না বলে উঠে দাঁড়ালেন বার। কারও দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদের একটা সাংঘাতিক বদনামের হাত থেকে বাঁচালে কলেজটাকে।'

ষোলো

'সত্যিই কি কোন পোরশে তোমরা চালিয়েছ?' জিনার কণ্ঠে সন্দেহ। 'নাকি গুল মারছ আমার সঙ্গে?'

কথা শুনে ক্যাডিলাকের স্টিয়ারিঙে শক্ত হলো মুসার আঙুল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ওই গাড়িটার কথা আর বোলো না।'

বাস্কেটবল খেলা দেখতে শোরমন্টে চলেছে ওরা। সঙ্গে যাচ্ছে কিশোর, রবিন আর জিনা। স্কিইং শেষ করে জিনা রকি বীচে ফিরে এসেছে।

'মাইকেল ব্যাটা গাড়িটাকে উড়িয়ে দিল কেন?' রাগ হচ্ছে জিনার, পোরশেটা চালাতে পারল না বলে।

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'আহ্, জিনিস ছিল একখান!'

জিনার কথার জবাব দিল কিশোর, 'বারই বলেছেন জোনসকে উড়িয়ে দেয়ার জন্যে। গাড়িটা তাঁরই ছিল।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ জোনস বুঝে ফেলেছিল, আমরা তাকে ধরে ফেলতে যাচ্ছি। বাজে রকমের একটা ভুল করেছিলাম আমরা। জোনসকে অনুসরণ করেছি আমরা পোরশেটাতে চড়ে। যত দূরেই থাকি, ওটা যে সহজেই চোখে পড়ে যেতে পারে একবারও ভাবিনি জোনসের চোখেও পড়েছিল। তবে রাস্তায় নয়, ক্লাবে ঢোকার পর। গতকাল জোনস আমার কাছে স্বীকার করেছে এ কথা। তখন আমাদের ফাঁকি দেয়ার জন্যে কোস্টা ভারদি কলেজে নিয়ে গিয়েছিল সে। ওখানে আসলে তার কোন কাজ ছিল না।'

'তাই?' মুসা বলল, 'ওখানে যাওয়ার আরও একটা কারণ ছিল নিশ্চয়, হামফ্রে ভেগাবলকে যাতে আমরা সন্দেহ করি। আমরা তার ওপর নজর রাখছি এটা জেনে যাওয়াতেই কথা দিয়েও পরদিন আমাকে ফোন করেনি জোনস।'

'তার অফিসের কাছে গাড়িটা যখন নিয়ে গিয়েছিলে তোমরা,' রবিন বলল, 'নিশ্চয় তখনও চোখে পড়ে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'পোরশেটা নিয়ে গিয়ে আবারও ভুল করেছি। আসলে গাড়িটাতে চড়ার লোভ আমি আর মুসা কেউই সামলাতে পারছিলাম না। চোখে পড়ে গিয়েছিল জোনসের। পড়ামাত্রই সরে পড়েছে, কাছে আসেনি আর। তারপর গেলাম পার্টিতে। আমাদের পিছে পিছে গেল সে। টাকা দিয়ে বোমাবাজ ভাড়া করল। সেই লোক গাড়িতে বোমা লাগিয়ে রেখে এসে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ফাটাল। আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে।'

'মেয়েটার কথা কিছু বলেনি তোমাকে জোনস?' মুসা জানতে চাইল। 'যার সঙ্গে সেদিন ক্লাবে বসে খেয়েছে? যার সঙ্গে ছবি উঠে গেছে বারের?'

'বলেছে,' জানাল কিশোর। 'তবে বার বার আমার হাত ধরে অনুরোধ করেছে, বার যেন এ কথা জানতে না পারে। তাহলে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে। মেয়েটা বারের মেয়ে, জোনসের সঙ্গে প্রেম করছে। আর মেয়েটার জন্যেই বারকে ধরে ফেলেছি আমরা, এটা জানতে পারলে পিস্তল নিয়ে গিয়ে সোজা জোনসের বুকে গুলি করবেন বার।'

হাসল মুসা।

কিছুক্ষণ পর শোরমন্টের পার্কিং স্পেসে ঢুকে গাড়ি পার্ক করল সে। কয়েকবার চেষ্টা করেও তার পাশের দরজাটা খুলতে পারল না জিনা। শেষে মুসাকেই এসে হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে দিতে হলো লজ্জিত কণ্ঠে বলল, 'আজই বাড়ি গিয়ে আগে দরজাটা মেরামত করব। কজাগুলো খারাপ।'

হেসে জিনা বলল, 'অত লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। পুরানো গাড়ির অমন গোলমাল থাকবেই। এ তো আর ঝকঝকে পোরশে নয়।'

'আহ্,' গুঙিয়ে উঠল আবার মুসা, 'আর মনে কোরো না ওটার কথা!'

শোরমন্টের জিমনেশিয়ামে ঢুকল ওরা। দর্শকদের সীটে বসল। কেসটা নিয়ে তখনও কথা বলতে লাগল কিশোর আর রবিন।

কিশোর বলল, 'একজন প্লেয়ার কিন্তু টাকা খায়নি অ্যান্থনির কাছ থেকে, লুথার ফায়ারস্টোন। অনেক টাকা খরচ করে সে, দামী দামী কলম দান করে দেয়, তাই ভেবেছিলাম সে-ও ঘুষ খায়। আসলে তার বাবারই অনেক টাকা। একমাত্র সন্তান সে।'

'আজকের খেলাটা কিন্তু দারুণ জমবে,' মুসা বলল। 'আর্ট টিলারি, ইকার ব্রাইটনের মত ভাল প্লেয়ারদেরকে বিদেয় করে দেয়া হয়েছে টীম থেকে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে সাংঘাতিক একটা ফাইট হবে আজ শোরমন্টের। জেতা মুশকিল হয়ে যাবে।'

'তোমার নামটা বললে না?' হেসে বলল রবিন। 'তোমাকেও বাদ দেয়া হয়েছে। এবং তুমিও ভাল খেলো।'

প্রশংসা এড়ানোর জন্যে মুসা বলল, 'আমার দুঃখ হচ্ছে তোতাটার জন্যে। কিশোরের মত একজন তোতাপাখি হারিয়ে মনোবলই ভেঙে যাবে প্লেয়ারদের।'

'ঠিক এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি আমিও,' সীটের মাঝের গলিপথ থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকিয়ে কোচ লভেল ম্যাডিরাকে দেখতে পেল গোয়েন্দারা।

কাছে এসে দাঁড়ালেন কোচ। উঠে দাঁড়াতে গেল কিশোর। কাঁধ চেপে তাকে বসিয়ে দিলেন ম্যাডিরা। বললেন, 'তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কিশোর। আমাকে নিরপরাধ প্রমাণ করেছ তোমরা। বোস্টনেও অহেতুক দোষ দিয়ে বিদেয় করা হয়েছে আমাকে। শোরমন্টের ব্যাপারটায় আমার সেই

অপবাদ ঘুচল। তোমরাই আমার এই উপকারটা করলে।'

'এ আর এমন কি···' বিনীত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'আমার কাছে এটা অনেক বড় ব্যাপার, বুঝতেই পারছ কয়েকজন অত্যন্ত ভাল খেলোয়াড়কে হারাতে হয়েছে আমাকে, সে-জন্যে দুঃখ হচ্ছে তবে একটা অন্যায় যে বন্ধ হয়েছে সে-জন্যে খুশিও লাগছে। বেশি দুঃখ হচ্ছে কেন জানো?'

মাথা নাড়ল কিশোর।

'মুসার মত একজন খেলোয়াড়কে হারাতে হলো বলে। আর তোমার মত একজন তোতাপাখিকে সবচেয়ে দামী তোতা আমার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ!'
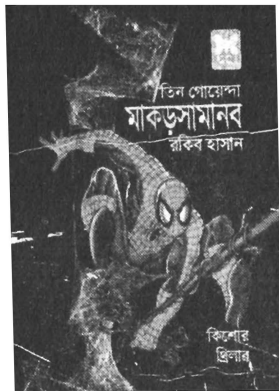
মাকড়সা মানব

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

ঝড়ের গতিতে কোস্ট রোড ধরে ছুটে চলেছে দুটো হোন্ডা এক্স এল ২৫০ সিসি মোটর সাইকেল। কালচে ধূসর রঙ। একটাতে কিশোর, আরেকটাতে রবিন। একধারে প্রশান্ত মহাসাগর, আরেক পাশে পাহাড়ের সারি। ওশনসাইডে সাঁতার কাটতে চলেছে ওরা। ওদের স্কুলের কয়েকজন বন্ধু আগেই চলে গেছে।

মোটর সাইকেল দুটো নতুন নয়। একটা বীমা কোম্পানির জিনিস। অ্যাক্সিডেন্ট করে নষ্ট হয়ে পড়ে ছিল গুদামে। নীলামে বিক্রি করে দিয়েছে। প্রায় পানির দামে কিনে এনেছে রবিন আর কিশোর। তারপর পুরো তিনটে হপ্তা গাধার মত খেটেছে ও দুটোর পেছনে। এঞ্জিন মেরামত করতে মুসা সাহায্য করেছে ওদের। এঞ্জিনের পার্টস বদলানো হয়েছে। বডির ভাঙাচোরা জিনিসপত্র কিছু মেরামত করে, কিছু বদলে নিয়ে, রঙ করেছে। এমন কিছু জিনিস বসিয়েছে, যা আগে ছিল না। যেমন, রেডিও। দেখার মত জিনিস হয়েছে এখন মোটর সাইকেল দুটো।

আফসোস করে মুসা বলেছে, 'ইস্, আরেকটা পাওয়া গেলে খুব ভাল হত। তিনজনে মিলে আরামসে বেরিয়ে পড়তাম পৃথিবী ভ্রমণে।'

'কিন্তু তোমার তো আবার হারলে-ডেভিডসন ছাড়া চলবে না,' হেসে বলেছে কিশোর। 'ও জিনিস পাওয়া কি এত সহজ?'

চকচক করে উঠেছে মুসার চোখ। ঢোক গিলেছে। সড়াৎ করে খানিকটা লালা জিভ থেকে ঢুকে গেছে গলার ভেতর। লোভনীয় খাবার দেখলে যেমন হয়। দু'হাত নেড়ে বলেছে, 'বোলো না বোলো না, আর বোলো না! হারলে-ডেভিডসন ওয়ান থাউজেন্ড সিসি! মোটর সাইকেলের রাজা। পঙ্খীরাজ! কোনদিন যে পাব!'

'পাবে। অবশ্যই,' ওকে ভরসা দিয়েছে রবিন। 'সেই পুরানো প্রবাদটা মনে রেখে—ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়—এখন থেকে খুঁজতে থাকব আমরা। পেয়ে যাবই।'

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে চলেছে কিশোর। হেরিং বীচ পার হয়ে এল। খড়খড় করে উঠল মোটর সাইকেলে লাগানো রেডিও। পুলিশ ব্যান্ড টিউন করে রেখেছে সে। প্রথম দিকের কথাগুলো কানে তুলল না তেমন। সতর্ক হয়ে গেল হঠাৎ, যখন শুনল, হেরিং বীচে গাড়ি চুরি হয়েছে। হালকা কমলা

একটা সুইফটলাইন স্যালুন। কোস্ট রোড ধরে দক্ষিণে গেছে। যানবাহন চালকদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে; তারা যেন নজর রাখে। ওরকম কোন গাড়ি দেখলে পুলিশকে যেন খবর দেয়।

'রবিন, থামো!' চিৎকার করে বলল কিশোর।

ব্রেক কষল দুজনে। রাস্তার পাশের একটা বালির ঢিবির কাছে নামিয়ে আনল মোটর সাইকেল। পুলিশের সন্দেহ গাড়িটা নিয়ে দক্ষিণে গেছে চোর। তারমানে পেছনে আছে এখন। যে কোন মুহূর্তে পাশ কাটাতে পারে। দেখলে পিছু নেবে ওরা।

অপেক্ষা করতে লাগল দুজনে। ডানের একটা নির্জন ফিশিং পায়ারের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন।

'এই নিয়ে গত এক হপ্তায় পাঁচটা গাড়ি চুরি হলো কোস্ট রোডে,' কিশোর বলল।

সাঁৎ সাঁৎ আওয়াজ তুলে ওদের পাশ কাটিয়ে উত্তরে চলে গেল কয়েকটা গাড়ি। দক্ষিণ দিক থেকে সাইরেন বাজাতে বাজাতে এল দুটো পুলিশের গাড়ি। চলে গেল পাশ দিয়ে।

পাঁচ মিনিট পর ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'মনে হয় না এদিকে আসবে। এলে এসে পড়ত।'

'আসলেই দক্ষিণে যাচ্ছে কিনা কে জানে। পুলিশের অনুমান ভুলও হতে পারে। আমার ধারণা গেছে পালিয়ে।'

'চলো, হেরিং বীচে গিয়ে দেখি।'

হেরিং বীচে এসে দেখা গেল কয়েকজন পুলিশ অফিসার একজন বৃদ্ধ লোককে ঘিরে আছে, যার গাড়ি চুরি গেছে।

'সাঁতার কেটে উঠে এসে দেখি গাড়িটা নেই,' বলল লোকটা। আরও অনেক কথাই বলল। কিন্তু চোরের পিছু নেয়া যায় তেমন কোন সূত্র পাওয়া গেল না তার কথা থেকে।

'বুঝলাম না,' রবিন বলল। 'বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না কোন গাড়ি।'

'তা ঠিক' মাথা দোলাল কিশোর, 'পুলিশও তো অবাক। চোরের চেহারা দেখেনি কেউ। গাড়ি গায়েব। গাড়িটা যেখানে ছিল তার পাশের গাড়ি দুটো দেখেছ? চাকা পাংচার। আমার ধারণা চোরেই করে দিয়ে গেছে। যাতে কেউ পিছু নিতে না পারে।'

যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে রওনা হলো আবার দুজনে। ওশনসাইডে পৌঁছে বাদিং প্যাভিলিয়নের সামনে কাঠের র‍্যাকে মোটর সাইকেল দুটো ঢুকিয়ে রাখল। পেছনে চাকার একপাশে ঝোলানো ক্যানভাসের ব্যাগ থেকে সাঁতারের পোশাক বের করল রবিন।

গরম, সাদা বালি মাড়িয়ে পানির কিনারে নেমে এল ওরা। দড়ির ঘের দিয়ে সাঁতারের জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে।

ডাক শোনা গেল, 'আই কিশোর! রবিন!'

ফিরে তাকাল দুজনে। লাইফগার্ডের সবুজ চেয়ারের ওপাশ থেকে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে ওদের বন্ধু বিড হুফার। সঙ্গে পিট গ্রেগরি। পিটও ওদের বন্ধু, একই স্কুলে পড়ে। শান্ত, চুপচাপ স্বভাবের বুদ্ধিমান এই ছেলেটাকে পছন্দ করে তিন গোয়েন্দা।

ভুরু কোঁচকাল টম। 'এত দেরি?'

'গাড়ি চোর ধরতে গিয়েছিলাম।' কি ঘটেছে জানাল কিশোর।

'আরও একটা গেল!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'পুলিশে ছেয়ে ফেলেছে দেখলাম। মনে হয় ধরে ফেলবে।'

'কই আর পারছে। কতদিন ধরেই তো চেষ্টা চালাচ্ছে। হদিসই নেই কোন।' হাসল বিড, 'তবে তোমরা তদন্তে নামলে আর বাঁচতে পারবে না চোর।'

'টম কোথায়?' এদিক ওদিক তাকাল রবিন।

'ছিল তো,' ফিরে তাকাল বিড। 'ওই যে, আসছে।'

এগিয়ে এল হাসিখুশি টমাস মার্টিন। চোখে কালো সানগ্লাস। বুকে লাইফগার্ডের ব্যাজ লাগানো। তিন গোয়েন্দার আরও এক বন্ধু। ওশনসাইডে এসে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছে।

চারপাশে তাকাল কিশোর। এ সময়টায় বেশ ভিড় থাকে ওশনসাইডে। আজ নেই। টমের দিকে তাকাল। 'লোক নেই কেন?'

'মনে হয় গাড়ি চুরির ভয়ে আসেনি। এক হপ্তা ধরেই লোক কম।'

'রকি বীচ থেকে আমাদের আর কেউ আসেনি?' জানতে চাইল রবিন।

'জিনাকে দেখলাম কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে। আমি একটু ওদিকে গেছিলাম। ফিরে এসে দেখি নেই। চলে গেছে। মুসা কোথায়?'

'দুদিন ধরে ওর পাত্তা নেই। ঘরে দরজা দিয়ে বসে আছে। কিসের নাকি গবেষণা করছে।'

হেসে উঠল টম আর বিড দুজনেই।

'আর কিসের গবেষণা করবে,' হেসে বলল বিড। 'নিশ্চয় নতুন খাবার বানানোর চেষ্টা করছে।'

সাঁতার কাটতে নামল ওরা। চারজন—কিশোর, রবিন, বিড আর পিট। টম পাহারা দিতে চলে গেল।

ঘন্টাখানেক দাপাদাপি করে উঠে এল কিশোর আর রবিন। এগিয়ে এল টম। 'অ্যাই, খবর আছে। হনিটা অবশেষে গাড়ি কিনেই ফেলল। এইমাত্র ফোন করে সুখবর দিল সে—আমাদের খাওয়াবে। মেরিভিলেই আছে। যাওয়ার পথে দেখে যাবে নাকি কি রকম গাড়ি কিনল?'

'কিনে ফেলল!' রবিন বলল, 'তাহলে তো যেতে হয়।'

হনির ভাল নাম হোর্স ওয়ারনার। সেও ওদের স্কুলেই পড়ে। একটা নতুন দামী গাড়ি কেনার বড় শখ। স্কুল ছুটির পর পার্ট টাইম আর গরমের ছুটিতে ফুল টাইম চাকরি করে টাকা জমিয়েছে গাড়ি কেনার জন্যে।

বেশ খানিকটা দূরে একটা কালো পাথরের জেটি। সেটার দিকে এগোল দুই গোয়েন্দা।

বালিতে একটা মরা বাদুড় পড়ে থাকতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর 'এটা এখানে এল কি করে?'

'এসেছে হয়তো কোনভাবে,' রবিন বলল।

হাঁটতে হাঁটতে জেটির শেষ মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা। দিগন্তের দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটা কালো ফিশিং বোট। বাদিং এরিয়ার দিক থেকে আসছে আরেকটা ছোট বোট। সবুজ আর সাদা রঙ করা বোটটাকে চিনতে পারল কিশোর। রবিনেরও চেনা। ওটা ওদের ক্লাসের আরেক বন্ধু ববের।

হাত নাড়ল দুজনে।

ববও ওদের দেখেছে। দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে গিয়ে আচমকা চোখ ফেরাল নিচের দিকে। আবার ওদের দিকে চেয়ে হাত নাড়তে লাগল জোরে জোরে। কিছু একটা ঘটেছে। ভয় পাইয়ে দিয়েছে ওকে।

দুই

'কি হলো?' বোটের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন।

জেটি থেকে ডাইভ দিয়ে পড়ল কিশোর। সাঁতরে চলল বোটের দিকে। রবিনও ডাইভ দিল। ওটার কাছে পৌঁছে গেল দুজনে। বোটে উঠে পড়ল।

'ওই দেখো!' হাত তুলে বোটের সামনের দিকটা দেখাল বব। পানি উঠছে গলগল করে। ইতিমধ্যেই এক ইঞ্চি পানি উঠে গেছে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল বব।

ফুটোটা পেয়ে গেছে কিশোর। পা দিয়ে চাপা দিল। একটা তোয়ালে ছিঁড়ে সেখানে ঠেসে ভরতে লাগল রবিন। সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরে রাখল কিশোর।

হাল ধরে আছে বব। জেটির দিকে নিয়ে চলেছে। এতক্ষণে হাসি ফুটল মুখে 'তোমাদের জন্যে বোটটা বাঁচল আজ। যে ভাবে পানি উঠছিল, একা সামলাতে পারতাম না।'

ওর ভাল নাম ববসন ক্রলার। ছোটবেলায় মা মারা গেছে। বাবা আর বিয়ে করেননি। রকি বীচের বাইরে কোস্ট রোডের ধারে একটা ফার্মের মালিক মিস্টার ক্রলার।

'ফুটো করলে কি করে?' জানতে চাইল রবিন। 'ডুবো পাথরে লাগিয়েছিলে নাকি?'

মাথা নাড়ল বব। 'না, অন্য কিছু। ধ্যাচ করে লাগল।'

অবাক হলো কিশোর, 'মানে?'

'হঠাৎ মনে হলো তলায় কিসে যেন খোঁচা দিল। তারপর দেখি পানি উঠছে। এদিকটা আমার চেনা। কতবার বোট নিয়ে বেরিয়েছি। এমন কাণ্ড ঘটেনি।'

'কিসে খোঁচা দিল?' রবিনও অবাক।

'জানি না!'

'গিয়েছিলে কোথায়? মাছ ধরতে?'

'নাহ,' বলতে দ্বিধা করল যেন বব তারপর কথা ঘোরাল, 'কদিন থেকেই একটা কথা বলব ভাবছি তোমাদের। আজ দেখা যখন হয়েই গেল, বলি। একটা রহস্য পাওয়া গেছে।'

'রহস্য!'

'হ্যাঁ। আব্বা আর আমি অনেক চেষ্টা করেছি। সমাধান করতে পারিনি। শেষে আমার চাচাকে খবর দিয়েছি। চেস্টারটন কলেজের প্রফেসর। কাল আসবে।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল বব। 'তিনশো বছরের পুরানো ধাঁধা।'

'ধাঁধাটা কি?' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিশোরের মুখ।

'সময় করে আমাদের বাড়ি যেয়ো। খুলে বলব সব

'আচ্ছা।'

জেটিতে ভিড়ল বোট রবিন আর কিশোর নেমে গেল। মোটর সাইকেলের দিকে চলল। কাপড় পরে মোটর সাইকেল নিয়ে উঠে এল রাস্তায়।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব?'

'চলো, হনির নতুন গাড়িটা দেখেই যাই।'

মেরিভিলে পৌঁছে দেখে আরেক ঘটনা ঘটে বসে আছে কয়েকজন লোক জটলা করছে এক জায়গায়। গোয়েন্দাদের দেখে দৌড়ে এল ওদের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় একটা ছেলে। সে-ই হোস ওয়ারনার। টকটকে লাল গাল। চুলের রঙও লাল। ভিজে লেপ্টে আছে। শুকনো স্বরে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমার গাড়িটা দেখেছ? আকাশী রঙের ক্যাভেলিয়ার তোমরা তো দক্ষিণ দিক থেকেই এলে, তাই না?'

রবিন আর কিশোর মাথা নাড়ল। দেখেনি।

'তাহলে নিশ্চয় উত্তরে নিয়ে গেছে!' হনি বলল। 'এই একটু আগে এখনও গেলে ধরা যায়!'

যা বোঝার বুঝে গেছে দুই গোয়েন্দা। রাস্তায় উঠে সোজা ছুটল উত্তরে। কয়েক মাইল আসার পর সামনে একটা বাঁক। পাহাড়ের গা থেকে পাথর বেরিয়ে প্রায় খিলানের মত ঝুঁকে আছে রাস্তার ওপর। তীব্র গতিতে সেটা পেরিয়ে এল দুজনে।

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'ওই যে!'

সামনে কয়েকশো গজ দূরে দেখা গেল একটা আকাশী রঙের ক্যাভালিয়ার। একেবারে নতুন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হারিয়ে গেল

একটা বড় বাঁকের আড়ালে।

অ্যাক্সিলারেটরে মোচড় দিল কিশোর। গোঁ গোঁ করে উঠল শক্তিশালী ইঞ্জিন। ভয়াবহ গতিতে ছুটতে শুরু করল। মাথা নিচু করে রেখেছে সে। চোখ দুটো স্থির রাস্তার ওপর।

মোড়ের অন্য পাশে আসতে আবার দেখা গেল গাড়িটা। মনে হয় সন্দেহ করে ফেলেছে ড্রাইভার। গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। মোটর সাইকেল আর গাড়ির মাঝের দূরত্ব ক্রমে বাড়ছে।

সামনে আবার বাঁক। এটা আরও বড়। রাস্তাও সরু। টিলাটক্কর আছে রাস্তার পাশে। মনে হয় সেজন্যেই গতি কমাতে বাধ্য হলো গাড়ির ড্রাইভার।

দ্রুত কমতে শুরু করল দূরত্ব। কাছাকাছি চলে যেতে পারবে, আশা করল কিশোর।

কিন্তু কপাল খারাপ। বাঁক পেরোতে যেতেই হঠাৎ পথের পাশের কাঁচা রাস্তা থেকে উঠে এল একটা হলুদ রঙের বিশাল ট্রাক। পুরো রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল।

অ্যাক্সিলারেটর ছেড়ে দিয়ে ব্রেক কষল কিশোর। টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে কাত হয়ে গেল মোটর সাইকেল। রবার পোড়া গন্ধ ছুটল। অনেক চেষ্টা করেও খাড়া থাকতে পারল না। পড়ে গেল রাস্তার পাশে।

মোটর সাইকেল থামিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল রবিন। কিশোরকে ধরে তুলল। ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। ভাগ্য ভাল, মাটিতে পড়েছে। রাস্তায় পড়লে গায়ের ছাল-চামড়া সব উঠে যেত।

দুজনে ধরে মোটর সাইকেলটা খাড়া করল।

দুর্বল কণ্ঠে বলল কিশোর, 'রেডিওটা গেছে।'

দাঁড়িয়ে আছে ট্রাকটা। কেবিনের দরজা জোরে লাগানোর শব্দ হলো। লাফিয়ে নেমে এল একজন মোটা লোক। চুলের অনেক জায়গা সাদা। মাথায় স্ট্র হ্যাট। পরনে ডেনিম। পায়ের জুতোতে কাদা। এক নজর দেখেই বলে দেয়া যায়, লোকটা কৃষক।

দৌড়ে এল কিশোরের দিকে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'বেশি লাগেনি তো? সরি। দেখতে পাইনি। হর্নটাও গেছে খারাপ হয়ে। এত জোরে চালাচ্ছিলে কেন? তাড়া ছিল নাকি?'

'একজনের পিছু নিয়েছিলাম,' কিশোর বলল। দেরি হয়ে গেছে। গাড়িটার পিছু নিয়ে লাভ নেই আর। ধরা যাবে না। 'আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করা যাবে?'

'সরি। গাড়িতে ফোন নেই।'

আরও একবার দুঃখ প্রকাশ করে চলে গেল লোকটা।

মোটর সাইকেলে কিক দিল কিশোর। এক কিকেই স্টার্ট হয়ে গেল। হাসি ফুটল মুখে। 'এর নাম এক্স এল। অন্য মোটর সাইকেল হলে কত কিছু ভাঙত, যেভাবে পড়েছিলাম,' রবিনের দিকে তাকাল সে, 'চলো, মেরিভিলে ফিরে যাই।'

তিন

মেরিভিলে পৌঁছে কিশোররা দেখল পুলিশকে ফোন করে দিয়েছে হনি। এখানেও গাড়ির কাছে এমন কোন সূত্র ফেলে যায়নি চোর, যেটা ধরে তার পিছু নেয়া যেতে পারে।

বিষণ্ণ মুখে বালিতে বসে আছে হনি।

'গাড়িতে তালা দিয়ে রাখোনি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'রেখেছিলাম। খুলে ফেলেছে।'

পুলিশ এল। হনির কাছ থেকে বিদায় নিল দুই গোয়েন্দা। ওর জন্যে কষ্ট করেছে বলে ওদেরকে ধন্যবাদ দিল সে।

বাড়ি রওনা হলো দুই গোয়েন্দা।

স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকে ওদের ব্যক্তিগত ওঅর্কশপের কাছে মোটর সাইকেল দুটো রাখল। বাড়ির বারান্দায় উঠে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে রওনা হলো কিশোর। ওর যা অবস্থা, দেখলেই হাঁ-হাঁ করে উঠবেন মেরিচাচী।

ফাঁকি দিতে পারল না কিশোর। ঠিকই দেখে ফেললেন তিনি। কাপড়ে মাটি লাগা। ছড়ে যাওয়া কনুই থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। কিশোরের বিধ্বস্ত চেহারার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর ফেটে পড়লেন, 'তখনই বলেছিলাম আমি, মোটর সাইকেল চালাবি না! ট্রাকের নিচে পড়েছিলি নাকি?'

'পড়িনি,' হেসে বলল কিশোর। 'সামনে ট্রাক দেখে থামাতে গিয়েছিলাম। মাটিতে পড়ে গেছি।'

'ওই দেখো, যা বলেছি! তারমানে দোজখের দুয়ার থেকে ফিরেছিস! আজই আমি পোড়াব ওই হতচ্ছাড়া মোটর সাইকেল।' এগিয়ে এসে কিশোরের হাত ধরে কনুইটা দেখলেন তিনি। 'ইস্, কি করেছে! হাতের অর্ধেক গোস্তই তো নেই!'

'অহেতুক বাড়িয়ে বলছ তুমি, চাচী। সামান্য একটু ছড়েছে…'

'সামান্য! জলদি গিয়ে গরম পানি দিয়ে ধো। মলম লাগা। ইনফেকশন হলে বুঝবি।' রবিনের দিকে তাকালেন। 'তুমি ওরকম মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? হাত মুখ ধুয়ে এসো। খাবার রেডি।'

তাড়াতাড়ি পালাল ওখান থেকে দুজনে। ওপরে কিশোরের ঘর থেকে গোসল সেরে নেমে এল নিচে। টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেলেছেন মেরিচাচী।

খেতে খেতে গাড়ি চুরি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল দুজনে। কিশোর বলল, 'এতদিন গাড়ি নিয়ে দক্ষিণে গেছে চোর। হনিরটা নিয়ে উত্তরে গেল কেন?'

রবিন কিছু বলার আগেই গাড়ির এঞ্জিনের বিকট ভটভট শোনা গেল। মুসার জেলপি। এসে গেছে মুসা আমান।

দরজায় দেখা দিল সে। 'বাহ্, একেবারে সময়মত এসেছি।'

'ছিলে কোথায় তুমি এতদিন?' জানতে চাইল কিশোর।

'এতদিন কোথায়? দুদিন তো মাত্র।' চেয়ারে বসে পড়ল মুসা 'একটা খুব জরুরী কাজ করছিলাম। ঘরের দরজাই খুলিনি।'

রবিন হাসল। 'আজকাল বিজ্ঞানী হয়ে যাচ্ছ নাকি?'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। 'তুমি আর হাত গুটিয়ে রেখেছ কেন? প্লেট নাও।'

'না, আন্টি, আজ এসব খাব না।'

একটা ভুরু উঁচু করলেন মেরিচাচী। মুসা আমান খাওয়ার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিচ্ছে! বিশ্বাস করতে পারছেন না।

চোখ তুলে তাকাল কিশোর। 'ঘটনাটা কি, মুসা? ডায়েট শুরু করলে নাকি?'

'না, ডায়েট নয়। তবে ডায়েটারি সারভাইভাল বলতে পারো,' পকেট থেকে ছোট একটা বই বের করে টেবিলে রাখল মুসা। 'এই জিনিস নিয়ে গবেষণা করেই দুটো দিন কাটিয়েছি। আইডিয়াটা ভাল লেগেছে।'

বইটার নাম পড়ল রবিন। Vegetable Survival in the Wilderness.

কিশোরও পড়ল। 'হুঁ, শাকসব্জী খেয়ে বনে বেঁচে থাকার বিদ্যা। জেনে তুমি কি করবে? মাংস ছাড়া এক দিন টিকবে না।'

বইটাতে টোকা দিল মুসা, 'এরা তো বলছে চিরকাল বেঁচে থাকা যায়। এবং ভালভাবে। ভেবে দেখো, কি ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে বাস করছি আমরা! একবেলা খেলে পরের বেলার খাবার আসবে কোত্থেকে জানা নেই। টেলিভিশনে দেখলাম, এক বিজ্ঞানী বলছেন, খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী। মানুষই করবে। বেঁচে থাকলে তখন আদিম পৃথিবীতে বাস করতে হবে আমাদের। বনে-জঙ্গলে যা পাওয়া যায় তাই খেয়ে বাঁচতে হবে। ভাবলাম, খেতেই যখন হবে, এখন থেকেই প্র্যাকটিস শুরু করি না কেন? করে দিলাম।'

'ও,' তরল কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ভাল। তা বনে কি কি পাওয়া যায়? হট ডগ কিংবা বীফ বার্গার এসব আছে?'

'ইয়ার্কি মারছ? পৃথিবীটা ধ্বংস হোক। যখন খাবার পাবে না, তখন বুঝবে মজা…'

মুচকি হাসলেন মেরিচাচী। 'তাহলে ফ্রুট কেক আজ আর চলবে না তোমার। তোমার কথা ভেবেই বানিয়েছিলাম কিন্তু।'

ঢোক গিলল মুসা। 'ফ্রুট, না? ফল তো সব্জীর মধ্যেই পড়ে। দোষের কিছু নেই। দিতে পারেন একআধ টুকরো।'

'এখনই প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেললে?' খোঁচা দিল রবিন। 'বনে নাহয় ফল

পাওয়া যায়, কিন্তু ঘি আর চিনি? ময়দা? এসব তো তোমার আদিম পৃথিবীতে পাবে না...'

কেক নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল মুসা। গুটিয়ে নিল। বিষণ্ণ হয়ে গেল মুখ।

মেরিচাচী বললেন, 'ওদের কথা শুনো না তো। তুমি খাও। কিছু হবে না।'

'কিন্তু আন্টি, বিজ্ঞানী যে বলল...'

'মরুক বিজ্ঞানী! পোড়ামুখোগুলো অকারণে খালি মানুষকে ভয় দেখায়

উজ্জ্বল হলো মুসার মুখ, 'দিন, আপনি যখন বলছেন, একটু খাই।'

আস্ত কেকটাই ঠেলে দিলেন মেরিচাচী। 'একআধ টুকরো নয়, যত পারো খাও,' বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি।

কেক চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'ওশনসাইডে নাকি সাঁতার কাটতে গিয়েছিলে আজ?'

'কার কাছে শুনলে?' ভুরু নাচাল রবিন।

'বিড।'

'হ্যাঁ।'

গাড়ি চুরির কথা বলল ওকে রবিন।

হনির গাড়িটা চুরি হওয়ার কথা শুনে আফসোস করে বলল মুসা, 'আহা, বেচারা! কত কষ্ট করে টাকা জমিয়েছিল। পুলিশ করছেটা কি?'

'চেষ্টা করছে। ধরতে পারছে না।'

'আমরাও একবার চেষ্টা করে দেখার কথা ভাবছি,' কিশোর বলল। 'হনির জন্যে খারাপ লাগছে। গাড়িটা চুরি যাওয়ার পর ওর যা চেহারা হয়েছিল না!'

'স্বাভাবিক। আমারও হত।'

'আরও একটা রহস্য আছে কিন্তু আমাদের হাতে। তিনশো বছরের পুরানো।'

'খাইছে!' চিবানো বন্ধ হয়ে গেল মুসার। 'সেটা আবার কে জোগাড় করে দিল?'

'মরিস ক্রলার।'

চার

ববের বোট ফুটো হওয়ার কথা বলা হলো মুসাকে। তিনশো বছরের পুরানো একটা রহস্যের সমাধান করে দিতে অনুরোধ করেছে সে, সেকথাও বলল রবিন।

'কোস্ট রোডের আশেপাশে রহস্যের ছড়াছড়ি লেগে গেল দেখি,' আবার

কেকে কামড় বসাল মুসা। 'গাড়ি চুরি, বোট ফুটো, এখন আবার বলে তিনশো বছরের পুরানো রহস্য…'

'একদম আমার মনের কথাটা বলেছ,' কিশোর বলল।

খাওয়া শেষ করে হেডকোয়ার্টারে চলে এল ওরা। একটা ম্যাপ বের করল কিশোর। কোস্ট রোডের আশপাশটা দেখতে দেখতে বলল, 'গাড়িগুলো নিয়ে গিয়ে এই রাস্তার ধারেই কোনখানে লুকানো হচ্ছে না তো?'

ফোন বাজল। ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থেকে আনমনে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল সে। 'হালো।…ও বব, বলো।'

ওপাশের কথা শুনতে শুনতে উত্তেজনা ফুটল কিশোরের চেহারায়। রিসিভার ক্রেডলে রেখে দুই সহকারীর দিকে তাকাল। 'এখুনি যেতে বলল আমাদের!'

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল রবিন।

'সেটা বলেনি। তবে বিপদে পড়েছে বলল।'

অনেকগুলো গোপন প্রবেশ পথের একটা—দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। মুসার জেলপিতে করে ববদের ফার্মহাউসে রওনা হলো।

কোস্ট রোড ধরে গাড়ি চালাল মুসা। ফার্মহাউসে পৌঁছে দেখা গেল বাড়ির সামনে পুলিশের দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ছাতের লাল আলোগুলো ঘুরছে।

বাড়ির সামনে বিশাল বারান্দা। সেখানে ভিড় করে আছে খবরের কাগজের রিপোর্টার আর পুলিশ। বাড়ির পেছনে আরেকটা খালি গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন পুলিশ। অনেকগুলো গাড়ির এঞ্জিনের মিলিত শব্দের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। বাড়ির একপাশে বব আর তার বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। মিস্টার মরিস ক্রলার হালকা-পাতলা মানুষ, সরু গোঁফ আছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

এগিয়ে গেল গোয়েন্দারা। ওদের ওপর চোখ পড়তে উজ্জ্বল হলো ববের মুখ, 'ওই যে, এসে পড়েছে।'

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

খালি গাড়িটা দেখাল বব। 'আমরা নাকি গাড়ি চুরি করেছি!'

'চুরি!'

'হ্যাঁ,' শুকনো গলায় বললেন মিস্টার ক্রলার। 'গাড়িটা প্রথমে ববের চোখে পড়েছে। বাড়ির পেছনে দাঁড় করানো। আমাকে ডেকে দেখাল। পুলিশকে ফোন করব কিনা ভাবতে ভাবতেই ওরা এসে হাজির। কে নাকি ফোন করে জানিয়েছে কোস্ট রোডের গাড়ি চোর আমরাই।'

পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে এলেন পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। গোয়েন্দাদের দেখে বললেন, 'ও, তোমরাও এসে গেছ। খবর পেলে কি

করে?'

'বব ফোন করেছিল,' জানাল কিশোর।

ক্যাপ্টেনকে বলল বব, 'আজকে আমাদের পক্ষে চুরি করা সম্ভবই ছিল না, স্যার। আব্বা আর আমি...'

একজন পুলিশ অফিসারকে আসতে দেখে থেমে গেল সে। হাতে একটা ছিপ। সেটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল অফিসার, 'এটা তোমার?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বব। 'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'চোরাই গাড়িতে এটা এল কোত্থেকে?'

'আমার ছিপ! চোরাই গাড়িতে!' বিশ্বাস করতে পারছে না বব। 'কাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না এটা। আমার বোটে রেখেছিলাম।'

ছিপটা হাতে নিয়ে দেখলেন ইয়ান ফ্লেচার। 'ধরে নিচ্ছি, তুমি সত্যি কথা বলছ। তবু তোমাদেরকে থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। ইতিমধ্যে গাড়িতে আঙুলের ছাপ খোঁজা হতে থাকুক।'

হতাশ ভঙ্গিতে বললেন মিস্টার ক্রলার, 'ভেতরে আমার ছাপ পাওয়া যেতে পারে। গাড়িতে ঢুকেছিলাম। গ্লাভ কম্পার্টমেন্টের কাগজপত্র দেখে মালিকের নাম জানার জন্যে।'

এগিয়ে এল রিপোর্টাররা। ঝিলিক দিয়ে উঠতে লাগল ক্যামেরার ফ্ল্যাশার। ওখান থেকে সরে গেল কিশোর আর ক্যাপ্টেন। নিচু গলায় কথা বলতে লাগল। চীফ তাকে বললেন, মিস্টার ক্রলার জামিন পাবেন। তবে মোটা অঙ্কের টাকা জামানত লাগবে।

পরদিন সকালে দেখা করে জামিনের ব্যবস্থা করবে, বব আর তার বাবাকে কথা দিয়ে, বাড়ি ফিরে গেল তিন গোয়েন্দা।

রাতে চাচাকে সব খুলে বলল কিশোর।

'মনে হচ্ছে কেউ শয়তানি করে ওদের ফাঁসিয়েছে,' রাশেদ পাশা বললেন।

'আমারও তাই ধারণা। কিন্তু কেন ফাঁসাল, বুঝতে পারছি না।'

'হয়তো কোন শত্রু আছে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে করে থাকতে পারে।'

পরদিন সকালে থানায় গিয়ে শুনল তিন গোয়েন্দা, ঠিকই বলেছিলেন ইয়ান ফ্লেচার—জামিন করাতে হলে অনেক টাকা দরকার। অত টাকা নেই মিস্টার ক্রলারের।

থানা থেকে সোজা বাড়ি ফিরে এল কিশোর। চাচাকে অনুরোধ করল, জামানতের টাকার ব্যবস্থা করে দিতে।

রাজি হলেন রাশেদ পাশা।

মুসার জেলপিতে করে বাড়ি ফেরার পথে মিস্টার ক্রলার বললেন, 'তোমাদের ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না।'

'কে আপনাকে ফাঁসিয়েছে,' কিশোর বলল, 'কিছু অনুমান করতে পারেন?'

দ্বিধা করতে লাগলেন মিস্টার ক্রলার।

মরিস বলল, 'একজনকে অবশ্য সন্দেহ করছি আমরা।'

'তার নাম মারলিন স্পাইক,' মরিস বললেন। 'মাসখানেক আগে কাজ চাইতে এসেছিল। দিলাম চাকরি। কিন্তু করতে পারল না কয়েক দিন দেখে শেষে বিদেয় করে দিলাম। খুব চটেছিল।'

'যাওয়ার পর কিছু করেছিল?' জানতে চাইল রবিন।

'না। তবে যাওয়ার সময় হুমকি দিয়েছিল, আমাকে দেখে নেবে। তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। আগে কোথায় কি কাজ করত, বলতে পারব না। শুধু তার চেহারার বর্ণনা ছাড়া।'

'আব্বা,' উত্তেজিত হয়ে বলল বব, 'আমার ক্যামেরা দিয়ে একটা ছবি তুলেছিলাম তার। আছে এখনও।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়,' কিশোর বলল। 'মনে হচ্ছে দুটো রহস্য পাওয়া গেল।'

'ওহ্হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ রাতে তো চাচা আসার কথা। এখনও আগ্রহ আছে ওই ব্যাপারে?'

'আগ্রহ মানে?' এতক্ষণে কথা বলল মুসা। 'তিনশো বছরের পুরানো রহস্য...'

'তিনশো বছরেরও বেশি,' শুধরে দিলেন মিস্টার ক্রলার।

'তাহলে কে না তার সমাধান করতে চায়?'

'চলো বাড়িতে,' মিস্টার ক্রলার বললেন। 'সব বলব তোমাদের।'

পাঁচ

ফার্মহাউসে ঢুকে বাড়ির সামনে গাড়ি রাখল মুসা। গোয়েন্দাদেরকে ভেতরে নিয়ে গেল বব আর ওর বাবা। ওক কাঠের প্যানেলিং করা সুন্দর, সুসজ্জিত লিভিং-রুমে নিয়ে বসাল। পাথরের বড় একটা ফায়ারপ্লেসের ওপরে ঝোলানো প্যাসিফিক কোস্টের একটা ম্যাপ। কয়েকটা পুরানো আমলের ম্যাপ দেখা গেল বুক কেস আর সোফার পেছনের দেয়ালে।

'এবার শোনা যাক,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' শুরু করলেন মিস্টার ক্রলার, 'তোমাদের বোধহয় জানা নেই, আমাদের ক্রলার পরিবার অনেক পুরানো। কয়েকশো বছরের।' মেহগনি কাঠে তৈরি একটা তাকে রাখা কতগুলো মোটা খাতা দেখালেন তিনি। বাদামী চামড়ায় বাঁধাই। মলিন হয়ে গেছে চামড়ার রঙ। 'ক্রলার পরিবারের কয়েকশো বছরের ইতিহাস লেখা আছে ওগুলোতে। একজনের কথাই কম লেখা হয়েছে, অথচ লেখা উচিত ছিল—তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ ক্যাকটাস ক্রলার।

'১৬৪৭ সালের কোন একদিন ছোট্ট এক নৌকায় করে প্লাইমাউথ কলোনি থেকে রওনা হলেন ক্যাকটাস ক্রলার, সঙ্গে স্ত্রী ও তিন সন্তান। দুঃসাহসী নাবিক তিনি, জ্যোতির্বিদ্যায় অগাধ জ্ঞান; ইনডিয়ানদের মুখে শোনা এক রহস্যময় অশ্বক্ষুরাকৃতি খাঁড়ির সন্ধানে চলেছেন। ওখানে গিয়ে নতুন উপনিবেশ স্থাপন করার ইচ্ছে। তাঁর ধারণা, দেখাদেখি তাতে এসে যোগ দেবে আরও অনেক পরিবার।'

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। 'পৌঁছেছিলেন ওখানে?'

উঠে দাঁড়ালেন ক্রলার। পায়চারি শুরু করলেন ঘরের মধ্যে। 'সেটাই জানতে হবে আমাদের। সেই যে বেরোলেন, আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁদের। বহু বছর পরে একটা বোতল পাওয়া গেল। ঢেউয়ে ভেসে এসে সাগরের কিনারে শুকনোয় পড়ে ছিল বোতলটা, এখান থেকে বেশ কিছুটা দক্ষিণে। ওটাতে একটা কাগজ ছিল। তাতে লেখা ছিল, প্রচণ্ড ঝড়ে পরিবার সহ নিখোঁজ হয়েছেন ক্যাকটাস ক্রলার। লেখাটা সম্ভবত তাঁরই হাতের। কাগজের কিছু কিছু জায়গা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, লেখা পড়া যায়নি। শেষ কোন্ জায়গায় ছিলেন তাঁরা, তাড়াহুড়ো করে লিখে দিয়েছেন তিনি। তবে এমন করে লেখা, মানে বোঝা যায় না।'

'আপনার কাছে আছে কাগজটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমাদের মাথায় আছে,' হেসে বলল বব।

মিস্টার ক্রলার বললেন, 'আমার ভাই লয়েডের কাছে আছে ওটা। চেস্টারটন কলেজের অ্যাসট্রোনমির প্রফেসর ও। আজ এলে দেখতে পারবে।'

'আপনি জানতে চাইছেন আপনার পূর্বপুরুষরা রকি বীচের আশেপাশেই কোথাও নিখোঁজ হয়েছিল কিনা?'

'তাই। সেই সঙ্গে গুপ্তধনগুলোরও খোঁজ চাই।'

'গুপ্তধন!' প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা আর রবিন।

মিস্টার ক্রলার বললেন, 'ক্যাকটাস ক্রলারের সঙ্গে একটা বাক্স ছিল অনেক দামী দামী রত্ন ছিল তাতে। কম দামী পাথর আর অলঙ্কারও ছিল। সেগুলো নিয়েছিলেন ইনডিয়ানদের ঘুষ দেয়ার জন্যে।'

'এতক্ষণে বুঝলাম,' সোফায় হেলান দিল কিশোর। 'কেন ক্যাকটাস ক্রলারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা অস্পষ্ট রাখা হয়েছে রেকর্ডে। ওই গুপ্তধনের জন্যে।'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার ক্রলার। 'আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকে সেই গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। জায়গাটাই খুঁজে পায়নি।'

'তাছাড়া চোর-ডাকাতের তো অভাব নেই,' বব বলল 'অস্পষ্ট সেজন্যেও রাখা হতে পারে। ওদের কানে গেলে সর্বনাশ। বাক্সটা খুঁজে বের করার জন্যে হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দেবে। দেখা যাবে আমাদের আগেই বের করে বসে আছে। আরও একটা মূল্যবান জিনিস থাকতে পারে ওর ভেতরে—মূল্যবান অবশ্য আমাদের কাছে—ক্যাকটাস ক্রলারের ডায়েরী।'

ছয়

ঘড়ি দেখলেন মিস্টার ক্রলার।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। রবিন আর মুসাও উঠল তার সঙ্গে। ক্যাকটাস ক্রলারের ব্যাপারে আরেকটু আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল কিশোরের, কিন্তু সময় নেই। আগামী দিন কোর্টে শুনানি আছে। উকিলের কাছে পরামর্শের জন্যে যেতে হবে মিস্টার ক্রলারকে।

দরজা পর্যন্ত ওদেরকে এগিয়ে দিল বব আর মিস্টার ক্রলার।

ববকে বলল কিশোর, 'আজ রাতে তোমার চাচা এলে আমাদের খবর দিয়ো। কাগজটা দেখতে চাই।'

হাসল বব। একটা চাবির রিঙ ঘোরাচ্ছে। প্লাস্টিকে তৈরি একটা খরগোশের থাবা লাগানো রয়েছে চেনের অন্য মাথায়। 'দেব। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। তোমরা না থাকলে কোনমতেই আজ জামিন পেতাম না আমরা। রহস্যের সমাধান করা আর হত না।'

'আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এর কিনারা করতে না পারলে বহুদিন আর করা যাবে না,' মিস্টার ক্রলার বললেন।

অবাক হলো কিশোর। 'কেন?'

'তা তো জানি না। লয়েড বলল, করা যাবে না। ও ক্যাকটাসের মেসেজটা পড়ে হয়তো কিছু বুঝেছে। অনেক দিন ওটা পড়ে আছে ওর কাছে। কিছু করেনি। হঠাৎ করে এখন গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।'

মারলিন স্পাইকের ছবিটা এনে দিল বব। ওদের গোলাঘরের সামনে পেটমোটা, টাকমাথা একজন লোক একটা বেলচায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ হাতে দস্তানা। কব্জির কাছে V-এর মত দেখতে একটা কড়া লাগানো।

ববদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেরিভিলে চলে এল তিন গোয়েন্দা। হনির গাড়িটা যেখান থেকে চুরি হয়েছে সেখানে কোন সূত্র ফেলে গেছে কিনা চোর, দেখার জন্যে।

মুসা বলল, 'আচ্ছা, ক্রলারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কতটা সিরিয়াস?'

'যথেষ্ট,' ছোট একটা বালির ঢিবিতে আনমনে লাথি মারল কিশোর। 'গাড়ি চুরির সময় সেদিন ওরা কোথায় ছিল, তার কোন সাক্ষী নেই। অনেক কিছুই ওদের বিরুদ্ধে যায়। মিস্টার ক্রলার ভাল মানুষ—তাঁর এই সুনামই কেবল ভরসা।'

বালির ঢিবিতে ছোট একটা গুল্ম দৃষ্টি আকর্ষণ করল মুসার। ভাল করে দেখার জন্যে ওপরে উঠে গেল। বসে পড়ল। অবাক মনে হলো ওকে। বালি থেকে টেনে তুলল গুল্মটা।

হাসিমুখে নেমে এল সে। হাত উঁচু করে ধরে বলল, 'এই নাও, সূত্র।'

অবাক হয়ে কিশোর দেখল, যেটাকে গুল্ম ভেবেছিল, সেটা একটা দস্তানা। কব্জির কাছে V আকৃতির কড়া।

এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখল ওরা, ঢালের ওপরে গতি কমাল একটা গাড়ি। এগোল কয়েক গজ। দ্বিধা করল মনে হয় ড্রাইভার। আবার গতি বাড়িয়ে চলে গেল গাড়িটা।

সেদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল রবিন, 'কি দেখতে এসেছিল?'

'কি জানি!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

স্পাইকের ছবিটা রবিনের কাছে। পকেট থেকে বের করল সে। ছবির সঙ্গে দস্তানা মিলিয়ে দেখল।

অবিকল এক।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'এসেই একটা সাংঘাতিক সূত্র আবিষ্কার করে ফেললে হে! গুল্ম দেখার শখ হয়েছিল কেন হঠাৎ?'

'বিচিত্র চেহারার বলে। এরকম আর কখনও দেখিনি তো,' হেসে বলল মুসা। 'বালির মধ্যে দস্তানার আঙুল, দূর থেকে বিচিত্রই লাগে।'

'তোমার চোখ আছে, যাই বলো,' রবিন বলল।

'নাক আর কান?'

'এবং জিভ,' যোগ করল কিশোর।

'সেই সঙ্গে গায়ের জোর,' আরও যোগ করল রবিন।

'কেবল মগজটা আরেকটু বেশি থাকলেই হত,' আফসোস করে বলল মুসা।

'তাহলে তো সুপারম্যান হয়ে যেতে,' কিশোর বলল, 'একজন মানুষকে সব কিছুই বেশি দেয় না আল্লাহ্।'

দস্তানাটা নাড়ল মুসা, 'এটা দিয়ে বব আর ওর বাবাকে নির্দোষ প্রমাণ করা যাবে?'

'যেতে পারে, যদি প্রমাণ হয় দস্তানাটা মারলিন স্পাইকের।'

আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করল ওরা। আর কোন সূত্র পেল না। বাড়ি ফিরে চলল।

সাত

ইয়ার্ডে কিশোর আর রবিনকে নামিয়ে দিয়ে কাজ আছে বলে বাড়ি চলে গেল মুসা।

রবিনও যেতে চাইল।

কিশোর বলল, 'তোমার গিয়ে কাজ নেই। এখানেই থাকো। রাতে খেয়েদেয়ে একসঙ্গে বেরোব।'

রাশেদ পাশা বাড়ি নেই। জরুরী কাজে বেরিয়েছেন।

খাবার টেবিলে মিস্টার ক্রলারের কেসের কোন উন্নতি হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন মেরিচাচী।

যা যা হয়েছে, জানাল কিশোর

চাচী বললেন, 'বাড়িতে মেয়েমানুষ না থাকার এটাই সমস্যা। বাড়ি থাকে খালি। যে যা খুশি করার সুযোগ পায়। খালি পেয়েছে বলেই তো গাড়ি ফেলে রেখে যেতে পেরেছে চোর। অনেক আগেই বিয়ে করা উচিত ছিল মিস্টার ক্রলারের।'

কোন জবাব দিল না কিশোর। প্রসঙ্গটা আর এগোল না।

সবে খাওয়া শেষ করেছে ওরা, এই সময় বাজল ফোন। রবিনের হাত ধোয়া শেষ। সে গিয়ে রিসিভার তুলল।

তাকিয়ে আছে কিশোর। দেখছে কানে ঠেকিয়ে ওপাশের কথা শুনে ধীরে ধীরে ঝুলে পড়ছে রবিনের চোয়াল।

রিসিভার রেখে দিল রবিন। কিশোরের দিকে ফিরে বিমূঢ়ের মত বলল, 'ইয়ান ফ্লেচারের ফোন। ছেলেকে সহ একটা স্টেশন ওয়াগনে করে পালিয়ে গেছেন মিস্টার ক্রলার!'

দেরি না করে মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুজনে। ক্রলারদের ফার্মহাউসে এসে দেখল পুলিশ এবং কৌতূহলী জনতার ভিড়।

টেলিভিশনের একটা নীল ভ্যানের পাশে মোটর সাইকেল রাখল ওরা। কিশোর বলল, 'ক্যাপ্টেন, ওই যে।'

তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চলল ওরা।

বাড়ির দিকে এগোনোর সময় রবিন জিজ্ঞেস করল, 'পালাল কেন?'

মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। 'বুঝতে পারছি না। টহল দেয়ার সময় আমাদের একজন অফিসার গ্যারেজটা খোলা দেখে। সন্দেহ হয় তার দেখতে আসে। বাড়ির দরজায় তালা ছিল না। খাবার আর কাপড়-চোপড় সব নিয়ে গেছে।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি, 'কাল শুনানির সময় ওরা না ফিরলে তোমার চাচার অনেকগুলো টাকা গচ্চা যাবে।'

উত্তেজনায় কথাটা ভুলে গিয়েছিল কিশোর। জামানতের টাকা দিতে সে-ই রাজি করিয়েছিল চাচাকে।

প্রতিটি ঘরে ঢোকার সময় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রইল ওরা। ববের ঘরটা চেনে রবিন। ওটাতে ঢুকে দেখা গেল ওর তাঁবু আর স্লিপিং ব্যাগটা নেই।

'কিছু বুঝতে পারছি না,' সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে কিশোর বলল। 'এই কাজ কেন করল...'

একটা চাবির রিঙ বের করে দেখালেন ক্যাপ্টেন। এক মাথায় খরগোশের থাবা লাগানো। 'এটা চেনো?'

'চিনি,' জবাব দিল রবিন। 'ববের।'

'ঘণ্টাখানেক আগে হেমেল বীচ থেকে আরেকটা গাড়ি চুরি হয়েছে,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'তাতে পাওয়া গেছে এটা।'

বাইরের কোলাহলের মধ্যে ফিরে এসে ববের চাচার খোঁজ নিল কিশোর। আসেননি তিনি।

হেমেল বীচে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

মোটর সাইকেলের দিকে এগোনোর সময় বলল রবিন, 'দস্তানাটা যে পেয়েছি আমরা, এ কথা জানলে হয়তো পালাতেন না মিস্টার ক্রলার।' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে।

কিশোর বলল, 'ওরা পালিয়েছে, এ কথা বিশ্বাসই করতে পারছি না আমি।'

'আমিও না,' রবিন বলল। 'ধরে নিয়ে যায়নি তো? কিডন্যাপ?'

জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল কিশোর। লম্বা, তালপাতার সেপাই, ওদের চেয়ে বয়েসে সামান্য বড় একটা ছেলের ওপর চোখ পড়েছে। সবুজ গেঞ্জি পরেছে ছেলেটা, মাথায় সাদা হ্যাট। হাতে একটা নোটবুক। পেন্সিল দিয়ে তাতে কিছু লিখছে।

'কি হলো?' বলে রবিনও থমকে গেল। সেও দেখেছে ছেলেটাকে। 'শুঁটকি এখানে কি করছে?'

হাসিমুখে এগিয়ে এল টেরিয়ার ডয়েল। খিকখিক করে পিত্তি জ্বালানো হাসি হেসে বলল, 'অনেকগুলো টাকা খসল এবার গোঁফো পাশার গাঁট থেকে আহা, দয়া দেখাতে চোরের জামিন হতে গিয়েছিল। গাড়ি চোরের দোস্ত। কত কমিশন দিল?'

কঠোর হয়ে উঠল কিশোরের দৃষ্টি। জবাব দিল না।

রবিন চুপ থাকতে পারল না, 'গাড়ি চোরেরা শুঁটকির চেয়ে ভাল। লুকিয়ে থাকে। দুর্গন্ধ ছড়ায় না।'

কিছুই মনে করল না যেন টেরিয়ার। হাসি মুছল না মুখ থেকে। 'মনে হচ্ছে মাথাটা এবার খেলছে না বিটলে শার্লকদের। চিন্তা কোরো না। বুদ্ধি-পরামর্শের প্রয়োজন হলে চলে এসো আমার কাছে, খয়রাত দিয়ে দেব। অনেক খবর জানা আছে আমার।'

'কি করে জানলে?' বরফের মত শীতল কিশোরের কণ্ঠ। 'চোরের সহকারী ছিলে নাকি?'

জবাবে আরেকবার দেঁতো হাসি হেসে সেখান থেকে সরে গেল টেরিয়ার। কেউকেটা ভঙ্গিতে গিয়ে দাঁড়াল পুলিশ আর সাংবাদিকদের মাঝে।

'ধুর, মেজাজটাই বিগড়ে দিল!' নিমের তেতো ঝরল রবিনের কণ্ঠ থেকে।

সাগর থেকে আসা ফুরফুরে বাতাস মেজাজ ভাল করে দিল ওদের। অন্ধকার হয়ে আসা হাইওয়ে ধরে ওরা ছুটে চলেছে হেমেল বীচের দিকে। সেখানে পৌঁছে দেখল এক তরুণীর সঙ্গে কথা বলছে এক পুলিশ অফিসার। কথা বলার সময় বার বার চোখ মুছছে তরুণী। কাছে গিয়ে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। নিজেদের পরিচয় দিল।

জানা গেল, রাস্তায় গাড়ি রেখে সূর্যাস্ত দেখতে নিচের সৈকতে নেমেছিল

তরুণী। 'ভুলটা করেছিলাম গাড়িতে চাবি রেখে দিয়ে,' বলল সে। 'ঢালের নিচে নেমে এমন জায়গায় বসেছিলাম, আমার গাড়িটা দেখা যাচ্ছিল না। তবে হাইওয়ের দুদিকে চলন্ত গাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, আমার গাড়িটা চলছে। ডাকতে ডাকতে উঠে দৌড় দিলাম। কিন্তু দৌড়ে কি আর গাড়ি ধরা যায়! নিয়ে গেল!'

রকি বীচের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গাড়িটা।

পুলিশের গাড়িতে করে চলে গেল তরুণী। সূত্র খুঁজতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। রাস্তায় যেখানে গাড়িটা ছিল, সেখানে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল কিশোর। কয়েক গজ তফাতে থেকে রবিনও একই ভাবে দেখতে লাগল। অনেক নিচে থেকে আসছে তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ।

টায়ারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। পথের মোড় ঘুরে দক্ষিণ দিক থেকে বেরোল একটা গাড়ি। তীব্র গতিতে ছুটে এল ওদের দিকে।

হেডলাইটের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল রবিনের। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল রাস্তার কিনারে।

শেষ মুহূর্তে যেন ওকে দেখতে পেয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাল ড্রাইভার। মোচড় দিয়ে রাস্তার মাঝখানে উঠে গেল গাড়িটা। গতি না কমিয়ে চলে গেল।

ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে দেখতে পেল না রবিন।

'কিশোর!' চিৎকার করে ডাকল সে। অন্ধকার, নির্জন সৈকতে ছড়িয়ে পড়ল ওর ডাক। নিচের দিকে তাকাতে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল।

একটা ছোট ঝোপের গোড়া ধরে ঝুলছে কিশোর। দৌড়ে ওখানে নেমে গেল রবিন। ওপরে উঠতে সাহায্য করল ওকে।

'থ্যাংকস!' জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে কিশোর। 'গাড়িটার লাইসেন্স নম্বর রেখেছ?'

'কি করে? দেখার অবস্থা ছিল নাকি! তবে গাড়িটা মনে হলো বাদামী রঙের কার্লটন। বছরখানেকের পুরানো।'

আরও কয়েক মিনিট খোঁজাখুঁজি করল ওরা। কোন সূত্র পেল না। বাড়ি ফিরে চলল।

রাশেদ পাশা ফেরেননি। মিস্টার ক্রলারের নিরুদ্দেশের খবর শুনে চিন্তিত হলেন মেরিচাচী। টাকার জন্যে নয়, বব আর তার বাবা বিপদে পড়েছে অনুমান করে। আরেকটা খবর দিলেন, কিশোর আর রবিন বেরিয়ে যাবার পর একটা গাড়ি নাকি ঘোরাঘুরি করেছে বাড়ির সামনে।

'থেমেছিল নাকি?' জানতে চাইল কিশোর।

'পেছনের বেড়ার কাছে থেমেছিল। আমার চোখে যখন পড়ল, তখন চলতে আরম্ভ করেছে।'

বারান্দা থেকে নেমে দৌড় দিল কিশোর।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

জবাব দিল না কিশোর। তার পেছনে ছুটল রবিন। 'কিশোর, কি ব্যাপার?'

ওঅর্কশপে ঢুকল কিশোর। টান দিয়ে খুলল টেবিলের ড্রয়ার। স্থির হয়ে গেল। যা ভয় করেছিল। দস্তানাটা নেই। বেরোনোর আগে এখানে রেখে গিয়েছিল।

গুঙিয়ে উঠল রবিন, 'আমাদের একমাত্র সূত্রটাও গেল!'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। উজ্জ্বল হলো মুখ। রবিনের দিকে ফিরল। 'রবিন, জরুরী একটা সূত্র হারিয়েছি বটে, একটা লাভও হয়েছে আমাদের।'

'কি?'

'দস্তানাটা চুরি করে বুঝিয়ে দিয়েছে মারলিন স্পাইক, সে সত্যিই এর সঙ্গে জড়িত।'

'সে নিয়েছে কি করে বুঝলে?'

'সে ছাড়া আর কে নেবে? তার বিরুদ্ধে এটা ছিল একমাত্র প্রমাণ। সরিয়ে ফেলল।'

ঘরে এসে বসল দুজনে। টেলিভিশন খুলে খবরের অপেক্ষা কবতে লাগল।

খবরে গাড়ি চুরির কথা বলা হলো। ক্রলারদের আর কোন খবর নেই। হেমিল বীচ থেকে যে গাড়িটা চুরি হয়েছে সেটা একটা কার্লটন। বাদামী রঙের। রবিনের দেখায় ভুল হয়নি।

সোফা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'তারমানে চোরাই গাড়ি দিয়ে আমাদের গুঁতো মারার চেষ্টা করেছিল!'

'তা নাও হতে পারে,' কিশোর বলল। 'তাড়াহুড়ো করে বাঁক পেরোতে গিয়ে আমাদের দেখতে পায়নি। তাই গায়ের ওপরই তুলে দিচ্ছিল।'

টিভি বন্ধ করে দিয়ে কিশোর বলল, 'দক্ষিণ থেকে এসে উত্তরে গেছে গাড়িটা। অথচ পুলিশ বলছে, চোরাই গাড়ি নিয়ে যায় দক্ষিণে। এমন হতে পারে, চুরি করে প্রথমে দক্ষিণেই চলে যায় চোর, বোঝানোর জন্যে যে দক্ষিণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খানিক পর ঘুরিয়ে নিয়ে উত্তরে চলে যায়।'

'সেটা সম্ভব।'

আট

পরদিন সকালে থানায় ফোন করে জানতে পারল কিশোর, ক্রলাররা ফেরেনি।

কয়েক মিনিট পর রবিন এল। মুসা ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে, আসতে পারবে না। কাজ আছে।

'কি করা যায়, বলো তো?' রবিনের প্রশ্ন। 'এগোনোর মত কোন সূত্রই তো নেই আমাদের হাতে।'

'ভাবছি,' কিশোর বলল, 'চেস্টারটন কলেজে গিয়ে লয়েড ক্রলারের সঙ্গে

দেখা করব। কাল আসার কথা ছিল, আসেননি। ভাইয়ের নিরুদ্দেশের খবর শুনেছেন নিশ্চয়।'

'গেলে মন্দ হয় না। চলো।'

ট্রেনে করে রওনা হলো ওরা। চেস্টারটন স্টেশনে নামল। হেঁটে গেল কলেজে।

গাছপালায় ঘেরা ছায়াঢাকা সুন্দর একটা জায়গায় কলেজ। অফিসে ঢুকে খবর পেল ওরা, লয়েড ক্রলার নেই। আগের দিনই নাকি রকি বীচের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। ক্লার্ককে অনুরোধ করে তাঁর দুটো ছবি বের করা গেল ফাইল থেকে। লম্বা, মাঝবয়েসী একজন মানুষ। ধূসর হয়ে এসেছে গোঁফ। চোখে হর্ন-রিমড চশমা।

'কাল রওনা হলে এতক্ষণে তো পৌঁছে যাওয়ার কথা,' অফিস থেকে বেরিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'গেলেন কোথায়?'

দুপুরের পর রকি বীচে ফিরে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করল সে আর রবিন। লয়েড ক্রলারের নিরুদ্দেশের কথা জানাল। দুটো ছবি দিল তাঁকে। একটা মারলিন স্পাইকের। বব যেটা দিয়েছিল ওদেরকে, সেটার কপি। তার সম্পর্কে খোঁজ নিতে অনুরোধ করল কিশোর। দ্বিতীয় ছবিটা লয়েডের—কলেজের অফিস-ক্লার্কের কাছ থেকে যে দুটো এনেছিল, তার একটা।

থানা থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখে একজন লোক বসে আছে। পেশীবহুল শরীর। দামী পোশাক পরা। চোখে চশমা। নিজের পরিচয় দিল ব্যবসায়ী বলে। লস অ্যাঞ্জেলেসে নাকি ব্যবসা আছে তার।

রাশেদ পাশার কাছে একটা তদন্তের কাজে এসেছে, জানাল লোকটা।

কিশোর বলল, 'চাচা তো এখন অন্য কাজে ব্যস্ত, তদন্ত করার সময় পাবেন বলে মনে হয় না। কিছু বলার থাকলে আমাদের বলতে পারেন। আমরাও গোয়েন্দা।' তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিল সে। 'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু রবিন মিলফোর্ড।'

একটু ইতস্তত করে লোকটা বলল, 'কিন্তু আমার যে তাঁকেই দরকার। ঠিক আছে, তোমাদের সাহায্যই নাহয় নেয়া যাক। লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়ে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। পারবে আশা করি। তোমরাও বড় গোয়েন্দা, খবর পেয়েছি।' চশমা খুলে নিয়ে হাসল। 'তবে প্রথমেই মাপ চেয়ে নিই, আমার নামটা জানাতে পারছি না। অসুবিধে আছে।'

লোকটার আচরণ সন্দেহজনক লাগল কিশোরের কাছে। 'সরি, আমরা তো এখন রকি বীচ থেকে বেরোতে পারছি না। আরেকটা কেস আছে হাতে। এখানে হলে নাহয় চেষ্টা করে দেখতাম।'

হাসি মুছে গেল লোকটার মুখ থেকে। 'তারমানে তোমাদের কারও সাহায্য আমি পাব না!' প্রত্যাখ্যানে আহত হয়েছে মনে হলো সে। উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, কি আর করা। যাই।'

লোকটা বেরিয়ে গেলে রবিন বলল, 'আজব চরিত্র, তাই না? নামটা পর্যন্ত

বলল না!'

'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? বিদেশী সিগারেট খাচ্ছিল। টাই পিনে দুটো অক্ষর খোদাই করা, এল.বি.। নামের আদ্যক্ষর হবে।'

'কাজ না কচু! আসলে আমাদের রকি বীচ থেকে বের করে দিতে এসেছিল।'

'কেন?'

'হয়তো গাড়ি চোরদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে। ক্রুলারদের কিডন্যাপে ওর হাত থাকাটাও বিচিত্র নয়।'

'কি সাহায্য চাইতে এসেছিল, সেটাই তো জানা হলো না বুঝব কি করে?'

মুসাকে ফোন করল কিশোর। সারাদিনে তদন্তের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে, জানাল।

মুসা বলল, 'কিছুই তো এগোয়নি! রহস্য আরও জটিল হয়েছে।'

'হ্যাঁ। তোমার কাজ শেষ?'

'না আজ আসতে পারব না। দেখি, কাল সকালে।'

কিশোর রিসিভার রাখতেই উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল রবিন, 'কিশোর, ববের বোট! ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা! ওটা নিয়ে যায়নি তো ওরা?'

'গেলে বোটহাউসের কাছে ওদের স্টেশন ওয়াগনটা পাওয়া যেত। তবে গিয়ে দেখা যেতে পারে কোন সূত্র মেলে কিনা।'

দশ মিনিটের মধ্যে সাগরের তীরে এসে পৌঁছল ওরা। মোটর সাইকেল রেখে হেঁটে চলল বোটহাউসের দিকে। উঠে এল কাঠের ডকে। পায়ের চাপে মড়মড় করে উঠল তক্তা।

দিগন্তে চাঁদ উঁকি দিয়েছে। কিছুটা ওপরে ভাসছে হালকা একটুকরো মেঘ। ঝিঁঝি ডাকছে কাছেই কোথাও। এলোমেলো বাতাস আছড়ে পড়ছে ওদের গায়ে। কেমন যেন রহস্যময় একটা পরিবেশ চারধারে। হঠাৎ ডেকে উঠল একটা পেঁচা, গা ছমছম করে উঠল রবিনের। সবকিছু কেমন যেন অপার্থিব মনে হচ্ছে।

বোটহাউসের ভেতর আবছা অন্ধকার। ছয়টা বোট পাশাপাশি বাঁধা। ঢেউ বাড়ি খাচ্ছে ওগুলোর গায়ে। চাঁদের আলো পানিতে প্রতিফলিত হয়ে এসে বোটহাউসের টিনের দেয়ালে বিচিত্র ঝিলিমিলি সৃষ্টি করেছে। ববের বোটটা বাঁধা রয়েছে সারির একপ্রান্তে। চিনতে পারল ওরা।

'আছে!' ফিসফিস করে বলল রবিন। পরিবেশটা এমন, জোরে বলতে অস্বস্তি বোধ করছে।

ঠোঁটে আঙুল রেখে ইঙ্গিতে ওকে কথা বলতে নিষেধ করল কিশোর। হাত চেপে ধরে টেনে সরিয়ে নিল একধারে। একটা শব্দ কানে এসেছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দুজনে।

আর শোনা গেল না শব্দটা। কেবল ঢেউয়ের ছলাৎ-ছল।

পা টিপে টিপে ববের বোটটার দিকে এগোল দুজনে। কাছে এসে রেলিং ধরে নিচে উঁকি দিল। অন্ধকার। খোলের কিছু চোখে পড়ল না।

'ওটাতে উঠে দেখা দরকার,' রবিন বলল।

তক্তায় চাপ পড়ার মড়মড় শব্দ হলো।

'রবিন! সাবধান!' বলে চিৎকার করে ফিরে তাকাতে গেল কিশোর।

কঠিন একটা বাহু গলা পেঁচিয়ে ধরল তার। ভেজা কাপড় জড়িয়ে দিল নাকে-মুখে, মাথায়।

নয়

চোখ মেলে ছাতে ঢেউয়ের আবছা ঝিলিমিলি দেখতে পেল কিশোর। মাথাটা ভার।

ওর পাশে নড়ে উঠল রবিন।

উঠে বসল কিশোর। রবিনকে উঠতে সাহায্য করল।

'ববের বোটটা কোথায়?' ভাঙা স্বর বেরোল রবিনের গলা থেকে।

'নিয়ে গেছে।'

'কে মারল আমাদের, চেহারা দেখেছ?'

'না। তবে আমাকে ধরেছিল যে লোকটা, তার গায়ে শক্তি আছে। বেহুঁশ করল কি দিয়ে বুঝলাম না।'

'কোন ধরনের লিকুয়িড গ্যাস হবে।'

আর কিছু করার নেই এখানে। মনে একগাদা প্রশ্ন নিয়ে বাড়ি রওনা হলো ওরা। কে ওদের ওপর হামলা চালাল? ববের বোটটা চুরি করল কে? গাড়ি চোরেরা? ওরাই কি ববদের ফাঁসানোর জন্যে ওদের বাড়িতে গাড়ি রেখে এসেছিল? ক্যাকটাস ক্রলারের গুপ্তধনের খবর জানে ওরা? বব আর তার বাবা এখন কোথায় আছে?

বাড়ি ফেরার পথে থানায় থামল ওরা। ওদের ওপর যে হামলা হয়েছে সে কথা রিপোর্ট করল। ববের বোট চুরির খবরটাও জানাল ইয়ান ফ্লেচারকে।

থানা থেকে বেরিয়ে কিশোর বলল, 'এখন আরও শিওর হলাম, বব আর তার বাবা পালিয়ে যাননি। তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'নিয়ে গিয়ে যদি খুন করে ফেলে?'

'অবাক হব না। কাল থেকে আমাদের প্রধান কাজ হবে মারলিন স্পাইককে খুঁজে বের করা।'

পরদিন সকালে উঠে আগে মোটর সাইকেলের রেডিওটা মেরামত করল কিশোর। রবিন চলে এল ততক্ষণে। দুজনে বেরিয়ে পড়ল। চলে এল শহরের ভেতরে যেখানে হোটেল আর রুমিং হাউসগুলো আছে। রাতে স্পাইকের ছবির কয়েকটা কপি করে রেখেছিল কিশোর। রবিনকে একটা দিয়ে বলল,

'নাও। এটা দেখিয়ে খোঁজ নেবে কেউ এই লোককে দেখেছে কিনা।'

মোটর সাইকেল রেখে দুজন দুদিকে রওনা হয়ে গেল। রবিন গেল উত্তরে, কিশোর দক্ষিণে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এল দুজনে। স্পাইকের কোন খোঁজ পায়নি।

'মনে হচ্ছে এ শহরে নেই ও,' কিশোর বলল।

'তাহলে অন্য কোন শহরে?'

'যেতে পারে।'

'কি করব এখন?'

'বাড়ি ফিরে যাব। ওকে খুঁজে বের করার নতুন কোন উপায় ভাবতে হবে।'

ডকের ধারের রাস্তা ধরে ইয়ার্ডে রওনা হলো ওরা। একটা ট্রাফিক সিগনালে লাল আলো দেখে থামল। রবিনের চোখে পড়ল পেশীবহুল, দামী পোশাক পরা একজন লোক রাস্তা পেরোচ্ছে।

'কিশোর, দেখো, সেই লোকটা!'

একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল সে। ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করতেই পিছু নিল ওরা।

রকি বীচ রেল স্টেশনের সামনে গিয়ে থামল ট্যাক্সি।

মোটর সাইকেল রেখে লোকটার পিছু নিল দুই গোয়েন্দা। কোন জায়গার টিকেট কাটে, দেখল। লস অ্যাঞ্জেলেসের টিকেট কেটে ট্রেনে চাপল সে।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে রবিন বলল, 'মনে হয় সত্যি কথাই বলেছে লোকটা—লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকে।'

বাড়ি ফেরার পথে একটা রিয়েল-এস্টেটের অফিস দেখে কিশোর বলল, 'একটু দাঁড়াও। আমি আসছি।'

রবিনকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেল সে। দশ মিনিট পর ফিরে এল। হাতে একটা রোল করা বড় কাগজ।

'কি এটা?' জানতে চাইল রবিন।

'ম্যাপ। কোস্ট রোডের আশেপাশে সব কিছু চুলচেরা করে দেখানো আছে এতে।'

ইয়ার্ডে ফিরে দেখল ওরা, মুসা অপেক্ষা করছে। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু পেলে?'

মাথা নেড়ে ওঅর্কশপের দিকে রওনা হলো কিশোর। তার পিছে পিছে এল দুই সহকারী। হেডকোয়ার্টারে ঢুকল সবাই। ডেস্কে বসে সবগুলো আলো জেলে দিল কিশোর। ম্যাপটা টেবিলে বিছিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে শুরু করল।

সকালে বেরোনোর পর কোথায় কোথায় গিয়েছিল, মুসাকে বলতে লাগল রবিন।

অনেকক্ষণ পর মুখ তুলল কিশোর। চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, 'গাড়ি

চোরদের ধরতে পারলেই মিস্টার ক্রলার আর ববকে পাওয়া যাবে।'

'ওরা কি খুব বিপদে আছে বলে তোমার মনে হয়?' মুসার প্রশ্ন।

'হয়।'

'ওদের নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে গুপ্তধনের কোন সম্পর্ক আছে,' রবিন বলল। 'নইলে প্রফেসর লয়েড নিখোঁজ হলেন কেন? ক্যাকটাস ক্রলারের মেসেজটা দেখতে পারলে হত। আচ্ছা, গুপ্তধন উদ্ধার করতে বাপ-বেটাকে ধরে নিয়ে যায়নি তো কেউ?'

'তাও নিতে পারে,' মাথা কাত করল কিশোর।

আরও খানিকক্ষণ আলোচনা করে ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এল ওরা রান্নাঘরে ঢুকল।

চারটে চিঠি এগিয়ে দিলেন মেরিচাচী। 'দেখ পড়ে।'

চেয়ার টেনে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কে লিখেছে?'

'পাবলিক। আমরা যে ক্রলারদের সাপোর্ট করছি, এটা ভাল চোখে দেখছে না। সমালোচনা করেছে।'

একটা চিঠি পড়ে রবিন বলল, 'এদের মধ্যে একজনের গাড়ি চুরি হয়েছে। লিখেছে, ক্রলারদের যদি শাস্তি না হয়, তার গাড়ি না পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের দায়ী হতে হবে।'

'এ তো মহা মুসিবতে ফেলে দিল!' কপাল ডলল কিশোর।

'জাহান্নামে যাক ব্যাটারা! কিছু কিছু মানুষ থাকে, কিছু না বুঝেই অহেতুক লাফানো শুরু করে। ওরা যা বলবে তাই শুনতে হবে নাকি?'

'যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখন চোরগুলোকে ধরতে হবে। তাহলেই সব সমস্যা শেষ।'

খেয়েদেয়ে আবার হেডকোয়ার্টারে ঢুকল ওরা। একটা খবরের কাগজে চোখ বোলাতে শুরু করল রবিন। গাড়ি চোরদের আর কোন খবর আছে কিনা দেখছে। দশ মিনিটেই দেখা হয়ে গেল।

'তথ্য যা পাওয়া গেছে,' কিশোর বলল, 'তাতে কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার। এক, কেবল লেটেস্ট মডেলের গাড়িগুলোই চুরি যাচ্ছে। দুই, বেশির ভাগ চুরি হচ্ছে রাতের বেলা। দিনেও হচ্ছে, তবে কম। তিন, দলটা অনেক বড়। এবং চার, চুরি করে কোস্ট রোড ধরে উত্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গাড়িগুলো।'

মুসা বলল, 'তারমানে প্রথমে দক্ষিণে নিয়ে যায় ধোঁকা দেয়ার জন্যে?'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল। 'প্রথমে পুলিশ ভেবেছে দক্ষিণে যাচ্ছে গাড়িগুলো। রকি বীচে এবং এর আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করেছে। এখন উত্তরের শহরগুলোতেও নজর রাখতে শুরু করেছে।'

'পত্রিকায় লিখেছে বুঝি?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

হাত ওল্টাল মুসা, 'তাহলে নতুন আর কি জানলাম আমরা?'

ম্যাপে একটা মোটা কালো রেখার ওপর আঙুল রাখল কিশোর। 'এই

দেখো, এটা হলো কোস্ট রোড। উত্তর দিকে শেষ মাথায় রয়েছে বেরিংটন। কিন্তু চোরাই গাড়ি নিয়ে সোজা পথে এতদূর যাওয়ার ঝুঁকি নেবে না চোর। বাকি রইল এই শাখাপথগুলো—রিং রোড, শেট রোড এবং বাক রোড। কোস্ট রোডের সঙ্গে এসে মিশেছে। এ সব পথের মাথায় যতগুলো শহর আছে, সবগুলোতে নজর রেখেছে পুলিশ। কিন্তু একটা জায়গাতে খোঁজার কথা ভাবেনি।' মুখ তুলে এক এক করে দুই সহকারীর মুখের দিকে তাকাল কিশোর। 'শাখাপথগুলো যেখানে কোস্ট রোডের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তার আশেপাশে।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। 'এখন শোনো আমাদের কি করতে হবে। রাতে নজর রাখব শাখাপথগুলোর ওপর। দিনে এর আশপাশের তরাই অঞ্চলে খুঁজে বেড়াব। যতদূর মনে হয়, বনের মধ্যে কোথাও আস্তানা গেড়েছে চোরেরা।'

শিস দিল মুসা। 'রাতেও পাহারা, দিনেও পাহারা একসঙ্গে তিনটা রহস্যের তদন্ত। গেল আমার গাছ নিয়ে গবেষণা।'

'গেল কোথায়, ভালই তো হলো,' হেসে বলল রবিন 'বনে গেলে কত রকম গাছপালা দেখতে পাবে। ভেষজ গবেষণা করে করে শেষে না কবিরাজ হয়ে যাও তুমি!'

দশ

মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। মুসার পেছনে বসল রবিন।

রিং রোডের মুখে এসে কিশোর বলল, 'এখান থেকেই শুরু করি।'

এটা হাইওয়ে নয়, গাড়ি চলাচল কম। বাতাস বন্ধ ডালপালা শূন্য পাইনের জঙ্গলে ছায়াও কম।

বনে ঢুকল ওরা। মুসার হাতে একটা বই। তাতে নানা জাতের গাছের ছবি। নতুন ধরনের গাছ চোখে পড়লে বই দেখে নাম জেনে নেবে।

বনের ভেতরে, বাইরে, কোথাও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। গাড়ির চাকার দাগ নেই। কোন বাড়িঘরও নেই।

ফিরে এসে মোটর সাইকেলে চেপে আরও কয়েকশো গজ দক্ষিণে সরে গেল ওরা। আরেকটা বনে ঢুকল।

মিনিট পাঁচেক পর পাহাড়ের ঢালের বন থেকে একটা শব্দ শোনা গেল। আঙুল তুলে ইশারা করল কিশোর। মোটর সাইকেল রেখে একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা।

পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। ঝোপ থেকে বেরোল একজন মানুষ। লম্বা, ছিপছিপে। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। কাপড়-চোপড় অতিরিক্ত পুরানো। মাথার হ্যাটের চাঁদিতে বিশাল এক ফুটো। জুতোগুলো পায়ের মাপের চেয়ে বড়।

একটা জুতোর আঙুলের কাছে ছেঁড়া।
লোকটাকে পরিচিত মনে হলো।
হঠাৎ মুসা বলে উঠল, 'আরে, এ তো কারেল ফিন!'
হ্যাঁ, কিশোর আর রবিনও চিনে ফেলল। আশেপাশের দশ-বিশটা শহরের অনেকেই চেনে একে। ভবঘুরে। লোকে বলে, জন্মের পর থেকেই নাকি ও ভবঘুরে হয়েছে। কাজকর্ম কিছু করে না। কেউ দিলেও করতে চায় না। খালি ঘুরে বেড়ায়।
বেরিয়ে এল তিনজনে।
ওদের দেখে দাঁড়িয়ে গেল কারেল। ভুরু কুঁচকে তাকাল। চিনতে পারল মুসাকে। বছরখানেক আগে একবার একটা পুরানো প্যান্ট দিয়েছিল ওকে মুসা। কারেলের স্মৃতিশক্তি খুব ভাল। কেউ কিছু দিলে মনে রাখে সে। যে দেয় তার চেহারা কখনও ভোলে না।
'মুসা, তুমি! এই জঙ্গলে কি?'
হেসে এগিয়ে গেল মুসা। হাত বাড়িয়ে দিল। 'একটা জিনিসের খোঁজে এসেছি, কারেল। এখানে গাড়ি ঢুকতে দেখেছ নাকি?'
ছেঁড়া হ্যাটটা খুলে নিয়ে চাঁদি চুলকাল কারেল। মাথা ঝাঁকি দিয়ে লম্বা লম্বা চুল নেড়ে বলল, 'দেখিনি। শুনেছি।'
'মানে?'
'হ্যাঁ, দুদিন আগে। বনের মধ্যে। প্রথমে এঞ্জিনের শব্দ। তারপর বিকট শব্দে কি যেন ধসে পড়ল। গিয়ে কিছু দেখলাম না। খানিক পর রাস্তায় সাইরেন শোনা গেল।'
পুলিশের সাইরেন—ভাবল কিশোর। কিন্তু অন্য শব্দটা কি? কি ধসে পড়ল?
কারেল বলল, 'আরেক দিন এই বন থেকে একটা লোককে গাড়ি নিয়ে বেরোতে দেখেছি। কোস্ট রোড ধরে ওকে হেঁটে যেতেও দেখেছি।'
লোকটা দেখতে কেমন, জানতে চাইল কিশোর।
'বিশালদেহী। টাক মাথা। চেহারাটা চোরের মত। বন থেকে বেরোনোর সময় মেজাজ খুব খারাপ ছিল।'
'কি করে বুঝলেন?'
'মুখচোখ খিঁচিয়ে রেখেছিল।'
পকেট থেকে স্পাইকের ছবিটা বের করে দেখাল রবিন, 'এই লোক?'
মাথা ঝাঁকাল কারেল। 'হাতে একটা ছড়ি ছিল। খোঁড়া নয়, ও ছড়ি দিয়ে কি করে বুঝলাম না।'
স্পাইককে এই এলাকায় দেখা গেছে শুনে উৎসাহ পেল তিন গোয়েন্দা। মনে হলো ঠিক পথেই এগোচ্ছে। কারেলকে ধন্যবাদ দিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এল।
এখানে আপাতত আর কিছু করার নেই। রকি বীচে ফিরে চলল ওরা।
কিছুদূর এসে সৈকতের দিকে চোখ পড়তে রবিনকে মোটর সাইকেল

থামাতে বলল মুসা।

থামাল রবিন। 'কি?'

হাত তুলে একটা বালির ঢিবি দেখাল মুসা, 'ওটার ওপাশে কি যেন দেখলাম। মনে হলো দুজন মানুষ পড়ে আছে।'

নেমে খানিকটা পিছিয়ে এল মুসা। রাস্তার কিনারে সরে ভাল করে তাকাল। আবার দেখতে পেল দুজনকে। এমন জায়গায়, রাস্তার একটা বিশেষ জায়গা থেকে শুধু চোখে পড়ে। ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ বলেই দেখেছে।

কিশোরও মোটর সাইকেল থামিয়ে নেমে এল।

তিনজনে মিলে এগোল ঢিবিটার দিকে। অন্য পাশে এসে দেখল, দুজন মানুষকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। কাপড়ে-চোপড়ে জেলে বলে মনে হলো।

তাড়াতাড়ি ওদের বাঁধন খুলে দিল গোয়েন্দারা। একজনের মুখে গোঁজা কাপড় খুলতেই বলে উঠল, 'আমাদের বেঁধে রেখে গাড়ি নিয়ে চলে গেছে!'

'কতক্ষণ আগে? কি গাড়ি?' জানতে চাইল কিশোর।

'এই দু'তিন মিনিট। একটা বাদামী কনভর। টায়ারে সাদা রিং আঁকা।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা, 'দেখেছি! আমাদের পাশ দিয়েই তো গেল। কল্পনাই করিনি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে!'

কিশোর বলল, 'চলো চলো! তাড়াতাড়ি গেলে এখনও হয়তো ধরা যায়!'

'কি করে?' রবিনের প্রশ্ন। 'এতক্ষণে বহুদূরে চলে গেছে ও।'

'শর্ট কাটে যাব। এসো।'

পুলিশকে ফোন করার জন্যে খানিক দূরের একটা ফার্মহাউসের দিকে দৌড় দিল লোক দুজন। মোটর সাইকেলের দিকে ছুটল তিন গোয়েন্দা।

সিকি মাইল দূরে সরু একটা রাস্তা নেমে গেছে হাইওয়ে থেকে। অনেক পুরানো কাঁচা রাস্তা। পাথরের ছড়াছড়ি। জঙ্গল। দু'পাশ থেকে চেপে এসেছে ঝোপঝাড়। খানিকদূর এগিয়ে আবার হাইওয়েতে উঠেছে। এটা জোহান্স রোড, ম্যাপে দেখেছে কিশোর। নেমে পড়ল তাতে।

এবড়ো-খেবড়ো পথে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটল মোটর সাইকেল। ধুলোর ঝড় উঠল পেছনে।

কয়েক মিনিট পর আবার হাইওয়েতে উঠে এল ওরা। কিশোর বলল, 'এখনও আমাদের আগে রয়েছে গাড়িটা। তবে ধরতে পারব মনে হয়।'

উত্তরে ছুটল ওরা। একের পর এক অতিক্রম করে চলল সামনের গাড়িগুলোকে। রাস্তার পাশে মাঠ। গরু চরছে। কয়েকটা মাঠ পার হয়ে আসার পর দেখা গেল বাক রোড। ধুলো উড়ছে।

নিশ্চয় কোন গাড়ি ঢুকেছে—ভেবে শাখা পথটায় মোটর সাইকেল নামিয়ে দিল কিশোর। বাদামী গাড়িটাকে দেখার আশায় দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ছড়িয়ে দিয়েছে সামনে।

কিছুদূর আসার পর হঠাৎ বনের ভেতর একটা জোরাল শব্দ শোনা গেল। মনে হলো দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে।

ডানে তাকাল মুসার পেছনে বসা রবিন। আঙুল তুলে চিৎকার করে বলল, 'ওদিকে!'

এক ঝটকায় হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে বনের মধ্যে মোটর সাইকেল নামিয়ে দিল মুসা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ছুটল কিশোর এখন পেছনে।

বনের মধ্যে একজায়গায় এসে চাকার দাগ চোখে পড়ল। কিন্তু একটা গাড়িও নেই

মোটর সাইকেল থামিয়ে সূত্র খুঁজতে শুরু করল ওরা। মাটিতে এখানে ওখানে রঙের শুকনো চটা পড়ে আছে। বাদামী সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা রুমালে রাখল কিশোর

বনে থাকতেই আবার গাড়ির শব্দ কানে এল দৌড়ে রাস্তায় ফিরে এল ওরা। সামনে অনেক দূর এগিয়ে দেখে এল। পেল না গাড়িটা তবে একটা ঝোপের আড়ালে একটা গাড়ি যে থেমেছিল, সেই চিহ্ন দেখল

হাইওয়েতে ফিরে এল ওরা।

'যায় কোথায়?' বিড়বিড় করল রবিন। 'বাতাসে মিলিয়ে যায় নাকি!'

ফেরার পথে থানায় থেমে রঙের চটাগুলো ক্যাপ্টেনকে দিয়ে এল কিশোর। পরীক্ষা করে দেখার জন্যে।

ইয়ার্ডে ফিরে মোটর সাইকেল রেখে সোজা রান্নাঘরে ঢুকল তিনজনে। খিদে পেয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে কেক আর দুধ দিয়ে নাস্তা সারল। তারপর ক্যাপ্টেনকে ফোন করল কিশোর। স্পাইক আর প্রফেসর লয়েডের কোন খোঁজ আছে কিনা জানতে চাইল।

প্রফেসরের খোঁজ পাওয়া যায়নি, জানালেন তিনি। মারলিন স্পাইক এখন কোথায়, সেটা জানতে পারেননি, তবে ওর সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা গেছে। সামরিক বাহিনীতে চাকরি করত সে। অসাধুতার জন্যে চাকরি যায়। লিভেনওয়ার্থে জেলও খাটে কিছুদিন। জন্ম থেকে বাঁওয়া, তবে এখন দুটো হাতই ব্যবহার করতে পারে।

মেরিচাচী ইয়ার্ডের অফিসে ব্যস্ত, কাঁচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কিশোররা চত্বরে বেরোতেই হাতের ইশারায় ডাকলেন।

'খাইছে!' মুসা বলল। 'ডাকার ভঙ্গিটা তো ভাল না। কাজে লাগিয়ে দেবে না তো?'

'তোমরা এখানে দাঁড়াও,' কিশোর বলল। 'আমি শুনে আসি।'

অফিসে ঢুকল কিশোর।

কাজের কথা বললেন না চাচী। একটা সাদা খাম বের করে দিলেন।

খামটা হাতে নিল কিশোর। নাম-ঠিকানা নেই। তারমানে ডাকে আসেনি। উল্টোপিঠে একটা বোতলের ছবি আঁকা। চাচীর দিকে তাকাল সে। 'কে দিল?'

'একটা লোক। নীল মাফলার দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিল, চেহারা দেখতে পারিনি। এসে তোকে চাইল। বললাম, নেই। কোথায় গেছিস জিজ্ঞেস করল। বললাম, জানি না। কখন ফিরবি ঠিক নেই। লোকটার মনে হলো

তাড়াহুড়া আছে। একটু দ্বিধা করে এই খামটা বের করে দিয়ে বলল তোকে দিতে।'

এগারো

খামটা নিয়ে দুই সহকারীর কাছে ফিরে এল কিশোর। ওদের সহ ওঅর্কশপে ঢুকল।

খাম ছিঁড়তে বেরোল একটা ফটো কপি করা কাগজ। অনেক পুরানো একটা মেসেজের কপি। অনেক শব্দ মুছে গেছে। ইংরেজিতে লেখা রয়েছে:

... when the storm broke...alone...to give our position in the hope that...vegitation no protection...shelter but crash of countless...breaking black illows...high vein of gold···

মার্জিনে একটা পাতা আঁকা।

কাগজটা ঠেলে দিল কিশোর। 'দেখো। মনে হচ্ছে মেসেজের শেষ অংশটা কেটে রেখে দেয়া হয়েছে।'

মুসা আর রবিনও দেখল বুঝল না কিছু

'আমার বিশ্বাস, এটাই ক্যাকটাস ক্রলারের মেসেজ,' কিশোর বলল 'ঝড়ের কবলে পড়ে হারিয়ে গেছে পরিবার সহ।'

'কোন জায়গায়?' রবিনের প্রশ্ন

'কোথাও ঠাঁই নিয়েছিল, বোঝা যায়। ভেজিটেশন বলতে কোন বন বা ঝোপঝাড় বুঝিয়েছে। মার্জিনে আঁকা পাতাটাও কোন সূত্র হতে পারে

ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না মুসার। চুপ করে রইল।

হাতের পেন্সিল দিয়ে কপালে টোকা দিল রবিন। 'পানিতে ভেসে এসে তীরে ঠেকেছে বোতল। তারমানে তো নৌকা থেকে ফেলা হয়েছে সাগরে ছিল তখন ক্যাকটাসের পরিবার।'

রবিনের কথায় কান নেই কিশোরের ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। 'লিখেছে, ভেজিটেশন, শেলটার। তারমানে ডাঙা মেসেজটা লেখার জন্যেও একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল।'

চুপ করে তাকিয়ে রইল মুসা আর রবিন।

আপনমনে কথা বলছে কিশোর, কোন জটিল ধাঁধা কিংবা সাঙ্কেতিক মেসেজের জট ছাড়াতে হলে এমনই করে সে। 'ক্র্যাশ অভ কাউন্টলেস···ব্রেকিং ব্ল্যাক ইলোজ···হাই ভেইন অভ গোল্ড···' থামল সে। তারপর বলল, 'ভেইন মানে শিরা!'

'সোনার শিরা এ অঞ্চলে কোথায় আছে?' বিড়বিড় করল রবিন।

ওর দিকে তাকাল কিশোর, 'সেটাই বের করতে হবে।'

ছাতের দিকে তাকিয়ে আবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করল সে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখ। তুড়ি বাজাল দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে। 'বুঝে ফেলেছি! ব্রেকিং ব্ল্যাক ইলোজ! ইলোজ মানে উইলোজ—সামনের ডব্লিউটা মুছে গেছে। ব্ল্যাক উইলোজ মানে কালো উইলো গাছের বন। ব্রেক মানে ভাঙা, ক্র্যাশ মানে ধসে পড়া। তাহলে কি দাঁড়াল? তুফানে কালো উইলো গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে, গাছ ধসে পড়েছে।'

'তা তো বুঝলাম,' অবাক হয়ে বলল রবিন। 'কাউন্টলেস ব্ল্যাক উইলোজ—অগণিত কালো উইলো গাছ, মানে হলো বিশাল বন। এ রকম বন তো থাকে ডাঙায়, দেশের মূল ভূখণ্ডের ভেতরে, সাগরের মাঝখানে বা দ্বীপেটীপে নয়। বন থেকে সাগরে গেল কি করে বোতলটা, এখনও মাথায় ঢুকছে না আমার।'

হাসল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল। 'কি, বন বিশেষজ্ঞ?'

হাঁ হয়ে গেল মুসা। 'আমি আবার বন বিশেষজ্ঞ হলাম কবে থেকে?'

'তাহলে কিসের গবেষণা করলে এতদিন ধরে? তোমার বইটা দেখো না, তাহলেই তো হয়। এদিকে কোথায় ব্ল্যাক উইলোর বন আছে, দেখে ফেলো।'

বইটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল মুসা। 'শ্যাডো লেক…ওয়ারনার…জ্যাকসনভিল…রেড রিভার…'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত তুলল রবিন, 'রেড রিভার! নদীটা সাগরে গিয়ে পড়েছে। সাগর থেকে নৌকায় করে নদীতে ঢোকা যায়। মনে হয় এটার কথাই বলেছে ক্যাকটাস।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'পাহাড়ী নদী কিংবা ঝর্নার বালিতে সোনা পাওয়া যায়।'

রকি বীচে স্বর্ণ সন্ধানের যুগের ইতিহাস ঘাটার পরামর্শ দিল রবিন। মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

'গুড আইডিয়া,' পছন্দ হলো কিশোরের। 'এখন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই মেসেজটা কি আসল, না নকল?'

'অবশ্যই নকল। কারণ এটা ফটো কপি।'

'আমার প্রশ্ন,' মুসা বলল, 'খামটা দিয়ে গেল কে?'

তর্জনি তুলল কিশোর, 'প্রফেসর লয়েড ক্রলার। একটা কথা বুঝতে পারছি না, নিজেকে লুকিয়ে রাখছেন কেন তিনি?'

জবাব দিতে পারল না কেউ।

পরদিন সকালে ডাকবাক্স খুলে আরও কিছু চিঠি পাওয়া গেল, যেগুলো তিন গোয়েন্দা আর রাশেদ পাশাকে অভিযোগ করে লেখা হয়েছে। শেষ চিঠিটা ডিয়ারভিল থেকে পোস্ট করা হয়েছে। ওখানকার ডাকঘরের ছাপ মারা। খুলে থমকে গেল কিশোর। টাইপ করা চিঠি। লিখেছে:

কিশোর,

আমাদের সাহায্য করে বোকামি করেছ। তবে যা করেছ করেছ, আর কোরো না।

—বব

রবিন এল। তাকে চিঠিটা দেখাল কিশোর।

ভুরু নাচাল রবিন। 'তোমার কি মনে হয়?'

'ফলতু। আমাদের ছেলেমানুষ ভেবেছে। ববের নাম দিয়ে চিঠি লিখলেই মনে করেছে আমরা বিশ্বাস করে বসে থাকব।'

'আমারও তাই ধারণা। বব এ চিঠি লিখতেই পারে না।'

'চিঠিটায় আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছ? টাইপ করতে গেলে যে সব কী-তে বাঁ হাতের আঙুল পড়ে, সেই অক্ষরগুলোর কালি ডান দিকেরগুলোর চেয়ে ভারী। বাঁ আঙুলের চাপ জোরে পড়েছে। এর একটাই অর্থ, লোকটা বাঁওয়া।'

'মারলিন স্পাইক!'

'ইয়েস, মারলিন স্পাইক।'

ম্যাপে রেড রিভার পাওয়া গেল। দাগ দিয়ে রাখল কিশোর। শেট রোডের ধারেও একটা বন দেখা গেল। সেটা ব্ল্যাক উইলো গাছের কিনা, ওখানে না গেলে জানা যাবে না।

পরদিন সকালে সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। গাড়ি চোরদেরও খোঁজা হবে, ব্ল্যাক উইলোর বন আছে কিনা তাও দেখা যাবে।

গিয়ে একটা ঝর্না পেল। ব্ল্যাক উইলোর বনও পাওয়া গেল। কিন্তু ঝর্নার বালিতে সোনা আছে কিনা কি করে বুঝবে? বনের মধ্যে কোথাও গুপ্তধন লুকানো আছে কিনা, সেটা বোঝারও উপায় নেই। মেসেজে যে পাতাটা আঁকা আছে, সেই রকম পাতাওয়ালা কোন গাছও চোখে পড়ল না।

একটা গাছের নিচে বসে পড়ল মুসা। 'আমাদের পরের কাজটা কি?' পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটুকরো ফুলকপি বের করল সে। 'খাবে নাকি?'

ভুরু কোঁচকাল রবিন। 'কাঁচা?'

'হ্যাঁ। খুব পুষ্টিকর।'

'না,' হাত নাড়ল কিশোর, 'খুব জমাও তোমার পুষ্টি। আমাদের লাগবে না। কাজের কথা শোনো। আজ রাত থেকেই পাহারায় বেরোলে কেমন হয়?'

'এখানে?' ফুলকপি চিবাতে চিবাতে বলল মুসা।

'না। রিং রোডে।'

'আমি রাজি,' রবিন বলল।

সন্ধ্যার সময়ই খাওয়া সেরে সারা রাতের জন্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। রিং রোডে পৌঁছে কয়েকটা গাছের জটলার ভেতরে লুকিয়ে বসল। পালা করে পাহারা দেবে।

ধীরে ধীরে কাটতে লাগল সময়। রাত যত বাড়ল, রাস্তায় যানবাহনের ভিড় তত কমতে লাগল।

রেডিও অন করে রেখেছে। আর কোন গাড়ি চুরির খবর এল না।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার ঘন্টাখানেক পর মুসা আর রবিনকে ডেকে তুলল কিশোর।

'গাড়ি চুরি বন্ধ করে দিল নাকি ব্যাটারা?' হাই তুলতে তুলতে বলল মুসা।

'চোর কি আর অত সহজে ভাল হয়,' রবিন বলল। 'বন্ধ করলেও সেটা সাময়িক।'

তার অনুমান যে ঠিক, খানিক পরেই সেটার প্রমাণ পেল। রেডিওতে খবর শোনা গেল, কয়েক ঘন্টা আগে কোস্ট রোডের ধারের পেট্রল পাম্প থেকে একটা গাড়ি চুরি গেছে।

'কয়েক ঘন্টা আগে চুরি হয়ে থাকলে এতক্ষণে এখানে চলে আসার কথা,' কিশোর বলল। 'প্রমাণ হলো—রিং রোডের আশেপাশের জায়গাকে গাড়ি লুকানোর জন্যে ব্যবহার করে না চোরেরা।'

'তিনটার মধ্যে একটা গেল। বাকি রইল দুটো,' দুই আঙুল তুলল রবিন। 'আজ রাতে শেট রোডে পাহারা দেব আমরা। কি বলো, কিশোর?'

'হ্যাঁ, দুটোর যে কোন একটাতে দিলেই হয়।'

বাড়ি রওনা হলো ওরা।

সকাল দশটা নাগাদ রকি বীচ রেকর্ডস অফিসে ফোন করল রবিন, পুরানো গোল্ড ক্লেইমগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার জন্যে।

রিসিভার নামিয়ে রাখতে ওর দিকে তাকাল কিশোর। 'কি বলল?'

'কিছুই না। যে লোক মিনারেল রেকর্ড ডিল করে, সে ছুটিতে। শহরের বাইরে গেছে। কাল আসতে পারে। নাহলে সোমবার।'

সোমবারের আগে না এলে দুদিন অপেক্ষা করতে হবে। বিরক্ত হয়ে মুসা বলল, 'দূর! কোন কাজই এগোচ্ছে না!'

দুপুরে খাওয়ার পর বেরোল তিনজনে আরেকটা উইলোর বন দেখে আসার জন্যে। মুসার পরনে খাকি শর্টস, মাথায় পিথ হেলমেট। যেন আফ্রিকায় সিংহ শিকারে বেরিয়েছে। বেইল গিবসন নামে এক লোকের একটা খামারের কাছে ঝর্না পাওয়া গেল। কিনারে বেশ বড়সড় বন আছে বনের মধ্যে ঝোপঝাড়ে খোঁজাখুঁজি করল ওরা। ঝর্নার বালিতে সোনার নমুনা খুঁজল। কিছুই পেল না কোথাও।

'খামোকা ঘুরলাম!' একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল মুসা। প্যান্টে লেগে যাওয়া চোরকাঁটা খুঁটে বের করতে করতে বলল, 'কোথায় গাছ! উইলোর একটা ডালও তো দেখলাম না। মেসেজে আঁকা পাতার মত পাতাও নেই। খড়ের গাদায় সুচ খুঁজছি না তো?'

'এ ছাড়া উপায়ও দেখছি না আর কিছু,' কিশোর বলল।

রবিন বলল, 'আকাশ থেকে দেখলে কেমন হয়?'

'প্লেনে করে? মন্দ হয় না। প্লেন এখন পাব কোথায়?'

'ল্যারি কংকলিন। মিস্টার সাইমনকে ধরব।'

'ল্যারিকে পাওয়া গেলেই চলবে, মিস্টার সাইমনকে আর বলা লাগবে না। চলো গিয়ে দেখি, আছে নাকি।'

ওরা যেখানে আছে, সেখান থেকে এয়ারপোর্ট বেশি দূরে নয়। আধঘন্টার মধ্যেই পৌছে গেল। টারমিনালের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে কিছুদূর এগোলে একটা ছোট হ্যাঙ্গার। পাবলিকের কাছে ভাড়া দেয়া হয়।

কয়েকটা সিঙ্গল-এঞ্জিন বিমান দেখা গেল সেখানে। গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের বিমানটাও দেখা গেল আছে। ল্যারিকে পাওয়া গেল পাইলটদের ক্লাবে। কাজকর্ম নেই। বসে বসে তাস খেলছে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে খুব খুশি।

মুসার পোশাকের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তোমার এই দশা কেন? হাতি মারতে গিয়েছিলে নাকি?'

'না, গাছ মারতে,' জবাব দিল রবিন।

বুঝতে পারল না ল্যারি। তাকে বুঝিয়ে দেয়া হলো।

বিশ মিনিটের মধ্যে আকাশে উঠল ওরা।

'প্রথমে কোনদিকে যাব?' জিজ্ঞেস করল সে।

'উত্তর দিকে,' বলল কিশোর।

সূর্যকে একপাশে রেখে উড়ে চলল বিমান। নিচে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে। সাদা বালির সৈকতে একটা নীল সীমারেখা তৈরি করেছে। কোলের ওপর ম্যাপ বিছিয়ে নিয়েছে রবিন। মুসা আর কিশোরের চোখে দূরবীন।

কয়েক মিনিট পর একটা বুনো এলাকার ওপরে চলে এল বিমান। প্রচুর ডোবা, খাল আর ঝর্না চোখে পড়ছে। ম্যাপে আঁকা আছে সব। দেখে দেখে মিলিয়ে নিচ্ছে গোয়েন্দারা। ম্যাপে নেই এমন কোন ঝর্না বা খাল আছে কিনা নিচে, খুঁজছে। কিছুই না পেয়ে দক্ষিণে খুঁজতে চলল। পেল না এদিকেও।

অন্য আরেক দিকে ল্যারিকে যেতে বলল কিশোর। 'ম্যাপটা ঠিক আছে কিনা ভাবছি!'

বিমানের নাক নামিয়ে দিল ল্যারি। 'আরেকটু নিচে নেমে দেখি।'

নেমে এল বিমান। অনেক চওড়া হয়ে গেল কালো মহাসড়কটা। ওপরে থাকতে বিন্দু ছিল গাড়িগুলো, এখন বড় আকারের খেলনা। আরও নিচে নামল বিমান। আরও বড় হলো গাড়িগুলো। একপাশে উঁচু একটা পাহাড়। খাড়া সাগরের পানিতে নেমে গেছে পাহাড়ের ঢাল।

বিমানের ছায়া পড়ল সাগরের নীল পানিতে। কাঁপতে কাঁপতে এগোল। বিচিত্র দৃশ্য।

হঠাৎ পেছনে ঠুস করে শব্দ হলো। ঝনঝন করে ভেঙে গেল ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের কাচ।

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'গুলি করছে আমাদের!'

'জানালার কাছ থেকে সরে থাকো!' ল্যারিও চিৎকার করে উঠল। মুহূর্তে বিমানের নাক ওপর দিকে তুলে দিল সে।

'কোথায় লাগল?' চারপাশে তাকাচ্ছে রবিন।

'মোটর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে,' ল্যারি বলল।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে গুলি কোনখান থেকে হয়েছে বোঝার চেষ্টা করল তিন গোয়েন্দা। কিন্তু অনেক ওপরে উঠে এসেছে বিমান। বোঝা গেল না।

ঘাঁটিতে ফিরে নিরাপদেই ল্যান্ড করল ল্যারি। খবর পেয়ে সিভিল এরোনটিকস বোর্ডের তদন্তকারী অফিসাররা ছুটে এল। তিন গোয়েন্দা তখন তাকিয়ে আছে বিমানের গায়ে একটা বুলেটের ছিদ্রের দিকে।

পরীক্ষা করে অফিসাররা রায় দিল, বিদেশে তৈরি মেশিনগান থেকে গুলি করা হয়েছে। রিপোর্ট তৈরি করতে চলে গেল ওরা।

কিশোর বলল, 'আমরাও যাই। শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিলাম। প্লেনটারও ক্ষতি হলো।'

'ও আর কি,' ল্যারি বলল। 'মেরামত করলেই সেরে যাবে। টাকা তো দেবে বীমা কোম্পানি। গোয়েন্দার প্লেন, ক্ষতি হবে জেনেই বেশি প্রিমিয়ামে বীমা করিয়েছে ওরা।'

স্যালভিজ ইয়ার্ডে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

সন্ধ্যায় খেয়েদেয়ে আবার বেরোল। আজ শেট রোডে পাহারা দেবে।

কোস্ট রোডের সঙ্গে যেখানে মিলিত হয়েছে রাস্তাটা, তার পঞ্চাশ গজ দূরের ঢালে পাইনের বনে লুকিয়ে বসল ওরা। আগের রাতের মত পালা করে পাহারা দেবে। কিন্তু রাত এখনও বেশি হয়নি। ঘুম পাচ্ছে না কারও। তাই তিনজনেই বসে রইল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কোস্ট রোড থেকে তীব্র গতিতে মোড় নিয়ে শেট রোডে ঢুকল একটা গাঢ় রঙের স্যালুন। অন্ধকারে রঙটা ঠিক বোঝা গেল না।

গাড়িটার মতিগতি ভাল লাগল না কিশোরের। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'এসো তো দেখি!'

মোটর সাইকেলের দিকে দৌড় দিল সে। পেছনে মুসা আর রবিন।

বারো

বনের অন্ধকার ফুঁড়ে দিল দুটো মোটর সাইকেলের হেডলাইট। সামনে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখা গেল গাড়িটার পেছনের লাল আলো।

'রেডিওটা অন করে দাও,' বলল মুসার পেছনে বসা রবিন।

অন করে দিল মুসা। কোন চুরির খবর ঘোষিত হলো না পুলিশ ব্যান্ড থেকে।

মোড় পেরোতে আবার চোখে পড়ল গাড়িটা। দূরত্ব কমছে। গতি কমাচ্ছে ওটা।

'আমাদের পুলিশ ভাবল নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।
গতি আরও কমিয়ে ঘুরতে শুরু করল গাড়িটা।
দাঁড়িয়ে গেল মুসা। পেছন থেকে তার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর। ওর দিকে তাকাল মুসা, 'ঘুরে আবার এদিকে আসছে কেন?'
'বুঝলাম না!'
ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল গাড়িটা।
'চলো দেখি, কোথায় যায়?' মোটর সাইকেল ঘোরাতে শুরু করল কিশোর।
ওদের পিছু নেয়াটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না যেন ড্রাইভার। ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল আবার কোস্ট রোডে।
'আরি, ও তো রকি বীচের দিকে যাচ্ছে!' রবিন বলল।
গতি বাড়াল না গাড়িটা, কমালও না। এক গতিতে ছুটতে থাকল। শহরে ঢুকে পড়ল। এত রাতে নির্জন হয়ে এসেছে পথঘাট। ডক এলাকায় ওয়াটারফ্রন্ট হোটেলের পার্কিং লটে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল লোকটা।
একটা ট্রাকের পেছনে মোটর সাইকেল থামাল গোয়েন্দারা। দূরবীন তুলে চোখে লাগাল কিশোর। ড্রাইভারের টাকমাথা, গাট্টাগোট্টা শরীর। একবারও পেছনে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে গেল হোটেলের দিকে।
দূরবীনটা মুসার হাতে দিতে দিতে উত্তেজিত স্বরে কিশোর বলল, 'অবশেষে খুঁজে পেলাম!'
'স্পাইক!' দেখেই বলে উঠল মুসা।
'হ্যাঁ।'
'দেখি তো,' মুসার হাত থেকে দূরবীনটা নিয়ে চোখে লাগাল রবিন। 'এদিকে এসে লুকিয়ে আছে ব্যাটা, আর আমরা খুঁজে মরছি অন্যখানে।'
'একটা কথা বুঝলাম না,' কিশোর বলল, 'গাড়িটা যদি চুরিই করে থাকে সে, শহরের মধ্যে ঢুকল কোন সাহসে? শেট রোডে ঢুকে আবার মোড় নিয়ে চলেই বা এল কেন?···রবিন, গাড়িটার নম্বর টুকে রাখো। আমি দেখে আসি।'
মোটর সাইকেল থেকে নেমে হোটেলে গিয়ে ঢুকল সে। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে জানাল, 'ক্লার্ক বলল ওর নাম মারটিন স্পাইক নয়, ব্রিক ওয়াটার। দুই হপ্তা ধরে আছে এই হোটেলে। প্রতিদিন রাতে এ সময় হোটেলে ফেরে।'
'দুই হপ্তা ধরেই কোস্ট রোডে গাড়ি চুরি শুরু হয়েছে!' রবিন বলল।
'এই টেকোটাই চোর!' মুসা বলল।
পুলিশকে জানানোর জন্যে থানায় রওনা হলো ওরা। রবিনকে মোটর সাইকেলের কাছে রেখে ভেতরে ঢুকল কিশোর আর মুসা। ফিরে এল হতাশ হয়ে।
'গাড়ি একটা চুরি হয়েছে আজ রাতে,' কিশোর বলল, 'তবে স্পাইক যেটা চালিয়েছে সেটা নয়।'
'এখনও অনেক রাত বাকি,' রবিন বলল।

'লাভ নেই। আজ রাতে আর আসবে না চোর।'

অহেতুক রাত জাগার কোন মানে নেই। শেট রোডে জিনিসপত্র ফেলে এসেছে ওরা সেগুলো গিয়ে নিয়ে এল

পরদিন সকালে ওয়াটারফ্রন্ট হোটেলের সামনে এসে বসে রইল তিনজনে। নজর রাখল দরজার দিকে একটু পরেই বেরিয়ে এল স্পাইক। পরনে আর্মি স্যারপ্লাস ট্রাউজার, বুট, গায়ে সামার জ্যাকেট বাঁ হাতে একটা ছড়ি

'খোঁড়াচ্ছে না কিন্তু,' কিশোর বলল। 'হাতে ছড়িটা কেন?'

কালো স্যালুন গাড়িটাতে চেপে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এল সে। পিছু নিল তিন গোয়েন্দা। দুই ব্লক দূরে একটা রঙের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল স্যালুন। গাড়ি থেকে নেমে দোকানে ঢুকল স্পাইক। বেরিয়ে এল দুই টিন রঙ নিয়ে। গাড়ির বুটে রেখে আবার ঢুকল। আবার বেরোল। এ রকম করে মোট বিশ গ্যালন রঙ এনে গাড়িতে রাখল সে।

'খাইছে!' মুসা বলল, 'এত রঙ দিয়ে কি করবে?'

'তুমি ভাবছ চোরাই গাড়িগুলোর রঙ বদলে দেবে? দিতে পারে। অসম্ভব না...'

বুটের ঢাকনা লাগিয়ে ফিরে তাকাল স্পাইক।

চমকে গেল রবিন। 'আমরা যে পিছু নিয়েছি জেনে গেল নাকি?'

'আচরণে তো বোঝা যাচ্ছে না,' কিশোর বলল।

মোড়ের একটা টেলিফোন বুদে গিয়ে ঢুকল স্পাইক। ডায়াল করল। কথা বলল। ফিরে এসে গাড়িতে উঠে রকি বীচের ব্যস্ত একটা সড়কের দিকে এগিয়ে গেল। সেটা থেকে মোড় নিল দক্ষিণে।

'আবার কোস্ট রোডে যাবে মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল।

মহাসড়কে উঠে গতি বাড়িয়ে দিল স্পাইক।

অনুসরণ করে চলল তিন গোয়েন্দা। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ বাঁয়ের চারণভূমি থেকে হুড়মুড়িয়ে রাস্তায় উঠে এল একপাল গরু। রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে পার হতে লাগল।

'হেট! হেট! সর!' বলে অনেক চেঁচামেচি করল মুসা, সরাতে পারল না গরুগুলোকে। সামনে বাঁক। একপাশে খানিকটা উঁচু জায়গা, টিলামত হয়ে আছে। ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল স্পাইকের গাড়িটাকে

গরুর পালের পেছন পেছন রাস্তায় উঠে এল গরুর মালিক কৃষক। ওকে চেনে কিশোর আর রবিন। সেই বেঁটে, সাদা-চুল লোকটা। হপ্তাখানেক আগে ওরা হনির গাড়ির পিছু নিলে ট্রাক নিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছিল এই একই লোক। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে সে হেসে বলল, 'বেড়াতে বেরিয়েছ?'

রেগেমেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, লোকটার হাসি ওর মুখ বন্ধ করে দিল।

গরুগুলোকে নিয়ে টিলাটার দিকে চলে গেল লোকটা।

গরুগুলো রাস্তা থেকে সরে গেলে আবার মোটর সাইকেল ছোটাল

ওরা। বাঁকের অন্যপাশে এসে স্পাইকের গাড়িটা দেখল না। সামনে আরও কয়েক মাইল এগিয়ে দেখে এল। বৃথা চেষ্টা। পেল না স্যালুনটাকে।

রাস্তার পাশে মোটর সাইকেল দাঁড় করাল মুসা। হতাশার সুরে বলল, 'গেল ফসকে!'

'যাক,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'কবার যাবে? ওর হোটেল চিনে গেছি আমরা। পরের বার আরও সাবধান থাকব।'

'এবারও কিন্তু অসাবধান ছিলাম না আমরা,' রবিন বলল। 'সর্বনাশটা তো করল গরুগুলো। রাস্তায় ওঠার আর সময় পেল না! আমার কি মনে হয়, জানো? লোকটা ইচ্ছে করে সময়মত গরুগুলোকে রাস্তায় তুলে দিয়েছে। সেদিনও আমরা হনির গাড়ির পিছু নিলে আমাদের বাধা দিয়েছিল সে। ট্রাক নিয়ে উঠে এসেছিল রাস্তায়। এই জায়গাটাতেই। স্পাইকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ওর।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'ঠিক বলেছ! খোঁজ নিতে হয়। চলো।'

গরুগুলো যেখানে রাস্তা পার হয়েছিল, সেখানে এসে মোটর সাইকেল থামাল ওরা। কাছেই একটা কেবিন দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল। কেবিনের দরজায় টোকা দিতে বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধা। নিজেদের পরিচয় আর সাদা চুলওয়ালা লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'খানিক আগে একপাল গরু নিয়ে ওদিকে গেল। ওকে চেনেন?'

'চিনব না কেন? আর্ল উইন্ডসর। ওর খামার আছে। থাকলে হবে কি? কেউ কোন জিনিস কিনতে চায় না ওর কাছ থেকে। ঠকায়। একবার পাঁচ কেজি টমেটো চেয়েছিলাম। দিয়ে গেল, অর্ধেক পচা। আর কোন জিনিস দিতে বলি না ওকে।'

আর্ল উইন্ডসর। নামটা চেনা চেনা লাগল কিশোরের। আগে কোথাও শুনেছে।

মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে মোটর সাইকেলের কাছে ফিরে এল ওরা।

কিশোর বলল, 'আজ রাতে ওর খামারে হানা দেব।'

'শেট রোডে পাহারা দিতে যাবে না?' রবিনের প্রশ্ন।

'যাওয়া তো দরকার। টমের সাহায্য নিতে হবে। বাড়ি গিয়েই ফোন করব ওকে।'

বাড়ি ফিরে শুধু টমকে নয়, ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকেও ফোন করল কিশোর। রঙের চলটাগুলোর কথা জিজ্ঞেস করল।

ক্যাপ্টেন জানালেন, ল্যাবরেটরি টেস্ট করা হয়েছে ওগুলোর। গাড়ির গা থেকেই খসে পড়েছে। ওগুলো যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানে গিয়ে খুঁজে এসেছে পুলিশ। ওদের ধারণা, চাকার দাগও চোরাই গাড়িটারই। তবে নতুন আর কোন সূত্র পায়নি পুলিশ।

'সংঘর্ষের শব্দটা কিসের, বোঝা গেছে?'

'না।'

স্পাইককে পাওয়া গেছে, জানাল কিশোর। ওর পিছু নিয়ে যাওয়ার সময় পথে যা ঘটেছে, সেটাও বলল।

'তাই নাকি? আশ্চর্য!'

'কি আশ্চর্য!'

'ওই লোকটা। যে তোমাদের পথ আটকাল। কোস্ট রোডে প্রথম যার গাড়ি চুরি হয়েছে, তার নাম জানো?'

মনে করার চেষ্টা করল কিশোর। উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আর্ল উইন্ডসর!'

'হ্যাঁ, আর্ল উইন্ডসর। ঠিক আছে, রাখলাম। নতুন কিছু জানতে পারলে জানিয়ো,' লাইন কেটে দিলেন ক্যাপ্টেন।

দুপুরের পর আবার বেরোল তিন গোয়েন্দা। রেড রিভারের ধারে ব্ল্যাক উইলো খোঁজার জন্যে। একটা গ্র্যানিটের চাঙড়ের কাছে দেখা গেল কতগুলো উইলো গাছ জন্মে আছে।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। মাটি খোঁড়ার চিহ্ন দেখা গেল। তাজা পায়ের ছাপ আছে। 'কেউ এসে খুঁজে গেছে এখানে।'

পাথরটা অনেক পুরানো। ঝড়ের সময় পুরো একটা পরিবার আশ্রয় নেয়ার মত জায়গা দেখা গেল না পাথর কিংবা গাছগুলোর আশেপাশে।

ঘড়ি দেখল কিশোর। মোটে বাজে তিনটে। এখনও অনেক বেলা। আপাতত আর কোন কাজ নেই। বলল, 'চলো, এখনই ঢুঁ মেরে আসি আর্লের ফার্মে।'

কোস্ট রোডের বাঁকে যে টিলার কাছে স্পাইকের গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছিল, সেখানে হাইওয়ে থেকে একটা কাঁচা রাস্তা নেমে গেছে। আর্লের ট্রাক উঠেছিল সেদিন এই রাস্তা থেকেই।

রাস্তার ধারে মোটর সাইকেল রেখে হেঁটে চলল তিন গোয়েন্দা। সামনে একটুকরো বন। খুব ঘন। ওটা পার হয়ে আসার পর চোখে পড়ল মাঠে কাজ করছে আর্ল। গোপনে এখন আর ওর বাড়িতে ঢোকা যাবে না। ফিরে আসতে বাধ্য হলো ওরা।

বড় রাস্তায় উঠতেই বলে উঠল মুসা, 'খাইছে!'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্য দুজনও দেখল, দুই মাইল উত্তরে একটা ঘন বার্চ গাছের জঙ্গলের মাথায় কালো ধোঁয়া উঠছে।

'দাবানল নাকি?' আবার বলল মুসা।

'চলো দেখে আসি,' কিশোর বলল। 'দাবানল হলে দমকলকে জানাতে হবে।'

মোটর সাইকেলে চেপে রওনা হলো ওরা। বনের কিনারে পৌঁছতে শুকনো লাকড়ি আর পাতা পোড়ার কড়কড় আওয়াজ কানে এল। সেই সঙ্গে মানুষের চিৎকার শুনল বলে মনে হলো মুসার।

'বনের মধ্যে বাড়িঘর আছে নাকি?' বলেই মোটর সাইকেল থেকে নেমে দৌড় দিল সে।

সাইকেল দুটো স্ট্যান্ডে তুলে রবিন আর কিশোরও ছুটল।

প্রচণ্ড গরম বাতাস বইছে। ধোঁয়া এসে ধাক্কা মারল নাকে। দম আটকে দিতে চাইল। রুমাল বের করে নাক চাপা দিল ওরা। ছুটল ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে।

ছোট একটুকরো জায়গায় গোল হয়ে আগুন লেগেছে। আগুনের একটা মালা তৈরি করে জ্বলছে গাছগুলো। মাঝখানে অচেতন হয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ।

'আরি, কারেল!' চিৎকার করে উঠল মুসা। আগুনের পরোয়া করল না। গোল জায়গাটার ভেতরে ঢোকার জন্যে দৌড় দিল সে।

তেরো

নিজের শার্টটা খুলে কারেলের নাকে পেঁচিয়ে দিল মুসা। তিনজনে মিলে বয়ে নিয়ে দৌড় দিল আগুনের ভেতর দিয়ে। ধোঁয়ার সীমানার বাইরে আসার আগে থামল না। কারেলকে শুইয়ে দিল ঘাসের ওপর। কাশতে শুরু করল তিনজনেই। নিজেদের কাপড়েও আগুন লেগে গেছে। থাপ্পড় মেরে নেভাল সেগুলো।

বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। ধোঁয়া বাড়ছে।

দমকলের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। রাস্তা থেকে দেখে কেউ নিশ্চয় ফোন করে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাইরেন আর ঘন্টা বাজিয়ে এসে হাজির হলো গাড়িগুলো। হট্টগোল শুরু হয়ে গেল বনের কিনারে।

কারেলের নাক থেকে শার্ট সরিয়ে দিল মুসা। তাজা অক্সিজেন পেয়ে জ্ঞান ফিরতে শুরু করল ওর।

কাছে এসে দাঁড়াল তিনজন পুলিশ।

চোখ মেলল কারেল।

'কি করে লাগল?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'জানি না,' জবাব দিল কিশোর।

উঠে বসল কারেল। কারা ওকে বের করে এনেছে জানতে পেরে ধন্যবাদ দিতে লাগল তিন গোয়েন্দাকে।

একজন পুলিশ অফিসার চেনে ওকে। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ক্যাম্পের আগুন থেকে লাগল নাকি?'

'না,' মাথা নাড়ল কারেল। 'বনের মধ্যে গাড়ির আওয়াজ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। পেছন থেকে কে যেন একটা ন্যাকড়া চেপে ধরল নাকেমুখে। অদ্ভুত গন্ধ! আর কিছু জানি না।'

বাঁকা চোখে কারেলের দিকে তাকাল অফিসার।

কিন্তু কিশোর আর রবিন বিশ্বাস করল ওর কথা। মনে পড়ল বোট হাউসে ওদের নাকেও ভেজা কাপড় জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, তাতে বিচিত্র গন্ধ

ছিল। ওরাও বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল।

'ইচ্ছে করে লাগানো হয়েছে এই আগুন,' কিশোর বলল। 'গোল একটা মালার মত হয়ে লেগেছে, মাঝখানে বাদ দিয়ে। আপনা-আপনি এ ভাবে লাগতে পারে না।'

আগুন নিভিয়ে ফেলল দমকল বাহিনীর কর্মীরা। তারপর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আগুন লাগার কারণ খুঁজতে শুরু করল। কোন সূত্রই পেল না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল দমকল বাহিনী। এরপর এসে পুলিশের সঙ্গে যোগ দিল বন বিভাগের লোক। তল্লাশি চালাল।

তিন গোয়েন্দাকে ওদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল কারেল। ওর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগল।

'তোমার পেছনে কে লাগল আবার?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে চাইল?'

চুপ করে কি ভাবল কারেল। তারপর বলল, 'হয়তো সেই মাকড়সাটা!'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। 'মাকড়সা!'

'বিশাল এক মাকড়সা দেখেছি আমি। মাকড়সা-মানব।'

'মাথাটাথা খারাপ হলো নাকি তোমার?'

'না, মাথা ঠিকই আছে। কাল সন্ধ্যায় সাগরের ধারে যে খাড়া পাহাড়টা আছে, ওটার কাছে গিয়েছিলাম। দেখি কি, মানুষের সমান বড় একটা মাকড়সার মত জীব হেঁটে বেড়াচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পাহাড়ের ধারে কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল ওটা, বুঝতে পারলাম না। ভয়ে পালিয়ে এলাম।'

'ভূত দেখেছ!'

'ওটা তোমাকে পুড়িয়ে মারতে চাইবে কেন?' রবিন বলল, 'কোন কারণ তো দেখি না!'

কারেলের কথা বিশ্বাস হলো না তিন গোয়েন্দার।

মুসা বলল, 'আমরা এখন যাই, কারেল। সাবধানে থেকো।'

ফেরার পথে রেকর্ডস বিল্ডিঙের সামনে থামল ওরা। মুসা বাইরে বসে রইল মোটর সাইকেলের কাছে। রবিন আর কিশোর ভেতরে ঢুকল।

একজন বৃদ্ধ ক্লার্কের কাছে গোল্ড ক্লেইমের পুরানো রেকর্ডগুলো দেখতে চাইল রবিন। এই লোকই ছুটিতে গিয়েছিল। চলে এসেছে। হেসে বলল, 'সোনা জমাতে চাও এই বয়েসেই? লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করে না নাকি?'

'করে,' রবিনও হাসল, 'সেজন্যেই তো চাইছি। আমার সাবজেক্ট ইতিহাস। রকি বীচের উত্তরে সোনা পাওয়া যাওয়ার কোন রেকর্ড আছে আপনাদের কাছে?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'না। আমার জানামতে নেই। অবাক কাণ্ড! এই খানিক আগে আরেকজন এসে একই প্রশ্ন করে গেছে। নাম জিজ্ঞেস করলাম। বলল না।'

'কি রকম দেখতে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চোখ থেকে চশমা খুলে নিল ক্লার্ক। 'বয়েস চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। কালো চুল। দাড়ি আছে। কথা শুনে উচ্চ শিক্ষিত লোক মনে হলো।'

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। ভাবছে, কে হতে পারে লোকটা? এমন কেউ যে ক্যাকটাস ক্রলারের গুপ্তধনের খবর জানে?

'কে এসেছিল, কিশোর?' রবিনের প্রশ্ন। 'স্পাইক তো অত উচ্চ শিক্ষিত নয়।'

'প্রফেসর লয়েড ক্রলার হতে পারেন,' কিশোর বলল।

সূর্য তখন ডোবে ডোবে। ওঅর্কশপে আলোচনায় বসল তিনজনে। কিশোর বলল, 'আজ রাতে বাক রোডে পাহারা দেব।'

ভুরু কোঁচকাল রবিন, 'কিন্তু শেট রোডকে তো আমরা এখনও তালিকা থেকে বাদ দিইনি!'

'দেয়া উচিত। কয়েকটা কথা ভেবে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে। চোরাই গাড়িগুলোর একদিকে রওনা হয়ে ঘুরে আরেক দিকে চলে যাওয়া, ঘটনাস্থলে ববের জিনিস পড়ে থাকা, এ সব ব্যাপার প্রমাণ করে কেউ একজন চাইছে পুলিশের দৃষ্টি অন্য দিকে পড়ুক। স্পাইককে গাড়ি দিয়ে শেট রোডে পাঠানোর উদ্দেশ্য— কেউ নজর রেখে থাকলে তার চোখ যেন ওর ওপর থাকে, ওদিকে গাড়ি চুরি করে চোর অন্য দিক দিয়ে নিরাপদে কেটে পড়তে পারে—সেটা বাক রোড দিয়েও হতে পারে।'

'হুম, ঠিকই তো বলেছ!' মাথা দুলিয়ে বলল রবিন। 'ধোঁকা! বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে চাকার দাগ দেখানো আর রঙের চটা পাইয়ে দেয়া, সব ফাঁকিবাজি। ইচ্ছে করে ওসব সূত্র রেখে গিয়েছিল, যাতে বিপথে ঘুরে মরি আমরা!'

বাড়ি ফিরেই টমকে ফোন করেছে কিশোর। ওর সাহায্য চেয়েছে। খুশি হয়ে ওদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছে টম। সময়মত চলে এল।

দুটো মোটর সাইকেলে করে বেরিয়ে পড়ল চারজনে। কোস্ট রোড ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর টম আর রবিন চলে গেল বাক রোড পাহারা দিতে। কিশোর আর মুসা বাঁকের কাছের রাস্তাটা দিয়ে নেমে আর্লের ফার্মের দিকে চলল। কিছুদূর এগিয়ে বনের মধ্যে মোটর সাইকেল লুকিয়ে রেখে হেঁটে এগোল।

মেঘের ভেতর লুকোচুরি খেলছে চাঁদ। এই আলো, এই অন্ধকার। মাঠের ওপর দিয়ে এগোল দুজনে। চাঁদের আলোকে ঘোলাটে করে দিয়েছে হালকা কুয়াশা। বাতাসও কনকনে ঠাণ্ডা।

বাড়িটা দেখা গেল। কাছাকাছি লুকানোর কোন জায়গা নেই। ঝোপঝাড়, গাছের জটলা, কিচ্ছু নেই। চষা মাঠ। ঢেউয়ের মত উঁচুনিচু হয়ে আছে মাটি। ওরকম দুটো ঢেউয়ের খাঁজে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

জমিতে কাঠের বেড়া দেয়া। বেড়ার কাছে গিয়ে স্লিপিং ব্যাগ খুলল ওরা।

ঠাণ্ডার মধ্যে কষ্ট না করে তাতে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে। কিশোরের হাতে দূরবীন। মাঝে মাঝে চোখে লাগিয়ে দেখছে।

ধীরে ধীরে কাটতে লাগল সময়। থেকে থেকে ডেকে উঠছে একজাতের নিশাচর পাখি। আর কোন শব্দ নেই।

এক ঘন্টা পর একটা কালো স্যালুন রাস্তা দিয়ে নেমে এসে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। দূরবীন দিয়ে দেখে বলল কিশোর, 'স্পাইক! ঠিকই আন্দাজ করেছি। আর্লের সঙ্গে খাতির আছে ওর।'

কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার গাড়ি নিয়ে চলে গেল স্পাইক।

বারান্দায় বেরিয়ে এল আর্ল। খেতের দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। ভাগ্যিস এই সময় মেঘের আড়ালে চলে গেল চাঁদ। নইলে দুই গোয়েন্দা চোখে পড়ে যেত। বারান্দা থেকে নেমে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল সে।

হঠাৎ স্টার্ট নিল একটা এঞ্জিন। বিশাল এক ট্রাক্টর চলতে আরম্ভ করল।

'খাইছে! রাতের বেলা চাষ দেবে নাকি?' স্লীপিং ব্যাগে যতটা সম্ভব ঢুকে গেল মুসা।

এগিয়ে আসছে ট্রাক্টর। হেডলাইট জ্বালছে না আর্ল। হয়তো চাঁদের আলোতে দেখতে পাচ্ছে বলে জ্বালার প্রয়োজন মনে করছে না।

'এদিকেই আসছে!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'গায়ের ওপর দিয়েই চালিয়ে দেবে না তো!'

'তেমন বুঝলে বেরিয়ে দৌড় দেব। ব্লেডে কেটে মরার চেয়ে ধরা পড়া ভাল!'

এই সময় মেঘের আড়ালে চলে গেল চাঁদ।

চোদ্দ

এগিয়ে এল ট্রাক্টর।

দৌড় না দিয়ে আর উপায় নেই। কিন্তু স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরোতে গিয়ে বেরোতে পারল না কিশোর। ককিয়ে উঠল, 'আমার জিপার আটকে গেছে!'

আর্ল দেখবে কিনা সেই পরোয়া আর করল না মুসা। ঠেলা মেরে ব্যাগের ভেতর থেকে অর্ধেক বের করে ফেলল শরীর। হ্যাঁচকা টান দিয়ে কিশোরের জিপার খোলার চেষ্টা করল।

পারল না।

এসে গেছে ট্রাক্টর।

আর কোন উপায় না দেখে ব্যাগসহ কিশোরকে জড়িয়ে ধরে এক ঝটকায় নিয়ে এসে ফেলল নিজের বুকের ওপর। ওদের দু'তিন ইঞ্চি দূর দিয়ে বেরিয়ে

গেল মারাত্মক ব্লেডগুলো।

এগিয়ে যাচ্ছে ট্রাক্টর। ফিরল না। ধীরে ধীরে কমে আসছে এঞ্জিনের শব্দ। হাইওয়ের দিকে তাকাতে মুসার চোখে পড়ল, একটা ট্রাক চলে যাচ্ছে রকি বীচের দিকে।

'বাঁচলাম!' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

'হ্যাঁ, তবে বেশিক্ষণ না। আর্ল আবার ফিরে আসার আগেই পালাতে হবে।'

জিপার খুলে কিশোরকে বেরোতে সাহায্য করল মুসা। দুজনে উঠে মাথা নিচু করে দৌড় দিল বনটার দিকে। খেতের অন্য প্রান্তে গিয়ে ট্রাক্টর ঘোরাচ্ছে আর্ল।

বনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। একটা অদ্ভুত কাণ্ড করতে দেখল লোকটাকে। ট্রাক্টর ঘুরিয়ে ওরা যেখানে ছিল সেখানে ফিরে গেল না সে। মোড় নিয়ে এগোল হাইওয়ের কাছের উঁচু বালির ঢিবিটার দিকে। হেডলাইট জ্বালল না। ওখানে গিয়ে মাটি কাটতে লাগল। বিশ মিনিট পর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে, লাফিয়ে নেমে হেঁটে চলে গেল বাড়ির দিকে।

'এ সব কি?' বুঝতে পারছে না মুসা। 'আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে করল নাকি?'

'কি জানি! এখন তো মনে হচ্ছে, আমাদের দেখেইনি। চাঁদ মেঘের আড়ালে চলে গিয়েছিল বলে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।'

'চলে যাব, না থাকব?'

'থাকব।'

বাকি রাতটা পালা করে পাহারা দিয়ে কাটাল ওরা। আর কিছু ঘটল না। ভোরে রওনা হলো বাক রোডে, রবিন আর টম কি করছে দেখার জন্যে।

কিছুই ঘটেনি বাক রোডে।

'রেডিওতে চুরির খবর বলেছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'না,' টম জানাল।

বাড়ি ফিরে চলল ওরা।

রকি বীচে ঢুকতে যাবে এই সময় কিশোরের রেডিও জানাল চুরির খবর: ডিয়ারভিলের সেভেনথ রোড থেকে একটা গাড়ি চুরি হয়েছিল, তবে বেশিদূর নিতে পারেনি। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে শহরের কিনারে সেটা ফেলে গেছে চোর। গাড়ির মালিককে গ্যাস দিয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গাড়িটা। গাড়ির মধ্যে একটা হাতঘড়ি পাওয়া গেছে। ওটার মালিক বব ক্রলার।

মোটর সাইকেল থামিয়ে খবরটা শুনল চারজনেই।

রবিন বলল, 'এই প্রথম একটা গাড়ি হজম করতে পারল না চোর।'

'একটা ব্যাপারে শিওর হলাম,' কিশোর বলল, 'কারেল আর আমাদেরকে গ্যাস দিয়ে অজ্ঞান করেছিল গাড়ি চোরেরাই। বাক রোডের শেষ মাথায় ডিয়ারভিল শহর। ববের নাম করে আমাদের কাছে যে ভুয়া চিঠিটা

এসেছে, সেটাতেও ডিয়ারভিলের ঠিকানা দিয়েছে।'

মুসা বলল, 'চলো গিয়ে স্পাইককে চেপে ধরি। অনেক জ্বালিয়েছে। এবার ওর মুখ থেকে কিছু কথা বের করা দরকার।'

কিন্তু ওয়াটারফ্রন্ট হোটেলে এসে পাওয়া গেল না তাকে। ক্লার্ক জানাল সকাল বেলাই হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

ডিয়ারভিলের হোটেলগুলোতে তাকে খোঁজার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর টম বলল, সে আর যেতে পারছে না। তার কাজ আছে।

বাড়ি আর ফিরল না তিন গোয়েন্দা। একটা স্ন্যাকবারের সামনে থেমে আগে নাস্তা সেরে নিল দোকান থেকে বেরিয়ে মোটর সাইকেল স্টার্ট দিতে যাবে, এই সময় এগিয়ে এল একজন মাঝ বয়েসী লোক।

'তোমরা তিন গোয়েন্দা?' ভারি গলায় জিজ্ঞেস করল সে

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'হপ্তাখানেক আগে আমার গাড়ি চুরি হয়েছে!' ধমকের সুরে বলল লোকটা। 'তোমরা জামানত দিয়ে চোরকে হাজত থেকে এনে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছ। আমার গাড়ি যদি পাওয়া না যায়, তোমাদের ছাড়ব না আমি। মনে রেখো।'

ওদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গটমট করে চলে গেল লোকটা।

মুখ কালো হয়ে গেছে কিশোরের। 'সবাই আমাদের ভুল বুঝছে! ক্রলারদেরই চোর ভাবছে ওরা।'

'আসল চোরকে ধরতে পারলেই,' রাগ করে বলল মুসা, 'মুখে চুনকালি পড়বে এই গাড়িওয়ালাগুলোর। যত্তসব ছাগলের দল! কিচ্ছু বোঝে না!'

লোকটা চলে যেতেই হাসিমুখে এগিয়ে এল আরেকজন। সে-ই চিনিয়ে দিয়েছে তিন গোয়েন্দাকে। একটা সাইনবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল এতক্ষণ। লোকটার সব কথা শুনেছে। খিকখিক করে হেসে বলল, 'আহ্, কপাল! এই ভোরবেলাতেই শার্লকের গুষ্ঠির দেখা! তা কি বলল লোকটা? কান মুচড়ে দিতে চাইছিল নাকি?'

টেরিয়ার ডয়েল! রাগে পিত্তি জ্বলে গেল মুসার। কল্পনাই করেনি এ সময় ওকে দেখতে পাবে এখানে। 'কার কান? তোমার?'

হাসি উধাও হয়ে গেল টেরির মুখ থেকে। পলকের জন্যে। পরক্ষণেই ফিরে এল আবার। 'তা এত ভোরে কি মনে করে? গাড়ি-চোর দোস্তদের সঙ্গে রাত কাটালে নাকি?'

'তুমিই বা এত ভোরে কি মনে করে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'আমি যে জন্যে বেরিয়েছি, সেটা তোমাদের ধারণার বাইরে। একটা চোরাই গাড়ির খোঁজ পেয়েছি। আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। নজর রাখছি।'

'কার কাছে খোঁজ পেলে?' মুখ বাঁকাল মুসা। 'শুঁটকি খেতে আসা কাকের কাছে?'

বাঁকা কথা সহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা টেরির। হাসিমুখে বলল, 'কাক নয়, টিকটিকি। তবে তোমাদের মত হাঁদা নয়, লেজটা আরেকটু লম্বা,

আরেকটু চালাক।'

'তা তোমার চোর মহাশয়টি কে?' জানতে চাইল রবিন।

'এলেই দেখবে। মেয়েমানুষ। সোনালি চুল। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাঁউরুটি-মাখন কিনতে আসার কথা,' চোর ধরার উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে টেরি।

কৌতূহল হলো তিন গোয়েন্দার। কি ঘটে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

পাঁচ মিনিট পর পথের মোড়ে দেখা গেল একটা বাদামী গাড়ি। নতুন। ঘ্যাঁচ করে এসে ব্রেক কষল স্ন্যাকবারের সামনে। গাড়ি থেকে নামল একজন মহিলা। সোনালি চুল। দোকানের দিকে এগোল।

তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে হাসল টেরি। এগিয়ে গেল মহিলার দিকে।

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেছে মুসার। 'শুঁটকি এবার মরল!'

মহিলাকে চেনে সে। একজন পুলিশ অফিসারের স্ত্রী।

মহিলার সামনে গিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল টেরি। গম্ভীর স্বরে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'আপনাকে থানায় যেতে হবে।'

'কেন?'

'গাড়ি চুরি করার অপরাধে। ওই গাড়িটা চুরি করেছেন। রিপোর্ট এসেছে আমার কাছে। গোলমাল করবেন না। তাহলে পুলিশ ডাকব।'

ভুরু কুঁচকে গেল মহিলার। এক মুহূর্ত টেরির চোখে চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর ঠাস করে চড় মারল।

গালে হাত চেপে ধরে চিৎকার শুরু করল টেরি, 'চুরি তো চুরি, আবার সিনাজুরি! দেখাচ্ছি মজা!' হাত নেড়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুলিশম্যানকে ডাকল।

দৌড়ে এল পুলিশম্যান। মহিলার দিকে তাকিয়ে বদলে গেল চাহনি। সেও চিনতে পেরেছে। 'কি হয়েছে, ম্যাডাম?'

'এই ছেলেটা আমাকে অপমান করেছে। বলছে, আমি নাকি গাড়ি চোর।'

খপ করে টেরির হাত চেপে ধরল পুলিশম্যান। টানতে টানতে নিয়ে চলল পুলিশের গাড়ির দিকে।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে টেরি। কি ঘটতে কি ঘটল, কিছুই মাথায় ঢুকছে না তার।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

আর কিছু দেখার নেই। মোটর সাইকেল স্টার্ট দিল ওরা।

সারা পথে থেকে থেকেই হাসতে লাগল। বিশেষ করে মুসা। টেরির কথা মনে হলেই হাসা শুরু করে। সংক্রমিত হয় অন্য দুজনের মাঝে।

আর্লের খামার পার হয়ে মোড় নিয়ে বাক রোডে পড়ল। মোড়ের কাছে থামল কিশোর। 'সব কিছু এসে আস্তে আস্তে এই রাস্তাটায় সীমাবদ্ধ হচ্ছে।

ম্যাপ বলছে, আর্লের জায়গার সীমানা শেষ হয়েছে বাক রোডের কাছে।'

খোলা মাঠের কিনারে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। হাতে একটা ছড়ি।

'স্পাইক!' বলে উঠল রবিন।

'চলো, কথা বলব,' মোটর সাইকেল থেকে নামল কিশোর।

রাস্তা থেকে নেমে মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে চলল তিনজনে। পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল স্পাইক।

'মিস্টার ওয়াটার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাতের আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছল লোকটা। 'তাতে কি?'

'যদ্দূর মনে হয় আপনি ক্রলারদের ওখানে চাকরি করেছিলেন। তখন আপনার নাম ছিল মারলিন স্পাইক।'

'তাতেই বা কি?' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল লোকটার।

'ভাবলাম, মিস্টার ক্রলার আর তাঁর ছেলে ববের খোঁজ পাওয়া যাবে আপনার কাছে,' নিরীহ স্বরে বলল কিশোর।

'ভাবার কোন কারণ নেই,' স্পাইকের ঠোঁটে কঠিন হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'গাড়ি চোরদের খোঁজ আমি রাখতে যাব কেন? ওখানে এখন কাজ করি না আমি।'

'কি কাজ করেন? গাড়ি চুরি?' মুখ ফসকে বলে ফেলল মুসা।

আগুন ঝিলিক দিল স্পাইকের ঠোঁটে। হাতের ছড়িটা ঝাড়া দিল। মাথা থেকে বেরিয়ে এল লম্বা, চোখা একটা ফলা। মুসার চোখের ইঞ্চিখানেক দূরে এসে থামল মাথাটা। সাপের মত হিসিয়ে উঠল লোকটা, 'বেরোও! নইলে কানা করে দেব!'

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

আপতত এই তলোয়ারের বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছে নেই কিশোরের। দুই সহকারীকে সরে আসতে ইশারা করে ঘুরে মোটর সাইকেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। রাস্তায় উঠে ফিরে দেখল, তখনও তাকিয়ে আছে স্পাইক।

'যাক, আরেকটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল,' হেসে বলল কিশোর। 'ওই ছড়ি দিয়ে গাড়ির টায়ার ফুটো করে স্পাইক। যাতে অন্য কোন গাড়ি ওর পিছু নিতে না পারে।'

'হেরিং বীচে গাড়ি চুরির সময় যেমন করেছিল,' মনে পড়ল রবিনের।

ডিয়ারভিলে পৌঁছে আগে লাঞ্চ সেরে নিল। তারপর একটা ড্রাগস্টোর থেকে শহরের একটা ম্যাপ কিনল কিশোর। স্পাইককে দেখে এসেছে বটে, কিন্তু সে কোথায় উঠেছে জানা নেই। তাই হোটেলগুলোতে খুঁজতে শুরু করল। একটা হোটেলের ডেস্ক ক্লার্ক চিনতে পারল ছবিটা। বলল, সেদিন সকালেই উঠেছে। রেজিস্টারে নাম লিখেছে ব্রিক ওয়াটার। জিনিসপত্র রেখে গেছে। বেরোনোর আগে ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করেছে টেলিগ্রাফ অফিসটা কোনদিকে।

অফিসটা ব্লকখানেক দূরে। ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। টাইপ রাইটারে খটাখট করছে এক মহিলা। স্পাইকের ছবি সেও চিনতে পারল। বলল, একটা মেসেজ পাঠাতে এসেছিল এই লোক। তবে কি লিখেছে, জানাতে অস্বীকার করল। কারও মেসেজের কথা অন্য কাউকে জানানো নিষেধ।

সরে এল কিশোর। রবিন আর মুসাকে শুনিয়ে নিচু স্বরে বিড়বিড় করল, 'টেলিগ্রাম পাঠানোর আগে অনেকেই একটা খসড়া করে নেয়।' বলতে বলতে চোখ পড়ল একটা ওয়েস্টবাস্কেটের ওপর। অল্প কয়েকটা কাগজ পড়ে আছে। হলুদ কাগজের আধখানা টুকরো বের করতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না ওর। নিচে স্পাইকের নাম সই করা। বাকি অর্ধেকটাও খুঁজে বের করল। দুটো টুকরো একসঙ্গে করতেই পেয়ে গেল মেসেজের খসড়া:

আরও নার্ভ দরকার। সিলিণ্ডার জমানোর চেষ্টা করছি। দুই বন্ধুর যত্ন নেবেন। কাজ শেষ করে হপ্তাখানেকের মধ্যেই ওদের ব্যবস্থা করব। আগামী কাল শিপমেন্ট। আপনাকে আশা করছি।

এম. এল.

এম. এল. মানে যে মারলিন স্পাইক, বলে দিতে হলো না কিশোরকে। পাঠানো হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেসে, লুথার বারনারডির ঠিকানায়।

'লুথার বারনারডি!' চোখের পাতা সরু হয়ে এল রবিনের। 'কিশোর, সেই এল. বি. নয় তো? আমাদের সঙ্গে যে দেখা করতে গিয়েছিল?'

'অসম্ভব না। গাড়ি চোরের সঙ্গে যে স্পাইকের যোগাযোগ আছে, আরও শিওর হলাম,' কিশোর বলল। 'দুই বন্ধু বলে বোধহয় মিস্টার ক্রলার আর ববকে বুঝিয়েছে। বলছে, হপ্তাখানেক পর কাজ শেষ করে ওদের ব্যবস্থা করবে। মেরেও ফেলতে পারে। ওদের বাঁচাতে হলে আরও তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে আমাদের!'

'কি শিপমেন্ট করবে, কোনখান থেকে, জানতে পারলে কাজ হত,' রবিন বলল।

ডিয়ারভিলে আর করার কিছু নেই। বাড়ি রওনা হলো ওরা।

রাতে ঘুমাতে পারেনি। বাড়ি ফিরে তিনজনেই দিল ঘুম।

বিকেলে উঠে গোসল সেরে, কাপড় পরে নিচে নামল কিশোর। কয়েক মিনিট পরেই মুসা আর রবিন এসে হাজির হলো। আবার ডিউটি দিতে বেরোবে রাতে।

রাতের খাওয়া বিকেলেই সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। বাক রোডের মোড়ে যখন পৌঁছল সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে। ডুবতে দেরি নেই।

একটা গাড়িও দেখা গেল না বাক রোডে।

'এখনও সময় আছে,' কিশোর বলল। 'চলো, সাগরের হাওয়া খেয়ে আসি।'

'চলো,' মুসা বলল।

কোস্ট রোড ধরে কিছুদূর এগোতে ডানে একটা পাহাড় দেখা গেল। তার ওপাশে সাগর। চূড়ার কাছ থেকে খাড়া হয়ে পানিতে নেমে গেছে পাহাড়ের দেয়াল। ঝোপঝাড় আছে প্রচুর।

মোটর সাইকেল থামাল রবিন আর কিশোর।

চূড়ার দিকে চোখ পড়তে চমকে গেল মুসা। 'খাইছে! ওটা কি?'

ফিরে তাকাল অন্য দুজন। অদ্ভুত জিনিসটা ওদেরও চোখে পড়ল। বিশাল মাকড়সার মত একটা জীব ধীরে ধীরে চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে।

আরও কাছে থেকে দেখার জন্যে দৌড় দিল তিনজনে। সামনে একটা পাথর দৃষ্টি আটকে দিল ওদের। ওটার পাশ কাটিয়ে অন্যপাশে এসে আবার তাকাল চূড়ার দিকে।

অদৃশ্য হয়েছে আজব প্রাণীটা। গোধূলির আবছা আলোয় কিছুই নড়তে দেখা গেল না আর পাহাড়ের ওপরে।

'শিওর, এটাকেই দেখেছিল কারেন!' ফিসফিস করে বলল মুসা। জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে।

'তখন বিশ্বাস করিনি ওর কথা!' বলল রবিন। 'জিনিসটা কি, বলো তো?'

'আধা-মাকড়সা আধা-মানব!' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। 'গেল কোথায় দেখতে পারলে হত।'

কিন্তু উপায় নেই। অন্ধকার হয়ে গেছে।

পনেরো

'মারলিন স্পাইক, আর্ল উইন্ডসর, লুথার বারনারডি এবং রহস্যময় এক মাকড়সা-মানব,' কিশোর বলল, 'আমাদের সন্দেহের তালিকায় এখন এই চারজন। পুরো ব্যাপারটাই এক জটিল ধাঁধা। কিছু কিছু প্রশ্নের জবাব অবশ্য পেয়ে গেছি। বাকিগুলো মেলাতে পারলেই...'

ঝোপের মধ্যে বসে কথা বলছে ওরা। একই সঙ্গে নজর রেখেছে বাক রোডের ওপর।

'স্পাইক যে বলল শিপমেন্টের কথা,' রবিন বলল, 'কি শিপমেন্ট, কোনখান থেকে করা হবে, জানা গেলে সুবিধে হত। আমার ধারণা, মালগুলো সব চোরাই গাড়ি।'

'গাড়ি বন্দরে নেবে কি করে?' মুসার প্রশ্ন। 'ট্রাকে করে?'

ঝট করে ওর দিকে ফিরল কিশোর। 'কি বললে?'

'ট্রাক। সিনেমায় দেখেছি ট্রাকে করে চোরাই গাড়ি পাচার করতে। ওগুলো অবশ্য অনেক বড় ট্রাক। পেছনটা ঢাকা থাকে। আর্লের ট্রাকটাও নেহায়েত ছোট নয়। পেছনে ঢাকা। দুটো গাড়ি তো ধরবেই। কাল রাতে যখন ট্রাক্টর দিয়ে মাটি কাটছে আর্ল, তার খানিক পর একটা ট্রাককে রকি

বীচের দিকে যেতে দেখেছি। ওটারও পেছন ঢাকা।'

'পয়েন্টটা কিন্তু ভালই বের করেছ। হনির গাড়ি-চোরকে সেদিন যখন ধাওয়া করলাম, হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেল ওটা। ওই সময় আর্লের ট্রাকটা আমাদের পথ আটকে দিয়েছিল। আমরা মোড়ের অন্যপাশে থাকতে থাকতে গাড়িটা ট্রাকে তুলে ফেলা সম্ভব।'

'যদি ট্রাকের পেছনে এমন কোন ব্যবস্থা থাকে, যেটা বেয়ে ওপরে উঠে যেতে পারে গাড়ি।'

'ঠিক! কাল সকালে গিয়েই আগে ক্যাপ্টেন ফ্লেচারকে জানাতে হবে।'

'ভালই কিন্তু এগোচ্ছি আমরা,' হেসে বলল রবিন। 'আরেকটা প্রশ্ন। ডিয়ারভিলে গাড়িটা চুরি করেও নিয়ে পালাল না কেন চোর?'

'পুলিশের তাড়া খেয়ে,' মুসা বলল।

'সত্যি কি তাড়া খেয়ে?' কিশোর বলল, 'বহুবার ওরকম তাড়া খেয়েছে ওই চোর। একবারও গাড়ি রেখে যায়নি। কোন না কোনভাবে পালিয়ে গেছেই। আমার বিশ্বাস, ইচ্ছে করেই করেছে কাজটা। গাড়ি চুরি করে পুলিশের সামনে দিয়ে গেছে, যাতে ওরা তাড়া করে। ওদের সামনে গাড়িটা ফেলে পালিয়ে গেছে। গাড়িতে ফেলে গেছে ববের হাতঘড়ি। সব সাজানো ব্যাপার মনে হচ্ছে। ববের চিঠিতে ডিয়ারভিলের পোস্টমার্ক, বাক রোডে বনের মধ্যে চাকার দাগ, রঙের চটা, এমনকি স্পাইকের হোটেল ছাড়াটাও সাজানো। নইলে যদি গা ঢাকাই দিতে চাইবে, আর্লের ফার্মে ওরকম খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? একেবারে যেন আমাদের দেখানোর জন্যেই দাঁড়িয়েছিল। ডিয়ারভিলেও ওকে খুঁজে বের করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না। সব সাজানো, বুঝলে। কোস্ট রোড থেকে আমাদের আর পুলিশের নজর অন্য দিকে সরানোর জন্যে এ কাজ করেছে।'

মুসা আর রবিনের কাছেও যুক্তিসঙ্গত মনে হলো কথাগুলো।

সারারাত পালা করে পাহারা দিল ওরা। কিছু ঘটল না। ভোর হলো। সূর্য উঠতে তখনও দেরি আছে। আবছা অন্ধকার। এখন আর কিছু ঘটবে না। ঠাণ্ডার মধ্যে অহেতুক বসে থেকে লাভ নেই। বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।

কিশোরের মোটর সাইকেলের পেছনে বসেছে মুসা। ববদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বলে উঠল, 'রাখো তো! দোতলায় কাকে যেন নড়তে দেখলাম!'

ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। রবিনও দাঁড়াল তার পেছনে।

দোতলার জানালায় পর্দা টানা। কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে, বোঝা গেল।

কে ঢুকল? চোর? নাকি ববেরা ফিরে এসেছে?

রাস্তার ওপরই মোটর সাইকেল রেখে পা টিপে টিপে এগোল তিনজনে। বাড়ির কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'তোমরা বাইরে থাকো। আমার সাড়া পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে কিনা দেখবে।'

সদর দরজার পাল্লা ভেজানো। ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল সে। যে ঘরটাতে আলো দেখা গেছে, সে-ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে উঁকি দিয়ে লোকটাকে দেখতে পেল সে। এদিকে পেছন করে একটা কেবিনেটের মধ্যে কি যেন খুঁজছে।

ভেতরে ঢুকল কিশোর। 'কে আপনি?'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। আস্তে আস্তে ঢিল হয়ে এল শরীর। হাসি ফুটল মুখে। 'তুমি কি কিশোর পাশা?'

'হ্যাঁ। আপনি কে?'

'লয়েড ক্রুলার।'

'ববের চাচা? প্রফেসর ক্রুলার!'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'এই লুকোচুরি খেলার জন্যে দুঃখিত।'

'মানে?'

'তোমার বন্ধুরা কোথায়? একা এসেছ?'

'না। ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'ডাকো। সবার সামনেই বলি।'

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিচে দাঁড়ানো মুসা আর রবিনকে ডাক দিল কিশোর। ওপরে আসতে বলল।

লম্বা, মাঝবয়েসী মানুষটাকে দেখল ওরাও। প্রফেসরের ছবি দেখেছে। সুতরাং ইনিই যে প্রফেসর লয়েড, সন্দেহের অবকাশ নেই।

সবাই বসল। প্রফেসর বললেন, 'যখন শুনলাম, আমার ভাই আর ভাতিজাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, বুঝলাম, কেউ একজন ফাঁসিয়েছে ওদের। সন্দেহ হলো, গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করছে না তো সেই লোক? পুলিশের কাছে যেতে পারতাম। কিন্তু তারা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে? আরও একটা ভয়—যারা আমার ভাই-ভাতিজাকে ফাঁসিয়েছে, তারা আমাকেও ফাঁসাতে পারে। তাই লুকিয়ে পড়লাম। গোপনে রহস্য ভেদের চেষ্টা চালালাম।'

'আপনিই তাহলে আমাদের বাড়িতে গিয়ে মেসেজের ফটোকপি দিয়ে এসেছেন,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। শুনেছি, অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছ তোমরা। অনেক গুপ্তধন উদ্ধার করেছ।'

'রকি বীচে এলেন কবে? ববেরা নিখোঁজ হওয়ার পর?'

'হ্যাঁ। রেডিওতে খবর শুনলাম। বব আর মরিসকে পুলিশ খুঁজছে, তাই ওদের খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করলাম না। গুপ্তধন উদ্ধারে মন দিলাম।'

প্রফেসরের কথা বিশ্বাস করল কিশোর। মিথ্যে বলার কোন কারণ নেই তাঁর।

'বব আমাকে চিঠি লিখে তোমাদের কথা জানিয়েছিল,' বললেন তিনি। 'গুপ্তধন উদ্ধারে তোমাদের সাহায্য নিতে বলেছিল। কিন্তু বিশ্বাস করতে

পারিনি,' হাসলেন তিনি। 'তাই নজর রেখেছি তোমাদের ওপর।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল কিশোর, 'বনের মধ্যে তাহলে আপনার পায়ের ছাপই দেখেছি। সোনা খুঁজতে গিয়ে ব্ল্যাক উইলোর বনে খোঁড়াখুঁড়ি করেছেন আপনিই।'

মাথা ঝাঁকালেন লয়েড। 'তোমাদের সঙ্গে এ ভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় ভালই হলো। আশা করছি, চারজনে মিলে মেসেজের মানে বের করে ফেলতে পারব।'

অনেক কথা বললেন প্রফেসর। নীরবে শুনছে তিন গোয়েন্দা। গুপ্তধন উদ্ধারে আসার সময় কাজে লাগতে পারে ভেবে সঙ্গে করে টেলিস্কোপিক ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছেন। গাড়ি রেখেছেন রকি বীচের বাইরে আরেক শহরে। আস্তানা গেড়েছেন একটা বনের মধ্যে। রকি বীচে ঢোকেন ছদ্মবেশ নিয়ে, নয়তো এমন ভাবে মুখ ঢেকে যাতে কেউ চিনতে না পারে। পকেট থেকে আরেক টুকরো কাগজ বের করে দিলেন তিনি। তাতে বেশ কিছু সংখ্যা, কোণ, ত্রিভুজ, অঙ্ক কষা রয়েছে। আর রয়েছে একটা লাইন: the evening star cresent.

'আগেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি, তোমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি বলে মেসেজের এই অংশটা পাঠাইনি,' বললেন তিনি। 'আমার ধারণা, এটাই সবচেয়ে জরুরী অংশ। ক্যাকটাস ক্রলারের শেষ মেসেজ। ষোলোশো সাতচল্লিশ সালের গ্রীষ্মের শেষে লেখা হয়েছে। তখন ভেনাস বা শুক্রগ্রহের অবস্থান কোনখানে ছিল, সেটা জানা গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে জরুরী।'

'গুপ্তধনের স্থান নির্দেশে এটা সাহায্য করবে?' এতক্ষণে মুখ খুলল রবিন।

'করবে। অঙ্ক, সংখ্যা আর জ্যামিতিক চিহ্নগুলোর মানে বুঝে বুঝে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। প্রতিদিন একটু একটু করে পুবদিকে সরিয়ে নিচ্ছে আমাকে এগুলো।'

কাগজটার দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'বড় জটিল অঙ্ক!'

'না বুঝলে জটিল,' প্রফেসর বললেন। 'ভেনাস বা শুক্রকে ইভনিং স্টার বলেছেন ক্যাকটাস। ক্রিসেন্ট বলে বুঝিয়েছেন একটা বিশেষ সময়ের কথা, যখন গ্রহটা সূর্য থেকে পুবে সরে যায় সবচেয়ে বেশি। ভূগোলে জ্ঞান থাকলে নিশ্চয় জানো, শুক্রের গতি অনিয়মিত। কক্ষপথে ঘুরতে গিয়ে এ বছরের একটা বিশেষ সময়ে যেখানে থাকবে, তার পরের বছর সেটা থাকবে না, কিংবা তার পরের বছরও নয়। আবার ঠিক একই জায়গায় আসতে আসতে আটটা বছর লাগিয়ে দেবে।'

'তারমানে গুপ্তধন উদ্ধারের সময় সীমিত করে দিয়েছেন ক্যাকটাস!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। মনে পড়ল, মরিস ক্রলার বলেছিলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এর কিনারা করতে না পারলে বহুদিন আর করা যাবে না। তাঁর কথার মানে বোঝা গেল এখন।

'হ্যাঁ,' লয়েড বললেন, 'সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এ বছর মিস করলে আবার আটটি বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি

কেউ তুলে না নিয়ে যায়। এই মেসেজ কোথায় দেখল সেই লোক, বুঝতে পারছি না! যাই হোক, তদন্তে তোমাদের উন্নতিও অবাক করেছে আমাকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন খুঁজে বের করতে হবে গুপ্তধন। সেই সঙ্গে আমার ভাই-ভাতিজাকেও।'

'আপনার সঙ্গে আবার কখন, কোথায় দেখা হবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তোমাদের অসুবিধে না থাকলে আজ দুপুরের পর? এই বাড়িতেই। গোলাঘরটার সামনে অপেক্ষা করব আমি।'

'ঠিক আছে।'

লয়েডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

ইয়ার্ডে ফিরে কিশোর বলল, 'বাড়ি গিয়ে ঘুম দাও। বলা যায় না, আজকেও রাত জাগতে হতে পারে। দুপুরে চলে এসো।'

রবিন আর মুসা চলে গেল।

মোটর সাইকেল রেখে ওঅর্কশপে ঢুকল কিশোর। ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচারকে ফোন করে ট্রাকে তুলে গাড়ি পাচারের সম্ভাবনার কথাটা বলল। আর্ল উইন্ডসরের ওপর নজর রাখার দরকার আছে কিনা, ভেবে দেখতে বলল। প্রফেসর লয়েড ক্রলারের সঙ্গে যে দেখা হয়েছে, সে খবরও জানাল। কথাটা আপাতত গোপন রাখতে অনুরোধ করল।

তিনি জানালেন, গাড়ি চোরদের ধরেও ছেড়ে দেয়াতে প্রচুর অভিযোগ আসছে। তাড়াতাড়ি আবার ধরতে বলা হচ্ছে ওদের। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। কিন্তু কোথায় যে উধাও হয়ে গেছেন মিস্টার ক্রলার আর বব, কোন হদিসই করতে পারছে না।

ষোলো

দুপুরে খেয়েদেয়ে দুই সহকারীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর।

ক্রলার ফার্মে এসে গোলাঘরের সামনে মোটর সাইকেল থামাল। অপেক্ষা করতে লাগল লয়েডের আসার

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। প্রফেসর আর আসেন না। বার বার ঘড়ি দেখতে লাগল কিশোর। দেরি করছেন কেন? এতক্ষণে তো চলে আসার কথা

একটা চকচকে জিনিসের ওপর চোখ পড়তে মুসা বলল, 'ওটা কি?'

এগিয়ে গেল সে। নিচু হয়ে তুলে নিল জিনিসটা। প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। কিশোরকে বলল, 'দেখো!'

জিনিসটা দেখে অবাক হলো কিশোরও। একটা ভাঙা টেলিস্কোপ। এটা ওখানে গেল কি করে? প্রফেসরের না তো?

সন্দেহ হলো ওর। এগিয়ে গেল জিনিসটা যেখানে পাওয়া গেছে,

সেখানে। নরম মাটিতে জুতোর ছাপ দেখা গেল। গোড়ালিগুলো বসে গেছে মাটিতে। অতিরিক্ত চাপ পড়েছে। ধস্তাধস্তি হয়েছিল নাকি?

আরও আধঘন্টা অপেক্ষা করার পরও যখন লয়েড এলেন না, সে নিশ্চিত হয়ে গেল, খারাপ কিছু ঘটেছে তাঁর। এখানে এসে অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্যে। এই সময় হামলা হয়েছে তাঁর ওপর। কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ফোন করে ব্যাপারটা তখনই ক্যাপ্টেনকে জানাল সে।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'প্রফেসর যে কিডন্যাপ হয়েছেন, এর কোন প্রমাণ আছে?'

'না,' বলল কিশোর।

'তারমানে এটা তোমার ধারণা। শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কাউকে খোঁজার জন্যে পুলিশ ফোর্স পাঠানো বোধহয় ঠিক হবে না। তবু দেখি, কি করা যায়।'

ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে ক্যাপ্টেন কি বলেছেন সহকারীদের জানাল কিশোর।

'এখন কি করব?' জানতে চাইল মুসা।

'চলো, আপাতত বাড়ি ফিরে যাই। একটা প্ল্যান করতে হবে। আমি শিওর, শত্রুর হাতে পড়েছেন প্রফেসর। সেই একই শত্রু, যারা তাঁর ভাই আর ভাতিজাকে তুলে নিয়ে গেছে। এবং এই কিডন্যাপারদের সঙ্গে গাড়ি চোরের সম্পর্ক আছে। হয়তো কিডন্যাপার আর চোরেরা একই দলের লোক।'

ইয়ার্ডে পৌঁছে মোটর সাইকেল রেখে ওঅর্কশপে ঢুকল ওরা। কি করে চোরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেই আলোচনা চলল।

রবিন বলল, 'এক কাজ করা যায়, স্পাইকের ওপর চোখ রাখতে পারি আমরা। ওর হোটেলের কাছে গিয়ে লুকিয়ে থাকব। সে বেরোলেই তার পিছু নেব। কোথায় যায়, দেখব।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'তাতে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। ও এতটা অসতর্ক থাকবে না যে পিছু নিয়ে ওর আড্ডায় চলে যেতে পারব। ভাল কোন বুদ্ধি বের করা দরকার।'

হাল ছেড়ে দিল রবিন। 'তুমিই ভেবে বের করো।'

চোখ বুজে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর। চুপ করে রইল মুসা আর রবিন। ওরা জানে, পুরোদমে চালু হয়ে গেছে এখন গোয়েন্দাপ্রধানের মগজ। কিছু একটা বের না করে আর থামবে না।

চোখ মেলল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'মুসা, কাঠের ঘোড়ার কাহিনী শুনেছ?'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা। 'কাঠের ঘোড়া!'

রবিন বলল, 'ট্রোজান হর্সের কথা বলছ নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'সেটা আবার কি জিনিস?'

'ট্রোজানদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছিল গ্রীকদের। দুর্গের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছিল ট্রোজানরা। কিছুতেই তার মধ্যে ঢুকতে না পেরে শেষে এক বুদ্ধি করল গ্রীকরা। বিশাল এক কাঠের ঘোড়া বানিয়ে ট্রোজানদের উপহার পাঠাবে। ঘোড়ার ভেতরটা থাকবে ফাঁপা, তার ভেতরে লুকিয়ে থাকবে সৈন্য। ওরা ভেতরে ঢুকে দুর্গের দরজা খুলে দেবে...'

'কিন্তু আমরা কাঠের ঘোড়া পাব কোথায়?'

'কাঠের না হোক,' মুচকি হাসল কিশোর, 'ধাতব তো পাব?'

'শুরু হলো রহস্য করে কথা বলা! একটু সহজ করে বলতে কি তোমার কষ্ট লাগে?'

'না, লাগে না। একটা গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারি আমরা।'

বুঝল না মুসা। 'তাতে কি হবে?'

'নাহ্, একেবারে ভেঙে না বললে কিছু ঢোকে না তোমার মাথায়। শোনো, চোরেরা যখন আমাদের কাছে এল না, আমরাই ওদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব। একটা গাড়ি কিনব। সেটা কোথাও রেখে বুটের মধ্যে লুকিয়ে থাকব আমি আর রবিন। তুমি তোমার গাড়িতে বসে চোখ রাখবে। চোর গাড়িটা নিয়ে রওনা হলে, পিছু নেবে। চেষ্টা করবে লেগে থাকার। যদি তোমাকে কোন ভাবে খসিয়েও দেয়, আমাদের পারবে না...'

হাত তুলল মুসা, 'হয়েছে, হয়েছে, বুঝে গেছি! গাড়ির বুটে ঢুকে চলে যাবে চোরের আস্তানায়। চিনে নিয়ে ফিরে আসবে।' হাসল সে, 'চমৎকার বুদ্ধি। কিন্তু যদি ধরা পড়ো?'

'সেই ঝুঁকি তো আছেই। এ ছাড়া চোরগুলোকে ধরার আর কোন উপায় নেই।'

'কবে গাড়ি কিনবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আজই। দেরি করে লাভ কি?'

'চোর ধরার জন্যে এত টাকা খরচ করবে?'

'করব। কাজ শেষ হলে আবার বেচে দেব। ক্রলারদের যদি উদ্ধার করে আনতে পারি, ওদের কাছ থেকে আদায় করে নেব খরচের টাকাটা।'

'কোনখান থেকে কিনবে?' জানতে চাইল মুসা। 'রকি বীচ?'

'ভাবছি, ডিয়ারভিলে চলে যাব। স্পাইক আছে ওখানে। বেশির ভাগ চুরি হয়েছে ওখান থেকে। গাড়ি কিনে কোস্ট রোড ধরে রকি বীচের দিকে আসব। পথে জায়গায় জায়গায় থেমে অপেক্ষা করব। দেখব, চুরি করে কিনা।'

'যদি না করে?'

'তখনকারটা তখন ভাবব। তবে এমন গাড়িই কিনব, যাতে চুরি করার লোভ সামলাতে না পারে।'

সেদিন সন্ধ্যায় ডিয়ারভিলের একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির দোকানে ঢুকল রবিন আর কিশোর।

বেশ কিছু আধুনিক মডেলের গাড়ি আছে। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল

দুজনে।

'কোনটা যে পছন্দ করব, বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল। 'দাম এগুলোর কোনটারই কম হবে না। বেশি দামী গাড়ি চোরের কাছে বলি দিতেও ইচ্ছে করছে না।'

'আমারও না।'

এগিয়ে এল দোকানদার। পেটমোটা, গোলগাল মুখ। ওদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি জিনিস চাই তোমাদের?'

'কম দামে রাজকীয় চেহারা,' বলল কিশোর।

'বছরখানেকের বেশি পুরানো হলে চলবে না,' রবিন বলল। 'বিদেশীও নয়।'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল লোকটা। কয়েকটা বড় বড় গাড়ির দিকে তাকাল। সারির শেষ মাথার গাড়িটার ওপর দৃষ্টি স্থির হলো। 'ওইটা খুব ভাল জিনিস। সিক্স সিলিন্ডার এঞ্জিন, পাওয়ার স্টিয়ারিং...'

গাড়ির রঙটা তেমন জমকালো না। বাদামী। মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, এ জিনিসে চলবে না। আরও ঝলমলে কিছু চাই।'

আরেক কোণে ওদের নিয়ে গেল দোকানি। একটা হালকা সবুজ রঙের চ্যাপেলর গাড়ি। সুন্দর। দুই বছরের পুরানো, কিন্তু অতটা মনে হয় না। বডিটা প্রায় নতুন।

গাড়িটার চারপাশে কয়েক চক্কর দিল দুজনে।

'এটা আসল লিমুজিন,' দোকানি বলল। 'কিন্তু এঞ্জিন অত ভাল না। কারবুরেটরের বেশ কিছু কাজ আছে। আমি হলে কোনমতেই কিনতাম না। কিন্তু তোমাদের এটাই পছন্দ, কি আর করা।'

ভেতরে ঢুকল কিশোর আর রবিন। দেখেটেখে বেরিয়ে এল। বাইরে থেকে দেখে বেশ দামী মনে হয় গাড়িটা, ভেতরে কি থাকল না থাকল অত দেখার নেই।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কি বলো?'

জবাব দেয়ার আগে বুটটা পরীক্ষা করল কিশোর। অনেক বড়। ফিরে তাকিয়ে হাসল সে। 'আমাদের জিনিস পেয়ে গেছি।' দোকানির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দাম কত?'

'দামের জন্যে আটকাবে না। কমেই দিয়ে দেব। দেখো আরও ভাল করে।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গাড়ি কেনা হয়ে গেল। দাম বুঝে নিয়ে রশিদ দিল দোকানি। নতুন লাইসেন্স প্লেট লাগিয়ে দিল। চাবি নিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রবিন। কিশোর বসল তার পাশে। গাড়ি চালাতে ভাল লাগে না ওর।

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল দোকানি। 'যে ভাবে দেখলে, গাড়ি চেনো না তোমরা এ কথা বলা যাবে না। আমি বুঝতে পারছি না, এটা কিনলে কেন? যাই হোক, উইশ ইউ গুড লাক।' কয়েক পা গিয়ে আবার ফিরে এল, 'ভাল

কথা, দক্ষিণে যদি যাওয়ার ইচ্ছে থাকে, সাবধানে থেকো। ডিয়ারভিল-রকি বীচ সড়কে আজকাল চোরের উৎপাত বেড়েছে। তোমরা যে জিনিস কিনলে, চোরের নজর পড়বেই।'

'সেজন্যেই তো কিনলাম,' হাসি মুখে বলল কিশোর।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দোকানি।

তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে স্টার্ট দিল রবিন। বেরিয়ে এল রাস্তায়।

'কেমন লাগছে চালাতে?' জানতে চাইল কিশোর।

'স্পীড তুলতে সময় নেয়। এ ছাড়া আর কোন গোলমাল নেই।'

রেডিও অন করে দিল কিশোর। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই নিউজ বুলেটিন শুরু হলো। যে খবরটা শোনার জন্যে আগ্রহী সে, সেটাই বলল সংবাদ পাঠক। কোস্ট রোডে একটা টেলিফোন বুদের কাছ থেকে আরেকটা গাড়ি চুরি হয়েছে।

খুশি হলো কিশোর, 'যাক, চোরেদের অপারেশন চলছে।'

হাইওয়েতে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল ওরা। এমন জায়গায় গেল, যেখানে চোরের নজর পড়ার সম্ভাবনা আছে। শেষে একটা ছোট স্ন্যাকবারের সামনে গাড়ি রেখে নাস্তা করার জন্যে ভেতরে ঢুকল। খেতে খেতে একটা চোখ গাড়িটার ওপর রাখল রবিন। কিশোর গেল মুসাকে ফোন করতে। জানাল, গাড়ি কেনা হয়ে গেছে। কোস্ট রোডের ক্যাম্পিং এরিয়ায় অপেক্ষা করবে ওরা। সে যেন ওর জেলপিটা নিয়ে চলে আসে।

হিলসাইড ক্যাম্পিং এরিয়ায় যখন পৌঁছল মুসা, অন্ধকার হয়ে আসছে তখন। কয়েকটা গাছের আড়ালে গাড়িটা লুকিয়ে রাখল সে। নেমে এসে নতুন কেনা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে ফেলল, 'খাইছে! এ কি! এত টাকা খরচ করলে?'

হাসল রবিন, 'খুব কম দামে কিনেছি। দোকানি বলল, এঞ্জিনটা অত ভাল নয়। কারবুরেটরেও গোলমাল। কিন্তু তাতে কি? গাড়ির জাদুকর তো আছেই আমাদের। তোমার হাতে পড়লে ও এঞ্জিন অন্য জিনিস হয়ে যাবে।'

'আসলে আমরা চেয়েছি,' কিশোর বলল, 'চোরের নজর পড়ুক। টোপ হিসেবে কেমন?'

'আমারই চুরি করতে ইচ্ছে করছে,' মুগ্ধ চোখে গাড়িটা দেখছে মুসা।

'ব্যস, তাহলেই হলো। এটাই চেয়েছি।'

যেখানে থেমেছে ওরা, সেখানটা বেশ নির্জন। কিন্তু রাস্তার একেবারে ধারে। এদিক দিয়ে গেলে চোরের নজর পড়বেই গাড়িটার ওপর। কিশোরের ধারণা, চুরি করার আগে রকি বীচ থেকে ডিয়ারভিল পর্যন্ত চক্কর মারে চোর। ইতিমধ্যে কোন গাড়ি পছন্দ হয়ে গেলে এবং সুযোগ থাকলে চুরি করে নিয়ে পালায়।

অন্ধকার নামল। জেলপিতে গিয়ে বসে রইল মুসা। কিশোর আর রবিন ঢুকল চ্যান্সেলরের বুটে। দুজনের জায়গা হয়ে গেল। এজন্যেই বড় বুট দেখে

পছন্দ করেছে কিশোর।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা। ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে গেল। বুটের মধ্যে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা খুব কষ্টকর কাজ। বেকায়দায় পড়ে থেকে পিঠ ব্যথা হয়ে গেল ওদের। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ কানে আসছে। কিন্তু একটা গাড়িও থামছে না ওদের কাছে।

অবশেষে থামল একটা গাড়ি। এঞ্জিন বন্ধ করল না। কয়েক সেকেন্ড পর চলে গেল।

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে শুরু করল।

শক্ত হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

গাড়ির কাছে এসে থামল পায়ের শব্দ। দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকল লোকটা।

চুপ করে পড়ে আছে কিশোর আর রবিন। টান টান উত্তেজনা। ঠোঁট কামড়ে ধরল রবিন।

চালু হলো মোটর। দুর্বল। বন্ধ হয়ে গেল। আবার চালু হলো। আবার বন্ধ। স্টার্ট থাকছে না।

কয়েকবার চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিল লোকটা। বিড়বিড় করে গাল দিল। স্পাইকের গলা চিনতে পারল দুই গোয়েন্দা।

রাগ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল স্পাইক। দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। সরে যেতে শুরু করল পায়ের শব্দ।

হতাশ হলো গোয়েন্দারা। গাড়িটার এঞ্জিন ডোবাল ওদেরকে। স্পাইক চলে গেলে বেরিয়ে এল বুট থেকে।

'গেল সব গড়বড় হয়ে!' বিরক্ত হয়ে গাড়ির গায়ে চাপড় মারল রবিন। 'শুধু শুধু এতগুলো টাকা খরচ করলাম!'

'অল্পেতেই হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন?' সান্ত্বনা দিল কিশোর। 'মুসাকে দিয়ে কারবুরেটরটা মেরামত করাব। তারপর দেখি কোন চোরের সাধ্য আছে এটাকে ফেলে যায়।'

টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিয়ে মুসাকে ডাকল রবিন।

মুসা এসে সব শুনে বলল, 'টর্চটা ধরো তো। দেখি কি হয়েছে।'

বনেট তুলে এঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ল মুসা। মিনিট বিশেক খুটখাট কি কি সব করল। রবিনকে বলল, 'যাও, স্টার্ট দাও।'

ড্রাইভিং সীটে বসল রবিন। মোচড় দিল চাবিতে। দুর্বল ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানাল একবার এঞ্জিন। পরক্ষণে গর্জে উঠল।

আবার বন্ধ করে আবার স্টার্ট দিতে বলল মুসা।

আর কোন গোলমাল করল না এঞ্জিন। চাবিতে মোচড় দিতেই স্টার্ট হয়ে যায়।

কিশোর বলল, 'চলো, অন্য কোথাও গিয়ে চেষ্টা করে দেখি। চুরি করতে যখন বেরিয়েছে স্পাইক, একটা গাড়ি না নিয়ে যাবে না। নির্জন ফিশিং স্পটগুলোর কোনটাতে চলে যাই। ও ভাববে আমরা গাড়ি রেখে মাছ ধরতে

গেছি। চুরি করবে।'

কোন দিকে গেছে স্পাইকের পায়ের শব্দ, মনে করার চেষ্টা করল কিশোর। দক্ষিণে গেছে। নিশ্চয় ওদিকেই কোনখানে গিয়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওর সঙ্গী।

কয়েক মাইল দক্ষিণে সরে গেল ওরা। একটা ফিশিং স্পটের পাশে রাস্তার কিনারে গাড়ি রেখে বুটের মধ্যে ঢুকে পড়ল রবিন আর কিশোর। কাছেই বনের মধ্যে গাড়ি নিয়ে লুকিয়ে রইল মুসা।

আকাশে মেঘ জমেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবহাওয়া খারাপ হয়ে আসছে দেখে রাস্তায় গাড়ির ভিড় কমে যাচ্ছে। নীরবতার মধ্যে কানে আসছে ঢেউয়ের একটানা গর্জন।

গড়িয়ে গড়িয়ে কাটছে সময়। অস্থির হয়ে উঠল রবিন। ফিসফিস করে একবার কিশোরকে বললও বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে—চোর আর আসবে না। কিন্তু অস্থির হলো না কিশোর।

কয়েক মিনিট পর দুজন লোকের গলা শোনা গেল। কথা বলতে বলতে আসছে। আরও কাছে এলে বোঝা গেল, দুজনেই জেলে। মাছ ধরতে গিয়েছিল।

আবার নীরবতা। সাগরে একটা জাহাজের বাঁশি শোনা গেল। তীরের কাছ দিয়ে বন্দরে চলেছে।

আরও একটা ঘন্টা পেরোল। একটা গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। কাছে এসে গতি কমল। থামল। দরজা খুলে বন্ধ হলো। এগিয়ে আসতে লাগল ভারী পায়ের শব্দ। গাড়ির কাছে এসে থমকাল। তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লোকটা।

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছে কিশোর আর রবিন। এবারও গোলমাল করবে না তো এঞ্জিন?

করল না। চাবিতে একবার মোচড় দিতেই গর্জে উঠল। খুশি হয়ে বিড়বিড় করে আপনমনে কি বলল লোকটা, বুটের ভেতর থেকে বুঝতে পারল না দুই গোয়েন্দা।

গাড়ি ব্যাক করল লোকটা। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হলো। মাইলখানেক গিয়ে আবার মোড় নিল গাড়ি।

মুসার জেলপির শব্দ একবার কানে এসেছে ওদের। তারপর পিছিয়ে গেছে। নিশ্চয় বিকট ভটভট শব্দ লোকটার চোখে পড়ার কারণ হতে পারে ভেবে পিছিয়ে গেছে সে। দূর থেকে অনুসরণ করছে।

লুমিনাস ডায়াল গাড়ির দিকে চোখ কিশোরের। সময় দেখে আর গতিবেগ আন্দাজ করে বোঝার চেষ্টা করছে, কতদূর এসেছে ওরা।

থামল গাড়িটা।

আরেকটা জোরাল এঞ্জিনের শব্দ কানে এল ওদের। মুসার গাড়ির নয়। ট্রাক্টর! চিনে ফেলল দুজনেই। তারমানে আর্ল উইন্ডসর! ওর ফার্মে নিয়ে আসা হয়েছে গাড়িটা!

আবার চলতে আরম্ভ করল গাড়ি। এবড়ো-খেবড়ো পথে নেমেছে। ঝাঁকির চোটে অবস্থা কাহিল। ঠুস করে ধাতব দেয়ালে মাথা ঠুকে গেল রবিনের। উহ্ করে উঠতে গিয়ে মুখ চেপে ধরে শব্দটা আটকাল।

কিছুক্ষণ পর ঝাঁকুনি কমল। মনে হলো কোন মসৃণ ঢাল বেয়ে নামছে এখন গাড়ি।

থামল অবশেষে।

একজন লোকের গলা শোনা গেল, 'সব ঠিক আছে?'

জবাবে নিশ্চয় মাথা নাড়ল ড্রাইভার। কারণ আর কোন কথা কানে এল না ওদের।

ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সাগরের তীরে এনে দাঁড় করানো হয়েছে গাড়িটা।

খানিক পর একটা মোটর চালু হলো কাছেই কোথাও। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওদের। মনে হলো ঝুলছে গাড়িটা। কয়েক সেকেন্ড পর আলতো একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল।

'বাহ্, রিক,' বলল আগের লোকটা, 'দারুণ জিনিস এনেছ তো! পেলে কোথায়?'

'পাঁচ মাইল দূরে একটা ফিশিং স্পটে,' জবাব দিল গাড়ির ড্রাইভার।

'বুটে দামী কিছু আছে? দেখেছ?'

'জানি না। দেখব?'

ধড়াস করে এক লাফ মারল রবিনের হৃৎপিণ্ড। কনুই দিয়ে কিশোরের গায়ে গুঁতো মারল সে। ওর কব্জি চেপে ধরে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করল কিশোর।

'না, থাক, দরকার নেই,' অন্য লোকটা বলল। 'একবারে ওঅর্কশপে নিয়ে গিয়েই দেখা যাবে।'

সতেরো

পায়ের শব্দ সরে গেল। আর কেউ কথা বলল না।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল কিশোর। কেউ এল না দেখে ফিসফিস করে বলল, 'এইই সুযোগ! বেরোও!'

আস্তে করে বুটের ঢাকনা তুলে উঁকি দিল সে। অন্ধকারে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল ভেতর থেকে। রবিনও নেমে এল।

একটা পাথরের চাঙড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল দুজনে।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সাগরে ঢেউয়ের গর্জন বাড়ছে। ঝড় আসবে।

বিদ্যুতের আলোয় ওরা দেখল, একটা বিশাল গিরিখাতের মধ্যে রয়েছে। একপাশে খাড়া পাহাড়।

'দেখো!' ফিসফিস করে বলল সে।

রবিনও দেখল। পাহাড়ের গোড়ায় শক্ত একটা তারের জাল পড়ে আছে। মোটা ইস্পাতের দড়ি উঠে গেছে ওপরে। 'হুঁ, এই তাহলে ঘটনা! ওপর থেকে মোটরের সাহায্যে জালে করে নামিয়ে দেয়া হয় গাড়িগুলো। মোটরটা এখন খুঁজলে ওপরে কোন ঝোপের ভেতর পাওয়া যাবে। নিজেরা নামে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে। আর্মিতে থাকার সময় নিশ্চয় এ সব প্র্যাকটিস করেছে স্পাইক।'

'চুরি করার পর পাহাড়ের ওপর কোনদিক দিয়ে আনা হয়, তাও বুঝেছি,' কিশোর বলল। 'বড় রাস্তা থেকে আর্লের সীমানায় নেমে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে, দেখে, কেউ পিছু নিল কিনা। যদি না নেয় আর্লের জায়গার ওপর দিয়ে চলে আসে পাহাড়ের ওপর। ওখান থেকে জালে করে নিচে নামিয়ে দেয়া হয়। রাস্তা আর অন্যান্য জায়গায় গাড়ির চাকার যে সব দাগ পড়ে, ট্রাক্টরের সাহায্যে মুছে দেয় আর্ল।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'চুরি করার পর সরাসরি চালিয়ে নিয়ে আসে যে সব গাড়ি, সেগুলোর বেলায় এই ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিছু গাড়ি ট্রাকে তুলে আনে। যে জন্যে পিছু নিয়েও হঠাৎ করে গাড়িগুলোকে গায়েব হয়ে যেতে দেখেছি আমরা। ওই সময় ট্রাকটা দেখা গেছে। ট্রাকের পেছনে খুঁজলে তখন পেয়ে যেতাম গাড়িটা।'

'এখান থেকে সরায় কি করে?'

'জলপথে। বার্জে করে। কোন সন্দেহ নেই। আশেপাশে এই পাহাড়ের মধ্যেই কোথাও লুকানো জেটি আছে।'

'চলো, দেখি।'

লোকগুলোর পায়ের শব্দ যেদিকে মিলিয়ে যেতে শুনেছে ওরা, আন্দাজে সেদিকে এগিয়ে চলল। পাহাড়ের গোড়া দিয়ে কিছুদূর আসতেই একটা সুড়ঙ্গমুখ দেখতে পেল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল, মুখের ওপরের দিকে চ্যাপ্টা পাথর বেরিয়ে এমন করে ঢেকে দিয়েছে, খুব কাছে থেকে না তাকালে চোখে পড়ে না। আরও ওপরে মরা গাছের ডালে বাদুড় ঝুলে রয়েছে অসংখ্য। গায়ে বাতাসের ঝাপটা লাগলেই কিঁচকিঁচ করে উঠছে।

সুড়ঙ্গমুখে পা দিতে বারুদের হালকা গন্ধ নাকে এল। কোমর থেকে টর্চ খুলে নিয়ে জ্বালল কিশোর।

'ডিনামাইট ফাটিয়েছে!' বলল সে। 'সেজন্যেই বারুদের গন্ধ। বোমা মেরে বড় করে নিয়েছে সুড়ঙ্গমুখটা। অনেক বাদুড় মারা পড়েছে নিশ্চয়। ওশনসাইডে আমরা যে মরা বাদুড়টা দেখেছিলাম, ওটাও বোমার আঘাতে আহত হয়েছিল। ওশনসাইডের সৈকত পর্যন্ত উড়ে যেতে পেরেছিল কোনমত। তারপর পড়ে গেছে।' সুড়ঙ্গের ভেতরে আলো ফেলল সে। 'ভেতরে নিশ্চয় চোরেদের হেডকোয়ার্টার। এসো।'

কয়েক গজ এগোতে দেখা গেল দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গটা। বাঁয়েরটা ধরে এগোল ওরা। কয়েক মিনিট চলার পর মুখে এসে লাগল সাগরের তাজা বাতাস। কি ব্যাপার? শেষ হয়ে গেল নাকি?

আরও গজ দশেক এগোতে আলো দেখা গেল। সুড়ঙ্গ শেষ সাবধানে বাইরে উঁকি দিল দুজনে।

পাহাড়ে ঘেরা জেটিটা চোখে পড়ল। কালো একটা ফিশিং বোট নোঙর করে আছে একটা গভীর খাঁড়ির কিনারে। আরেকটু দূরে একটা বার্জ। দুই পাশে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে ঢুকেছে সরু খাল। সেই খাল দিয়ে ঢুকতে হয় খাঁড়িতে। বাইরের সাগর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, এখানে কোন গোপন জেটি রয়েছে।

বড় ক্রেন দিয়ে মাল তোলা হচ্ছে বার্জে।

মাল দেখে হতবাক হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। অনেক পুরানো, রঙহীন, মরচে পড়া কতগুলো বাতিল গাড়ি। এ জিনিস কেন তুলছে? কি হবে ওগুলো দিয়ে?

মাল তুলতে সাহায্য করছে দুজন লোক। পরনে ডুবুরির পোশাক। পোশাকটা অদ্ভুত। সিনেমার ব্যাটম্যানের মত। মাথায় হুড। দূর থেকে এদেরই কাউকে পাহাড়ে দেখে আবছা অন্ধকারে ওরা ভেবেছিল মাকড়সা-মানব। কারেনও ওদের কাউকেই দেখেছে। দুজনের হাতে দুটো বড় লোহার আঁকশি। ওগুলো দিয়ে ক্রেনের হুক ধরে টেনে এনে লাগিয়ে দিচ্ছে জালের সঙ্গে। জালের মধ্যে ভরা গাড়িটা বার্জে তোলার পর আবার খালি জাল ফিরিয়ে এনে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে মাটিতে। আরেকটা গাড়ি ভরে দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে।

আর কিছু দেখার নেই এখানে। হেডকোয়ার্টারটা খুঁজে বের করতে হবে এখন। আবার সুড়ঙ্গে ঢুকল দুজনে। চলে এল যেখানে দুই ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। ডানের শাখাটায় ঢুকল এবার।

শ'খানেক গজ এগোনোর পর নানা রকম খুটুর-খাটুর শব্দ কানে এল। বাতাসে রঙের গন্ধ। আরও কয়েক গজ এগিয়ে মোড় নিতেই সামনে দেখা গেল বিশাল এক গুহা। বড় বড় গাছ দিয়ে ঠেকা দেয়া হয়েছে গুহার ছাত যাতে ধসে না পড়ে। তিনজন লোক কাজ করছে। দুজন লোক মেশিনের সাহায্যে ঘষে ঘষে রঙ তুলছে একটা গাড়ি থেকে। আরেকজন একটা স্প্রে-মেশিন দিয়ে রঙ ছিটাচ্ছে একটা গাড়ির ছাতে। তাতে পুরানো, মরচে পড়া, বাতিল মনে হচ্ছে গাড়িটা।

বুঝে ফেলল কিশোর, আসলে বাতিল হচ্ছে না। বার্জে যে সব পুরানো গাড়ি তোলা হচ্ছে, ওগুলোর একটাও পুরানো নয়। প্রায় নতুন। চুরি করে আনার পর রঙ তুলে, মরচের মত লাল রঙ লাগিয়ে পুরানো চেহারা বানিয়ে বার্জে তুলে দিচ্ছে, যাতে কেউ দেখলে ভাবে, বাতিল জিনিস চালান করা হচ্ছে কোথাও। সেসব গাড়ি তখন আমেরিকার বাইরে কোন দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেখানে গাড়ির দাম অত্যধিক বেশি। ওখানে পৌঁছে নতুন রঙ করে বিক্রি করা হচ্ছে আকাশ-ছোঁয়া দামে।

হনির গাড়িটা দেখা গেল। তবে আগের মত আর চকচকে নেই। বডির

রঙ তুলে ফেলে এমন রঙ করা হয়েছে, মনে হচ্ছে পুড়ে, মরচে পড়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।

গুহার আরেক দিকের একটা সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকল দুজন লোক। একজনকে চেনে দুই গোয়েন্দা। মারলিন স্পাইক। সঙ্গের লোকটা নিশ্চয় রিক, অনুমান করল কিশোর।

যে লোকটা স্প্রে-মেশিন ব্যবহার করছে, তার দিকে এগোল দুজনে। মিনিটখানেক কি কথা বলল। তারপর কিশোররা যেখানে লুকিয়ে আছে সেদিকে চোখ তুলে তাকাল স্পাইক।

ধক করে উঠল রবিনের বুক। দেখে ফেলল নাকি?

সঙ্গীকে নিয়ে স্পাইককে এদিকে এগোতে দেখে রবিনের হাত ধরে টান দিল কিশোর, 'পালাও!'

সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে দ্রুত ফিরে চলল ওরা।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে, স্পাইকরা আসছে। তবে স্বাভাবিক গতি। তাতে বোঝা গেল, গোয়েন্দাদের পিছু নেয়নি ওরা।

বাইরে বেরিয়ে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কিশোর আর রবিন। খানিক পর স্পাইক আর তার সঙ্গী বেরিয়ে চলে গেল চ্যান্সেলর গাড়িটা যেখানে ফেলে এসেছে, সেদিকে। মনে হয় আনতে গেল।

আবার সুড়ঙ্গে ঢুকল কিশোররা। গুহাটার কাছে এসে দাঁড়াল। স্পাইক যেটা থেকে বেরিয়েছে, সেই সুড়ঙ্গে ঢোকার ইচ্ছে। ভেতরে কি আছে দেখতে হবে।

কাজ হচ্ছে গুহার একধারে। অন্যধারে নানা রকম বাক্স, রঙের টিন আর জঞ্জাল। সেগুলোর আড়ালে থেকে আবছা অন্ধকারে গা ঢেকে নিঃশব্দে সুড়ঙ্গমুখটার দিকে এগোল দুজনে।

লোকগুলোর অলক্ষ্যে চলে এল মুখটার কাছে। ঢোকার আগে ফিরে তাকিয়ে একবার দেখল কিশোর। না, দেখেনি লোকগুলো। একমনে কাজ করছে। চুরি করে কেউ ঢুকবে এখানে, কল্পনাই করছে না। তাই সতর্ক নয়।

ভেতরে ঢুকে পড়ল দুজনে। টর্চ জ্বালল কিশোর। বিশ গজ যেতেই আরেকটা ছোট গুহা দেখা গেল। পাথরের দেয়াল। ভেতরে উঁকি দিয়ে থমকে গেল সে। প্রায় তার পায়ের কাছে পড়ে আছেন প্রফেসর লয়েড ক্রলার। হাত-পা বাঁধা। মুখে গোঁজা কাপড়।

ওদের দেখে চোখ কপালে উঠল প্রফেসরের।

ঠোঁটে আঙুল রেখে তাঁকে কোন শব্দ না করতে ইশারা করে গুহার ভেতরে টর্চের আলো ঘোরাতে লাগল কিশোর। একপাশের দেয়ালের নিচে স্থির হলো আলোটা। আরও দুজনকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। বব আর তার বাবা মরিস ক্রলার।

দ্রুত বন্দিদের বাঁধন খুলে দিল কিশোর আর রবিন। মুখে গোঁজা কাপড়

সরাল।

বব বলে উঠল, 'তোমরা কিভাবে...'

'চুপ!' নিচু গলায় সাবধান করল কিশোর। 'কোন কথা নয় এখন! বাইরে চলো।'

উঠে দাঁড়ালেন মরিস ক্রলার। টলে উঠল শরীর। দীর্ঘ সময় পা বাঁধা থাকায় দাঁড়াতেই পারছেন না। হাত বাড়িয়ে দেয়াল ধরে ফেললেন। তিরিশ সেকেন্ড পর মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করলেন, হাঁটতে পারবেন।

যেদিক দিয়ে ঢুকেছে ওরা, সেটা ছাড়াও আরেকটা সুড়ঙ্গমুখ দেখা গেল গুহার অন্যপাশের দেয়ালে। লয়েড ক্রলার বললেন, 'ওটা দিয়েও লোক ঢোকে, দেখেছি।'

'তাহলে ওটা দিয়েই যাব,' কিশোর বলল। 'তাহলে আর ওঅর্কশপের শ্রমিকদের সামনে পড়ার ভয় থাকবে না।'

কিন্তু সুড়ঙ্গ ধরে অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই মুখের ওপর এসে পড়ল শক্তিশালী টর্চের আলো। চোখ ধাঁধিয়ে দিল কিশোরের। হাসি হাসি একটা কণ্ঠ বলল, 'বাহ্, তোমরাও ঢুকে পড়েছ! ভেরি গুড! ফিরে দৌড় দেয়ার চিন্তা কোরো না। আমার পকেটে পিস্তল আছে।'

পলকের জন্যে টর্চের আলো কিশোরের চোখ থেকে সরিয়ে নিজের হাতের দিকে ফেরাল সে। দেখাল, পকেট থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে।

লোকটা লুথার বারনারডি! এর পরনেও ব্যাটম্যানের পোশাক। এরকম বিচিত্র পোশাক পরে ঝোপঝাড়ে আত্মগোপন করতে সুবিধা, বোধহয় সেজন্যেই পরেছে।

'এসো আমার সঙ্গে,' ডাকল সে।

আঠারো

বদ্ধ সুড়ঙ্গে পিস্তলের সামনে কোন রকম চালাকি করা উচিত হবে না। ঘুরে ওরা দৌড় দেয়ার চেষ্টা করলে এলোপাতাড়ি গুলি চালাবে লুথার। আদেশ মানতে বাধ্য হলো ওরা। পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে রইল লুথার, ওরা এক এক করে তার পাশ কাটাল। তারপর ওরা চলল আগে আগে, সে পেছনে।

বড় আরেকটা গুহায় ওদের নিয়ে আসা হলো। ছাত থেকে ইলেকট্রিক বালব ঝুলছে। আরও দুজন লোক রয়েছে গুহাটায়। হাতে সাবমেশিনগান। লুথারের আদেশে বন্দিদের ওপর তাক করে ধরল।

বোঝা গেল, লুথার ওদের বস্। গাড়ি চোরের সর্দার। নাটের গুরু।

'হ্যাঁ, তারপর বলো,' পিস্তল নাচিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল লুথার, 'এখানে এলে কি করে?'

মিথ্যে বলে লাভ হবে না। সত্যি কথাই বলল কিশোর, 'গাড়ির বুটে করে।'

'কোন্ গাড়ি?'

'নতুন যেটা চুরি করে এনেছে রিক।'

'বাহ্, বুদ্ধিমান ছেলে। দারুণ ফাঁদ পেতেছিলে। ঢুকেও পড়লে। তবে তীরে এসে তরী ডুবল।'

মনে মনে বলল কিশোর—ডোবেনি। যে কোন মুহূর্তে মুসা চলে আসবে পুলিশ নিয়ে। কিন্তু সে কি পিছু নিয়ে আসতে পেরেছিল পাহাড়ের কাছে? পেরেছে, আশা করল কিশোর।

এই সময় গুহায় ঢুকল স্পাইক। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইল সে। তারপর দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, 'বিচ্ছুর দল, পুলিশের চেয়ে বেশি জ্বালিয়েছ তোমরা! আজ তোমাদের আমি...' এগোতে গেল সে।

'উঁহু,' পিস্তল নেড়ে বাধা দিল লুথার, 'ভায়োলেন্স দরকার নেই। অন্তত এ মুহূর্তে নয়। যাও, সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি।'

বেরিয়ে গেল লুথার। কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকল দশজন লোক। সঙ্গে সেই দুজন মাকড়সা-ডুবুরিও রয়েছে। সবাইকে বলল লুথার, 'আজ রাত্রের মধ্যেই গাড়িগুলো সব রেডি করে ফেলো। এখান থেকে চলে যাব আমরা। আর থাকাটা নিরাপদ নয়। যাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সবাই। রইল কেবল স্পাইক আর দুজন সাবমেশিনগানধারী।

স্পাইক বলল, 'বস্, এত সুন্দর একটা জায়গা ছেড়ে চলে যাব? এগুলোকে শেষ করে দিলেই হয়। ঝামেলা চুকে যায়।'

'না, যায় না। এরা যখন ঢুকতে পেরেছে, পুলিশও পারবে। আর ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। জায়গার কি অভাব আছে নাকি। আরেকটা বের করে নেব। এক কাজ করো, এদের বেঁধে ফেলো। এ ভাবে খোলা রাখাটা নিরাপদ মনে করছি না মরিয়া হয়ে অনেক কিছু করে বসে মানুষ।'

এক এক করে হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো কিশোর, রবিন এবং তিনজন ক্রলারের। গুহার মেঝেতে বসিয়ে দেয়া হলো ওদের। একটা টুল টেনে বসল লুথার। স্পাইকের দিকে তাকাল, 'মন দিয়ে শোনো, এদের কি করা হবে। তিন ক্রলারকে সঙ্গে নিয়ে যাব আমি। বার্জে করে। সাগরে ফেলে দেব। লাশ যদি তীরে এসে ঠেকে, আমাদের সুবিধে। পুলিশ ওদের নিয়ে মগ্ন থাকবে, আরেক দিকে চলে যাবে ওদের নজর। ভাববে, বোট নিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে কোনভাবে ডুবে মরেছে এরা। ওদের বোটটাকে কি করেছ, ডুবিয়ে দিয়েছ না?'

'আমি দিইনি, রেমন্ড দিয়েছে,' হেসে বলল স্পাইক। 'ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কুড়ালের দুই কোপ। চ্যানেলের বাইরে পঞ্চাশ হাত পানির নিচে এখন

ওটা।'

কিশোর বুঝল, ববের বোটটার কথা বলছে ওরা। বোটহাউস থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে এই অবস্থা করেছে তাহলে?

'গুড,' লুথার বলল। 'আর এই ছেলে দুটোর অন্য ব্যবস্থা করব। এদের লাশ যাতে না পায়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। লাশ না পেলে কিছু বুঝতেও পারবে না পুলিশ, আমাদের পিছেও লাগতে পারবে না। গ্যাস-কেভে নিয়ে যাও ওদের।'

'নিলে তো হাঁটিয়ে নিতে হবে। পায়ের বাঁধন খুলে দেব?'

'দাও।'

কিশোর আর রবিনের বাঁধন খুলে দিল স্পাইক। হাত বাঁধা রয়েছে আগের মতই। পিছমোড়া করে।

'এদেরকেও নিয়ে যাও ওখানে,' তিন ক্রলারকে দেখাল লুথার। 'এখানে বসে কে পাহারা দেবে।'

একসারিতে দাঁড় করানো হলো পাঁচ বন্দিকে। আগে-পিছে সাবমেশিনগান ধরে মার্চ করে নিয়ে যাওয়া হলো আরেকটা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে। অন্য পাশে আরেকটা গুহায় বেরোল ওরা। এটাও মোটামুটি বড়। বৈদ্যুতিক আলো আছে। প্রথমেই যে জিনিসটা চোখে পড়ল কিশোরের, বিশটা মেটাল সিলিন্ডার। দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। কোনটার কালো রঙ, কোনটার কমলা। মুখের কাছে গোল মিটার লাগানো। গায়ে বিদেশী ভাষায় কি যেন লেখা—সম্ভবত ওগুলোর পরিচয়। বুঝতে পারল না কিশোর বা রবিন। রাসায়নিক সঙ্কেত দেখে বোঝা গেল, কোনটার মধ্যে কি গ্যাস রয়েছে।

দেয়াল ঘেঁষে একসারিতে বসতে বলা হলো বন্দিদের।

আদেশ পালন করল ওরা।

এখন কি আমাদের মেরে ফেলা হবে?—ভাবছে কিশোর। পুলিশ আসতে আর কত দেরি? ততক্ষণ খুনীগুলোকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে কথা বলাতে হবে ওদের দিয়ে, বাঁচার এটাই একমাত্র উপায়। নরম গলায় বলল লুথারকে, 'আশা করি, আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?'

হাসল লুথার। 'মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামীর শেষ অনুরোধ? রাখব। আমার হাতে অনেক সময়। গাড়িগুলো রেডি হতে দেরি আছে। বলো, কি প্রশ্ন?'

'বব আর মিস্টার ক্রলারকে ফাঁসিয়েছেন কেন?'

'দোষ ছেলেটার। বোট নিয়ে সারাক্ষণ আমাদের গোপন জেটির বাইরে ঘুরঘুর করত। কোন সময় চ্যানেলটায় ঢুকে পড়ত, কে জানে। ওকে ঠেকানো ছাড়া পথ ছিল না। দুটো লাভ হয়েছে তাতে। পুলিশ আর পাবলিক ওদের চোর ভেবে বসে আছে। আমাদের দিকে নজর নেই। ছেলেটা যে আমাদের জেটি দেখে ফেলবে, এই ভয়ও গেছে।'

'ওশনসাইডে ওর বোটের তলা ফুটো তাহলে আপনার লোকই করেছিল?'

'হ্যাঁ, স্পীয়ার গান দিয়ে। ছোঁড়ার পর টান দিয়ে খুলে নেয়া হয়েছে বর্শাটা। ভেবেছিলাম, বোটটা অকেজো করে ডুবিয়ে দিলে সে আর এদিকে আসতে পারবে না। ডুবে গেলে আসতে পারতও না। তোমরা সেটা হতে দিলে না।'

তারমানে গুপ্তধনের জন্যে ধরা হয়নি বব আর মিস্টার ক্রুলারকে! লুথার কি গুপ্তধনের কথা জানে না?

'আমি আসলে চ্যানেলের কাছে ঘোরাঘুরি করেছি অন্য কারণে,' বব বলল কিশোরকে। 'ওদের জেটির খোঁজে নয়। আমার মনে হয়েছে পাহাড়ের এদিকটাতে কোথাও ক্যাকটাস ক্রুলারের গুপ্তধন রয়েছে...'

'থাক থাক, থামো!' ফাঁস করে দিচ্ছে ভেবে তাড়াতাড়ি ববকে চুপ করাতে চাইল কিশোর। 'এখন বোলো না কিছু!'

চুপ হয়ে গেল বব।

হাসল লুথার। 'ভাবছ, আমি জেনে যাব? খামোকা ভয়। আমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে ও—যখন জিজ্ঞেস করলাম, চ্যানেলের কাছে ঘোরাঘুরি করত কেন? ছেলেকে মারার হুমকি দিতে বাপও গড়গড় করে উগড়ে দিয়েছে সব।'

'বিশ্বাস করেছেন?'

'করেছি। সেজন্যেই ধরে নিয়ে এসেছি প্রফেসরকে। গাড়ি বেচে পাওয়া টাকার সঙ্গে যদি কিছু সোনাদানা যুক্ত হয়ে যায়, ক্ষতি কি?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল কিশোর। রবিনের দিকে তাকাল একবার। ও কোন কথা বলছে না। একদম চুপ। পাথরের মূর্তির মত মুখ করে আছে দুই সাবমেশিনগানধারী। চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। স্পাইক বসে আছে একটা টুলে। ওদের দিকে নজর।

আবার লুথারের দিকে ফিরল কিশোর, 'বনের মধ্যে রঙের চটা আর চাকার দাগ রেখে এসেছিল কে?'

'আমি,' গর্বের সঙ্গে বুকে হাত রাখল স্পাইক। 'পুলিশ আর তোমাদের বোকা বানানোর জন্যে।'

'সে তো বুঝতেই পেরেছি। একটা জিনিস বুঝিনি, আওয়াজটা হলো কি করে? গাড়ির সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষের?'

হেসে পকেট থেকে ছোট একটা অডিও ক্যাসেট বের করে দেখাল স্পাইক। 'এটার সাহায্যে।'

বুঝে ফেলল কিশোর। ক্যাসেটে নানা রকম জোরাল শব্দ রেকর্ড করা আছে। পুরো ভলিউম দিয়ে ক্যাসেট প্লেয়ারের সাহায্যে বাজিয়ে শুনিয়েছে স্পাইক। 'কারেলকেও নিশ্চয় ক্যাসেট প্লেয়ার বাজিয়েই শুনিয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকাল স্পাইক। 'বস্তুত গোলমাল শুরু করেছিল ব্যাটা। খালি ছোঁক ছোঁক করছিল। নাক গলাচ্ছিল। ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করলাম। যখন কাজ হলো না, গ্যাস দিয়ে অজ্ঞান করে বনে নিয়ে ফেললাম। দিলাম আগুন লাগিয়ে।' নাকমুখ কুঁচকে বলল, 'ওখানেও গিয়ে হাজির হলে তোমরা! বাঁচিয়ে আনলে ওকে!'

'এত গ্যাস জোগাড় করেছেন কেন?' প্রশ্ন করল রবিন।

'আমাদের দেশে নার্ভ গ্যাসের খুব অভাব,' জবাব দিল লুথার। 'খুব দাম ওখানে। পাওয়াই যায় না। গাড়ি বিক্রির টাকা দিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার কিনে দেশে পাঠাই। ব্যবসা করি।'

চুরির টাকা পুঁজি করে চমৎকার ব্যবসা, বলতে ইচ্ছে করল রবিনের।

কিশোর বলল, 'স্পাইকের মত আর্লকেও ব্যবসার অংশীদার করে নিয়েছেন আপনি, তাই না?'

'হ্যাঁ,' লুথার বলল। 'না নিলে লোকে সাহায্য করতে চায় না, কি করব? আর্লকে না নিয়ে কোন উপায় ছিল না আমার। ওর জায়গার ওপর দিয়ে গাড়ি আনতে না দিলে পুলিশের চোখ এড়িয়ে কোনভাবেই আনা সম্ভব হত না। পুলিশের সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্যে চমৎকার একটা বুদ্ধি করেছিল সে। নিজের গাড়ি আমাদের কাছে বেচে দিয়ে রিপোর্ট করে এল, চুরি হয়ে গেছে।'

'আর একটা প্রশ্ন। আমাদের প্লেনে গুলি চালিয়েছিল কে?'

মাথা হেলিয়ে একজন সাবমেশিনগানধারীকে দেখাল লুথার, 'বেরেট। বোকামি করেছিল। প্লেনটা বেশি নিচে নেমে আসায় মনে করেছিল আমাদের ঘাঁটি দেখে ফেলেছে। ভয় পেয়ে গুলি চালিয়েছিল ও। অনেক বকেছি ওকে।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। আর কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। মুসা আসছে না কেন এখনও? আর কত দেরি করবে?

ঘড়ি দেখল লুথার। তারপর মুখ তুলে তাকাল, 'তোমাদের জন্যে সত্যি দুঃখ হচ্ছে আমার। কি করব? বাঁচার সুযোগ দিইনি, বলতে পারবে না। তোমাদের বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করলাম, আমার তদন্তের কাজটা নিতে। নিলে বেঁচে যেতে। আসলে তোমরা জ্বালাচ্ছিলে বলে একটা কাজের ছুতোয় তোমাদের দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলাম...'

সুড়ঙ্গে পায়ের শব্দ হলো। ফিরে তাকাল লুথার।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোর আর রবিনের।

সুড়ঙ্গমুখে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা। পিঠে পিস্তল ধরে আছে লুথারের এক প্রহরী। বলল, 'বস্, এই ছেলেটা পাহাড়ের ওপরে উঁকিঝুঁকি মারছিল। ধরে নিয়ে এলাম।'

'কোথায় যেন দেখেছি একে! এই, কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল লুথার।

'ওকে আমি চিনি, লুথার,' স্পাইক বলল। 'আরেকটা বিচ্ছু।' কিশোর আর রবিনকে দেখাল, 'ওদের বন্ধু।'

দুই বন্ধুর দিকে তাকাল মুসা। বিষণ্ণ স্বরে বলল, 'সরি। আমি কিছু

করতে পারলাম না। পিছে পিছেই ছিলাম। গাড়িটা নিয়ে ওরা কোথায় গায়েব হয়ে গেল, দেখলাম না। পাহাড়ের ওপর উঠে খুঁজছি, এই সময় ঘাড়ে এসে পড়ল লোকটা। কোথায় যে ঘাপটি মেরে ছিল, দেখিনি···'

ওকে থামিয়ে দিল কিশোর, 'যা হবার হয়েছে, এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই।'

দমে গেল রবিন। শরীর ঢিল করে হেলান দিল দেয়ালে। বাঁচার আর কোন আশা নেই! কেউ আর উদ্ধার করতে আসবে না ওদের!

উনিশ

শেষ রাতের দিকে লুথারের এক কর্মচারী এসে খবর দিল, কাজ শেষ। সব মাল বার্জে তোলা হয়ে গেছে। এবার রওনা হওয়া যায়। সমুদ্রের অবস্থা ভাল না। বেশি দেরি করলে আর যাওয়া যাবে না।

স্পাইকের দিকে তাকাল লুথার, 'তুমি আর বেরেট সব শেষে বেরোবে। সবগুলো গুহা ধসিয়ে দিয়ে তারপর আসবে।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সত্যি বলছি, তোমাদের মারতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। তোমাদের ছেড়ে দিলে চিরকালের জন্যে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে পালিয়ে যেতে হবে আমাকে।'

ক্রুলারদের নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল সে।

টানতে টানতে একটা সুড়ঙ্গমুখের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো তিনজনকে।

বেরেটকে তিন গোয়েন্দার পাহারায় রেখে বেরিয়ে গেল লুথার।

বেরেটকে বলল স্পাইক, 'তুমি থাকো। আমি ডিনামাইটগুলো ঠিকমত আছে কিনা দেখে আসি।'

বেরিয়ে গেল সে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন, 'কোন আশা নেই আর!'

'মরিনি এখনও। মরার আগে হাল ছাড়া উচিত না।'

সিগারেট ধরাচ্ছে বেরেট।

ইঙ্গিতে রবিনকে দেখাল কিশোর। একটা অন্ধকার কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা দুটো সিলিন্ডার। কালো রঙের। গায়ে লেখা রয়েছে অক্সিজেনের রাসায়নিক সঙ্কেত। মাকড়সা-ডুবুরিদের জিনিস নিশ্চয়। ডুব দেয়ার সময় পিঠে বাঁধত। খালি হয়ে গেছে বলেই বোধহয় ফেলে যাওয়া হয়েছে। ফিসফিস করে রবিনের কানে কানে বলল, 'আমাদের গার্ড মিয়াকে দেখে তেমন চালাক মনে হচ্ছে না। দেখি ফাঁকি দেয়া যায় কিনা···'

'অ্যাই, কি ফিসফাস করছ!' ধমক দিল বেরেট। 'চুপ থাকো! ঈশ্বরের নাম করো!' হাতের অস্ত্রটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সিগারেট টানতে লাগল।

চুপ হয়ে গেল কিশোর। মুসাকে ইশারা করল তৈরি থাকতে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

মুখ তুলে তাকাল গার্ড। 'কি হলো?'

'পেসাব করব।'

ইশারায় অন্ধকার কোণটা দেখিয়ে দিল বেরেট।

এগিয়ে গেল কিশোর। যেন দেখতে পায়নি, এমন ভঙ্গি করে পা লাগিয়ে ফেলে দিল সিলিন্ডারটা। পাথরের ওপর পড়ে বিকট শব্দ তুলল ধাতব বোতলটা। চিৎকার করে উঠল কিশোর। প্রচণ্ড যন্ত্রণায়!

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে, ছোঁ দিয়ে সাবমেশিনগানটা তুলে নিয়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল বেরেট। চিৎকার করে বলল, 'গাধা কোথাকার! দেখে পা ফেলতে পারো না? এখন মরো!'

ছুটে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

একটা মুহূর্ত দেরি করল না কিশোর। চোখা পাথরে হাতের বাঁধন ঘষতে আরম্ভ করল। মুসা আর রবিনও বসে নেই।

সবার আগে বাঁধন কেটে ফেলল মুসা। বাকি দুজনকে মুক্ত হতে সাহায্য করল।

লুথার যে পথে বেরিয়েছে, সেদিকে দৌড় দিল তিনজনে।

সুড়ঙ্গ ধরে কয়েক গজ যেতেই কানে এল স্পাইকের ধমক, 'গাধা কোথাকার! ওরা তোমাকে বোকা বানিয়েছে! ওতে নার্ভ গ্যাস নেই, অক্সিজেন সিলিন্ডার। জলদি যাও! দেখোগে বেরিয়ে গেল কিনা!'

আবার গুহায় ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। সুড়ঙ্গমুখের দুই পাশে ঘাপটি মেরে রইল। মুসার হাতে একটা বড় পাথর। যেই বেরেটের মাথা দেখা গেল, অমনি ধাঁ করে নামিয়ে আনল ওর মাথায়।

বেরেটের হাত থেকে মেশিনগান খসে পড়ে গেল। ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু। সেজদা দেয়ার ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে পড়ল মাটিতে।

মেশিনগানটা তুলে নিল মুসা।

আবার ছুটল ওরা সুড়ঙ্গ ধরে।

বাইরে বেরিয়ে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। সার্চ লাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে জেটি। পাহাড়ের ওপরে আলো, নিচে আলো, চ্যানেল আলো। চ্যানেলের মুখ বন্ধ করে রেখেছে কোস্ট গার্ডের একটা লঞ্চ। পাহাড়ের ওপর থেকে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে সশস্ত্র পুলিশ। অনেকে নেমে এসেছে ইতিমধ্যে। হাত তুলে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে চোরের দলকে।

মুসার দিকে তাকাল রবিন। মিটিমিটি হাসছে মুসা।

'তারমানে তুমি...' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, লুথারের সামনে একটু অভিনয় করেছিলাম,' হেসে বলল মুসা। 'পুলিশকে খবর দিয়ে তবেই এসেছি পাহাড়ের ওপর।'

কিশোর অবাক হয়নি। 'আমি তখনই বুঝেছি কিছু একটা করে এসেছ।'
'আমার অভিনয়টা ধরে ফেলেছিলে?'
'না। অভিনয় ভালই করেছ। বুঝেছি অন্য কারণে। পাহাড়ের ওপর আসতে অনেক সময় লাগিয়ে দিয়েছ। আমাদের পেছন পেছন এলে এত সময় লাগার কথা নয়।'
এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। হাসিমুখে বললেন, 'একটা কাজের কাজই করেছ তোমরা।'
হাতকড়া পরিয়ে আসামীদের কোস্ট গার্ডের লঞ্চে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো। কাজ শেষ করে পুলিশের দলও বিদায় নিল। রইলেন কেবল ইয়ান ফ্লেচার, তাঁর একজন অফিসার, ক্রলাররা তিনজন, আর তিন গোয়েন্দা।
ভোর হয়ে গেছে। বাতাসের বেগ বেড়েছে। যে কোন সময় এখন আঘাত হানতে পারে ঝড়।
'এখানকার কাজ আপাতত শেষ,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'চলো, এবার আমরাও যাই।'
দড়ির সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের ওপরে উঠে এল সবাই।
'সবই হলো,' বলল রবিন। 'আর মাত্র একটা কাজ বাকি। গুপ্তধন উদ্ধার।'
সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে ভাঙছে পাহাড়ের বাইরের দেয়ালে। চ্যানেল আর খাঁড়ির ভেতরে ঢেউ তেমন নেই। হঠাৎ বলে উঠল, 'সেটাও বোধহয় বাকি থাকবে না আর!'
'মানে?' ওর পাশে এসে দাঁড়াল রবিন।
'খাঁড়িটা দেখো? আকৃতিটা ঘোড়ার খুরের মত লাগছে না?'
তাই তো! এতক্ষণ খেয়াল করেনি। এখন সবাই দেখল, ক্যাপ্টেন বাদে। কিছু না বুঝে তাকিয়ে রইলেন তিনি।
গুপ্তধনের কথাটা সংক্ষেপে তাঁকে জানিয়ে দিল রবিন।
'আরেকটা জিনিস দেখো,' নিচু হয়ে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল কিশোর। দেখাল দুই সহকারীকে। 'মেসেজের মার্জিনে আঁকা পাতার মত লাগছে না?'
'খাইছে!' পকেট থেকে একটা ছোট বই টেনে বের করল মুসা। পাতা উল্টে একটা পৃষ্ঠায় এসে থামল। ওতে আঁকা পাতার ছবিটার সঙ্গে কিশোরের ছেঁড়া পাতাটা মিলিয়ে দেখে বলল, 'একধরনের অ্যালজি। বৈজ্ঞানিক নাম চোনড্রাস ক্রিসপাস। সাধারণ নাম আইরিস মস। কিন্তু এখানে ব্ল্যাক উইলো কোথায়?'
'ভুল মানে করে ভুল জায়গায় খুঁজেছি আমরা এতদিন।' লয়েডের দিকে তাকাল কিশোর, 'প্রফেসর ক্রলার, মেসেজের সেই বাক্যটা মনে আছে: ক্র্যাশ অভ ব্রেকিং ব্ল্যাক ইলোজ?'
'নিশ্চয় আছে!' উত্তেজনায় কাঁপছে প্রফেসরের কণ্ঠ।

'ইলোজের সামনের অক্ষরটা মুছে গেছে। আমরা ভেবেছি সেটা হবে ডব্লিউ। তাহলে হয় উইলোজ। ভুল করেছি। আসলে হবে বি। তাহলে হয় বিল্লোজ...'

'বিলোজ মানে সমুদ্রের ঢেউ! উত্তাল তরঙ্গ!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'ক্যাকটাস আসলে বলেছেন—অগণিত কালো ঢেউ ভেঙে পড়ছে...হায় হায়, কোথায় সাগর! আর কোথায় ব্ল্যাক উইলোর বন!'

পকেট থেকে নোটবুক বের করে তার ভেতর থেকে ক্যাকটাসের মেসেজটা নিয়ে গভীর মনোযোগে দেখতে লাগলেন প্রফেসর। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন, 'মেঘে ঢাকা! শুক্রগ্রহকে দেখা যাবে না এখন। তবু, বের করা যাবে...'

জ্যামিতিক নক্সাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি হিসেব করলেন তিনি। কয়েক পা সামনে এগোলেন। কয়েক পা পেছনে। ঘুরে দাঁড়িয়ে কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দিলেন। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'ওই গুহাটার ওপরে আছে। ওই চ্যাপ্টা পাথরটা বেরিয়ে আছে, তার কাছেই কোথাও!'

হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দিল ছেলেরা। আবার দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল নিচে।

প্রফেসরের অনুমান ঠিক। পাথরটার ঠিক নিচে একটা ফোকর দেখা গেল। আগে বোধহয় বড় গর্ত ছিল এখানে। সাড়ে তিনশো বছরে মাটি জমে প্রায় বুজে এসেছে।

লুথারের ওঅর্কশপ থেকে একটা শাবল এনে খুঁড়তে শুরু করল মুসা। ঠং করে লাগল কিসে যেন।

ধরাধরি করে বাক্সটা বের করে আনল তিন গোয়েন্দা। ওদের সাহায্য করল বব।

কাঠের বাক্স। ধাতুর পাত দিয়ে মোড়া।

ক্রলাররা দুই ভাই আর সহকারী অফিসারকে নিয়ে ক্যাপ্টেনও ততক্ষণে নেমে চলে এসেছেন পাথরটার কাছে।

শাবলের কয়েক বাড়িতে পুরানো তালাটা খসিয়ে দিল মুসা। ডালা তুলল।

দেখার জন্যে ঝুঁকে এল সবাই। বিদ্যুতের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল রাশি রাশি মণিমুক্তো, হীরা-জহরত আর সোনার গহনা।

'পেয়েছি! পাওয়া গেছে!' বলে আচমকা ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করল বব।

হাসি ফুটল ওর বাবা আর চাচার মুখেও।

বিদ্যুৎ চমকাল। চিরে দিয়ে গেল কালো আকাশকে। পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল কিশোর, 'ওই যে, শেষ মেসেজটার মানেও বোঝা গেল!'

সবাই তাকাল ওপর দিকে। কি দেখল কিশোর?

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। কিশোরের মত অন্যরাও দেখল এবার, চূড়ার একধারের কিছু পাথর সোনার মত ঝলমল করে উঠল। বিশেষ ধরনের ওই পাথরগুলোর ওপর একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেলে উজ্জ্বল আলো পড়লে অমন ঝলমলিয়ে ওঠে। মনে হয় সোনার তাল।

'তাহলে পাওয়া গেল তো ক্যাকটাসের ভেইন অভ গোল্ড?' হেসে প্রশ্ন করল কিশোর। 'বোঝা যাচ্ছে, ঝড়ের কবলে পড়ে আত্মরক্ষার জন্যে পরিবার নিয়ে এই খাঁড়িতে ঢুকেছিলেন ক্যাকটাস।'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর লয়েড ক্রনার। মুখে সন্তুষ্টির হাসি।

****

ভলিউম ৩১

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০